স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

বইঘর ।। চট্টগ্রাম

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭৬
তৃতীয় মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৯৭

প্রকাশনায় :
বইঘর
২৮৬, বিপণি বিতান
চট্টগ্রাম

মুদ্রণে :
দি আর্ট প্রেস
৮, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক
চট্টগ্রাম

দাম : একশত চল্লিশ টাকা

উৎসর্গ

পরশাসনের শোষণ নিপীড়ণ থেকে
স্বদেশের মুক্তির জন্য
আত্মদান ও সংগ্রামের
যেই শপথ অনির্বাণ শিখায় সেদিন ভাস্বর হয়ে উঠেছিল---
মাতৃভাষার জন্য সারা বিশ্বে
সর্বপ্রথম শহীদ বরকত সালামদের
বুকের রক্তে বাংলার প্রতিষ্ঠায়
দীপ্তিময় হয়ে উঠল সেই শিখা---
জ্বলে উঠল তা অগণিত মশাল হয়ে
দেশের মজুর-চাষী-ছাত্র-জনতার বুকে বুকে
"১১-দফার" রক্তরঞ্জিত গণ-অভ্যুত্থানে---
ধারাবাহী আত্মদানের মহামেলায়,
মৃত্যুহীন সর্ব শহীদদের স্মৃতিতে......

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

এই বইখানা যে সত্যই একদিন প্রকাশিত হবে, নানা ঘটনা বিপর্যয়ে, সেই আশা আমার মন থেকে অনেকটা লুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। তবু ১৯৬৭-র অক্টোবরে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে বইখানা যখন প্রকাশিত হল, তখন চৌদ্দহাত দেয়াল-ঘেরা স্বজন-বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠে বসে আমি সেই আনন্দ সংবাদ গ্রহণ করেছিলাম। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ সহায়তা ও পরামর্শের যেই প্রয়োজন অনিবার্য ছিল, তা সম্ভব না হওয়ায় তার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যায়। তবুও দেশের ছাত্র ও তরুণ সমাজ এবং সাধারণ-ভাবে অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারা যেই আন্তরিকতার সঙ্গে বইখানা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আমি কৃতার্থ। আমাদের দেশের মুক্তি, গণতন্ত্র ও শান্তির অকুতোভয় যোদ্ধাদের হাতে আত্মত্যাগের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্যই এই ইতিহাস রচনার তাগিদ আমি অনুভব করেছিলাম।

১৯৪৮-৫৬ পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক থাকার পরে ১৯৫৬-৫৮ পর্যন্ত দুই বছর কিছুটা নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের সুযোগ পাই। তখন দেশের বিভিন্ন গণতন্ত্রমনা দলগুলি নিয়ে যেই মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তার ফলে প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে চট্টগ্রাম বিপ্লবী শহীদদের জন্য আমার উত্থাপিত 'জালালাবাদ স্মৃতি সৌধ' নির্মাণের বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ—এই দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হয়। পরিষদ কক্ষে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন উপলক্ষে আমার সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরই, অনেকেই চট্টগ্রামের সেই বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিস্তৃত কাহিনী রচনার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন।

এই কাহিনী রচনা করতে গিয়ে কেন আমি শুধুমাত্র চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল এবং সেই গৌরবময় সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত দেশভক্ত বিপ্লবীদের বিষয় না লিখে, ১৮৫৭—১৯৪৭-এর আজাদীর পূর্ব পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামে জাতিধর্ম ও রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে যথাসম্ভব সকল দেশপ্রেমিকের অবদানের কথা রচনার সিদ্ধান্ত করি, সেই বিষয়ে আগেই বলেছি।

সেই সিদ্ধান্ত করার পর এই কঠিন দায়িত্ব পালনে আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে, বিভিন্ন সূত্রে আমি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। এই বিষয়ে জনবরেণ্য দেশনেতা শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী মিঞার জ্যেষ্ঠপুত্র দেশদরদী পরলোকগত একরাম-উল-হক সাহেব ও তাঁর মত অতীতে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ও কারালাঞ্ছিত আরও সাত-আটজন বয়োবৃদ্ধ মুসলিম দেশভক্তের প্রদত্ত তথ্য, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় ত্রিপুরা চরণ চৌধুরীর মূল্যবান রোজনামচা, ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধ চট্টগ্রাম শহরের স্থায়ী বাসিন্দার স্মৃতিমন্থন, আমার কিশোর বয়সের কর্মসাথী ও বন্ধু পরলোকগত কবিরাজ ও কংগ্রেস নেতা যতীন রক্ষিতের সংগৃহীত তথ্য এবং অন্যান্য অনেক সূত্র থেকে অমূল্য বহু তথ্য আমি সংগ্রহ করি।

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে অল্প সময়ে প্রাপ্ত 'পাসপোর্ট' নিয়ে কলিকাতায় গিয়ে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নায়ক শ্রদ্ধেয় অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের সঙ্গে এই বইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহে আমার সুযোগের জন্য তাঁর কাছে আজীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকব। সেই সময়কার যেই যেই বিশেষ ঘটনার সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন, তার বিবরণ আমি তাঁদের লিখে দিতে বলি এবং সানন্দেই তাঁরা তা দেন। বিপ্লবীদলের তৎকালীন বিশিষ্টা নারী-কর্মী কল্পনা দত্তও তাঁর গ্রেপ্তারকালীন সংগ্রাম কাহিনী এই বইয়ের জন্য লিখে দেন।

তারপর নিজ অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে ১৯৫৮-এর প্রথম দিকে এই বই রচনা আমার শেষ হয়।

প্রকাশের জন্য বইখানার পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঢাকায় যাবার পরে কয়েকটি প্রকাশনালয়ের সঙ্গে আলাপের পর অধুনালুপ্ত "জনমত পাবলিকেশন"-এর সঙ্গে বইখানার মুদ্রণ ও প্রকাশের এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। অনেক দুষ্প্রাপ্য ফটো এই বইয়ের জন্য বহুকষ্টে আমি যোগাড় করি এবং ঐগুলিও উক্ত প্রকাশককে দেওয়া হয়। কথা ছিল, ১৯৫৮-এর ৩০শে নভেম্বর বইখানা প্রকাশিত হবে।

১৯৫৮-এর ৭ই অক্টোবর রাত্রে যখন সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়, তার দুই একদিন পরই সামরিক কর্তৃপক্ষ 'জনমত পাবলিকেশনস্' তালাবদ্ধ করে। ফলে, এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য সব ফটো এবং মুদ্রিত প্রায় ৫০০০ বই, সবকিছু সেখানে আটক পড়ে যায়।

১৯৫৮-তে সামরিক শাসন জারির পরদিনই আমাকে আবার আটক করা হয়। ১৯৬২-তে জেলে মরণাপন্ন রোগ থেকে মুক্তির কিছুদিন পরে, রুগ্ন দেহে চার বছর বিনাবিচারে আটক থাকার পরে আমাকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের কিছুদিনের মধ্যেই 'জনমত পাবলিকেশনস্' এর মালিক ও আমি ঢাকায় উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে, আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপি, ফটো ও মুদ্রিত খণ্ডগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তাঁরা জানান যে, ঐগুলি খোঁজ করা হবে এবং পাওয়া গেলেই তা আমাকে ফেরত দেওয়া হবে। মাস তিনেক পরে ঐ কর্তৃপক্ষ আমাকে জানান যে, কিছুতেই সেসব পাওয়া গেল না।

তখন পূর্ব-সংগৃহীত কাগজপত্রের ভিত্তিতে এই বই রচনার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা আমি শুরু করি ১৯৬৩-এর প্রথম থেকে। বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য ফটোগুলি দ্বিতীয়বার সংগ্রহ করার কাজ সুকঠিন ছিল। তবুও গভীর দেশপ্রেমে আপ্লুত দেশবাসী ও শহীদদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় ফটোগুলিও আবার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

ইতিমধ্যে আমি ঢাকা 'বাংলা একাডেমী'র সদস্য হই এবং একাডেমী কর্তৃপক্ষকে আমার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের উদ্দেশ্যে দেখতে দিই। বহুকাল ধরে পাণ্ডুলিপি ও ফটোগুলি তাঁদের বিবেচনাধীন ছিল। তারপর বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাকে জানান যে, বইখানার ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে, তা প্রকাশের জন্য তাঁরা লেখককে এককালীন দুই হাজার টাকা অর্থসাহায্য করবেন।

আজ এই সুযোগে আমি 'বাংলা একাডেমী'-র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঐ সাহায্য ছাড়া আমার মত দরিদ্র লেখকের পক্ষে এই বইখানা প্রকাশ হয়ত সম্ভবই হত না। ১৯৬৫-তে এই সাহায্য পাওয়ার পরে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট প্রকাশক ও মুদ্রাকর জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ শফি এই বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলে আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ।

১৯৬৫-র দুঃখজনক পাক-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত বইখানার একশত পাতার মত মুদ্রণ সম্পন্ন হয়। তারপর আবার আমি বিনা বিচারে আটক হই এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের ফলে চার বছরের মত আটক থাকার পরে আমি মুক্তিলাভ করি। বোধগম্য কারণেই প্রায় দুই বৎসর বইটির মুদ্রণকার্য বন্ধ থাকে। তারপর ১৯৬৭-তে আমার

স্ত্রী শ্রীমতী শান্তি দস্তিদার উদ্যোগী হয়ে ঐ বছরের অক্টোবরে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বইখানা শেষ পর্যন্ত উদ্‌গ্রীব পাঠক-পাঠিকার হাতে পৌঁছায়। প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই বইখানা সম্পূর্ণরূপে বিক্রি হয়ে যায়।

তারপর ঢাকা ও চট্টগ্রামের সুধীমহল, ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য আগ্রহীদের পক্ষ থেকে বইখানার পুনর্মুদ্রণের দাবী আসতে থাকে।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার মুক্তিলাভের পরে আরও কিছু নূতন তথ্য ও ফটো সংগৃহীত হয়! চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহের একটি দুইখণ্ডে প্রকাশিত বই "চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ" এই সময় আমার পড়ার সুযোগ হয়। বর্তমান সংস্করণকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য ঐ যুগের ঘটনাবলীর ব্যাপারে ঐ বই থেকে যেই সাহায্য গ্রহণ করেছি, সেজন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তা ছাড়া বইখানা প্রথম প্রকাশের সময়ে আমার অনুপস্থিতির জন্য বিভিন্ন অংশে যেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমালোচনা, অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার পত্র ও পরামর্শের ভিত্তিতে তা সংশোধন করার চেষ্টা আমি করেছি।

এই সংস্করণেও আমার অনবধানতা ও অজ্ঞতাবশতঃ যদি ঐ ৯০ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন বিশিষ্ট যোদ্ধা বা ঘটনার উল্লেখ না করে থাকি, সেই সব ঘটনা বা ব্যক্তির অবদানের কথা আমাকে যদি কেউ জানান, তা পরবর্তীকালে সম্ভব হলে গ্রহণ করব।

যেসব শ্রদ্ধেয় সাহিত্যসেবী, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও ছাত্র-ছাত্রী বইখানার বর্তমান সংস্করণের প্রকাশ ও উন্নতির জন্য তাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

জুন, ১৯৭০ ইং
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম

প্রথম সংস্করণের কথা

বহু দুঃখভোগ, সংগ্রাম আর আত্মদানের মধ্য দিয়ে বিদেশী শাসনের বন্ধন-শৃঙ্খল-মুক্তি আমাদের হয়েছিল। কিন্তু তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও উন্মোচিত হয়নি। স্বাধীনতা একদিনে অর্জিত হয়নি। তার জন্য অনেক দেশভক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রয়াসে কত মৃত্যুহীন শহীদ সবার চোখের আড়ালে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন।

স্বাধীনতার সংগ্রামে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের যেই বিস্ময়কর ও অসম-সাহসিকতাপূর্ণ অভ্যুত্থান ১৯৩০-এ ঘটেছিল, তার কিছু কিছু কাহিনী সেই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ রচনা করেছেন। আবার জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে অথবা কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যও কেউ সেই কাহিনী রচনা করে তাকে ছায়াবাণীর রূপ দিতে গিয়ে স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতিরও আশ্রয় নিয়েছে। রোমাঞ্চকর ঐ সংগ্রামের একটি সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নিরপেক্ষ কাহিনী শোনার জন্য দেশের মানুষের অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করে একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত করা হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল এবং তার পরবর্তী জালালাবাদ সংঘর্ষ ও অন্যান্য বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা আমাদের দেশের যেই স্বাধীনতার সংগ্রাম বহুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছিল, তারই অন্যতম পরবর্তী অধ্যায়। তারও পূর্ব থেকে নানা মত ও পথ নিয়ে আমাদের দেশের অগণিত দেশপ্রেমিক যেসব সংগ্রাম ও ত্যাগ করে গেছেন, তাঁদের কথাও আমাদের জানা দরকার। আবার সমগ্র দেশের আন্দোলন ও সংগ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র চট্টগ্রামের কাহিনী বলতে গেলে, সারা দেশের সংগ্রামের অংশ হিসাবে, তার পটভূমিকায়ই তাকে উপস্থিত করতে হয়।

তাই ১৮৫৭-এর বীর সিপাহীদের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কাহিনী থেকে শুরু করে, স্বাধীনতা সংগ্রামের যেই পরিণতি ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম, এই বইতে তার কাহিনী প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রচনা করার চেষ্টা হয়েছে। সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি

কারণ যেই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যেই মুক্তি সংগ্রাম ঐ ৯০ বৎসর ব্যাপী চলেছিল, তার অনেক তথ্যকে তারা বিনষ্ট করে গেছে। আবার নানা কারণে এই লেখকের তথ্য-সংগ্রহ প্রচেষ্টা যে সীমিত একথাও বিনীতভাবে স্বীকার্য।

তবু দেশের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের কথা ভেবে যথাসম্ভব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই বই রচিত। ভবিষ্যতে নূতন তথ্য সংগৃহীত হলে তা এর সঙ্গে সংযুক্ত হবে। আর কোন তথ্যে যদি কোন ভুল থাকে, তা লেখককে জানালে সেই ভুল অবশ্যই সংশোধিত হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের প্রতি জাতীয় ঋণশোধের এই প্রচেষ্টা সামান্যও সফল হলে লেখক ধন্যবোধ করবে।

জুলাই, ১৯৬৭ ইং
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

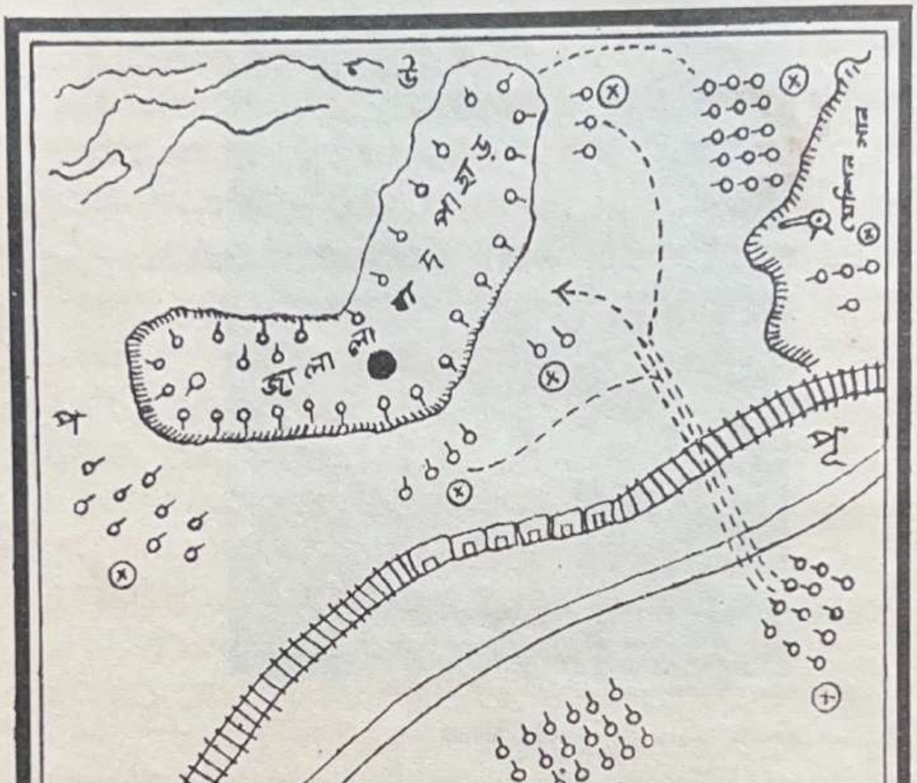

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের পূর্বাহ্নে উভয় পক্ষের সামরিক সমাবেশ

এক

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে পরাজিত ও হত্যা করার পর থেকেই বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ বাঙ্গালীর মনে বিশেষভাবে জাগে। পলাশীর আম্রকাননের সন্নিহতি গঙ্গাবক্ষে দেশের যে স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়, মুক্তি-পাগল বাংলার হিন্দু-মুসলিম তার পরবর্তী অন্ধকার যুগে ইংরেজ শাসনের বন্ধন-শৃঙ্খল মোচনের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে।

নূতন বিদেশী-শাসকরা এই সোনার দেশকে লুণ্ঠনের জন্য তাদের দেশ থেকে যন্ত্রে উৎপন্ন কাপড়-চোপড় ও বিলাসদ্রব্য ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মারফত এই দেশে পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতিও এশিয়ার এইসব উপনিবেশে তারা নিয়ে আসে তাদের শাসনের অপরিহার্য প্রয়োজনে। ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয় ১৭শ শতাব্দীতে, তা ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স, জার্মেনী ও সারা ইউরোপে। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই ইউরোপে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সামন্ততন্ত্রের পরাজয় সূচিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য, 'প্যারী-কমিউনের' ব্যর্থতা, জার্মেনী ও ইটালীতে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান—এসব ঘটনার কথা ইংরেজী সাহিত্য মারফত বাংলাদেশেও আসতে শুরু করে। শাসক ও বণিক ইংরেজের আফিসে সেরেস্তায় যারা চাকুরী করতে থাকে, তারা ইউরোপে ধনতন্ত্রের নূতন অভিযানের তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জাতীয়তাবোধেরও সন্ধান পায়।

ইতিহাসে আমরা দেখি ১৩শ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই সামন্ততন্ত্রের পূর্ণবিকাশ ঘটে। তখনই বাংলায় শহর গড়ে ওঠে, কুঠির

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। বৃটিশরা ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরের পত্তন করার পর থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ঘাঁটি তৈরী করল, সারা বাংলায় বৃটিশের কলকারখানা ছড়াতে আরম্ভ করল। বিহার ও উড়িষ্যা তখনও বাংলার সঙ্গে যুক্ত। বৃটিশরা স্থানীয় জমিদার ও বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে' তাদের পরিণত করল দালালে। বাংলার ঘরোয়া ব্যাপারে বৃটিশ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে বাংলার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা তার প্রতিবাদ করলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ বাহিনী বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় পলাশীর যুদ্ধে বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করে। নৃশংসভাবে সিরাজউদ্দৌল্লা নিহত হন এবং তারপর থেকেই বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সারা বাংলার মালিক হয়ে যায়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কর্তৃক কলিকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরেজ আবার এসে শহর জুড়ে বসল। ব্যবসাদারী কোম্পানী বণিক শক্তি থেকে সামরিক ও রাজ্যাধিকারী শাসক শক্তিতে পরিণত হল।

বৃটিশরা ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে আমাদের এই সোনার বাংলাকে তারা এমনভাবে লুণ্ঠন করতে শুরু করে যে, দেশে দুর্দশা চরমে উঠতে উঠতে ১৭৭৬ সালে এক মহা-মন্বন্তর স্থষ্টি করে। এতে আনুমানিক দেশের এক তৃতীয়াংশের মত অধিবাসী ইহলোক থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কোম্পানীর মারফত এই উপনিবেশে বৃটিশের মাল আমদানীর ফলে বৃটিশ পুঁজিবাদী শিল্পের প্রসার হতে থাকে। ফলে বাঙ্গালী কারুশিল্পীদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হল। ১৮৫৭—৫৯ খৃষ্টাব্দে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে যে জাতীয় অভ্যুত্থান হয়, বৃটিশ শাসকশ্রেণীর তাঁবেদার ঐতিহাসিকরা তাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" রূপেই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সারা ভারতে ঐ আন্দোলন এক জাতীয় অভ্যুত্থানেরই রূপ পরিগ্রহ করে এবং তাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে বাংলার কৃষক ও কারুজীবিরাও বিদেশী শাসক ও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বীর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে

মার্চ ব্যারেকপুরের প্যারেড ময়দানে বন্দুক কাঁধে নিয়ে টহল দিচ্ছিল। দূরে ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা চঞ্চল পদক্ষেপে জটলা করছে। হঠাৎ মঙ্গল পাণ্ডে চেঁচিয়ে উঠল, 'এসো ভাইসব—যে ফিরিঙ্গিরা আমাদের ধর্মভ্রষ্ট ও জাতিচ্যুত করেছে তাদের খতম করে আমাদের দেশকে আমরা স্বাধীন করি।'

তবু সিপাহীরা এগিয়ে আসে না। তাদের বুকে দেশপ্রেম, অথচ কাজে দ্বিধা। এমন সময় ইংরেজ এডজুটেণ্ট লেফট্যানেণ্ট বাগ, কোমরে রিভলভার ও তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসে। অবস্থা তার বুঝতে বাকী নেই। কাছে আসতেই মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক থেকে গুলী গর্জন করে ওঠে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা লাগে ঘোড়ার পায়ে। লেফট্যানেণ্ট বাগ সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার ছুঁড়ল। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডের ধারাল তলোয়ারের ঘায়ে তখনই বাগের রক্তাক্ত দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হল। ইংরেজ সার্জেণ্ট মেজর একজন এই ঘটনা দেখে ছুটে এল। তারও দেহ মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ারের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীরা সশস্ত্র অবস্থায় তাকে যখন ঘিরে ফেলল, তখন মঙ্গল পাণ্ডে নিজের বন্দুকের গুলী নিজের উপর তাক করল কিন্তু মৃত্যুও সহজে এই বীরকে আঘাত করতে পারল না। আহত মঙ্গল পাণ্ডে বন্দী হলো। তার সাথী ঈশ্বরী পাণ্ডে তাকে গ্রেপ্তার করতে অস্বীকার করাতে তাকেও আটক করা হল।

১৮৫৭ ইং ৮ই এপ্রিল সকাল ১০টায় ব্যারেকপুর ময়দানের পাশে একটি অশ্বত্থ গাছে এই দুই বীর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডেকে ইংরেজেরা ফাঁসী দেয়। সিপাহী-বিপ্লবের আগুন এইখানেই প্রথম ধূমায়িত হল।

১৮৫৭ এর এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সারা উত্তর ভারতের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সিপাহী বিপ্লবের গোপন আয়োজন চলতে থাকে। কিন্তু পূর্ব সীমান্তের এই চটগ্রামের মুক্তিপাগল বীর সিপাহীরাই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে সবার আগে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরল। মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসীর পরে ভারতের সিপাহীদের মধ্যে সর্বপ্রথম চটগ্রামের ৩৪নং রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ইংরেজ অফিসাররা খবর পেয়ে প্যারেড ময়দানে

সমবেত হওয়ার আদেশ দিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কামনায় চঞ্চল সিপাহীরা সেই হুকুমে কর্ণপাত ত করলই না বরং মারমুখী হয়ে উঠল। বেগতিক দেখে ইংরেজ কর্মচারীরা পলায়নই শ্রেয় মনে করল।

হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা সরকারী কোষাগার থেকে তিন লক্ষ টাকা লুট করে নিল। জেলখানার কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে তারা সৈন্যদের ব্যারাক পুড়িয়ে দিল এবং অস্ত্রাগারটি ধ্বংস করল।

তারপর তিনটি সরকারী হাতী আর দু'টি ঘোড়ার উপর লুটের মাল চাপিয়ে এই সিপাহীরা চট্টগ্রাম শহর থেকে বড় সড়ক ধরে ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে চলল। তারা আশা করেছিল স্বাধীন ত্রিপুরার রাজার সাহায্য ও সহানুভূতি তারা পাবে। কিন্তু বিদেশীর দালাল এই তথাকথিত স্বাধীন রাজা নিজের সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ পথেই তাদের বাধা দিল। সেখানে বাধা পেয়ে তারা কুমিল্লার পাহাড় এলাকার দিকে যায়। সেদিকেও ত্রিপুরার রাজা ও জমিদাররা ইংরেজদের পক্ষ হয়ে তাদের বাধা দেয় এবং তাদের হাতী ও টাকাকড়ির ক্ষতি হয়। শেষ পর্যন্ত তারা মণিপুর রাজ্যের উদ্দেশ্যে সিলেটের দিকে এগিয়ে যায়। ইংরেজ মেজর বাইজের নেতৃত্বে সিলেটের পদাতিক বাহিনী চট্টগ্রামের এই মুক্তিপাগল বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। বর্তমানে সীমান্ত ষ্টেশন লাতুতে উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাতে মেজর বাইজ নিহত হয়। পরে তারা বনের মধ্যে আত্মগোপন করে। তারপর তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। *

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ধনতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়। তখন থেকে গড়ে উঠল বুর্জোয়া শ্রেণী, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মজুর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ বৃটিশ আই-সি-এস মিঃ হিউমের উদ্যোগে

---

* এই সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা মহালক্ষ্মী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুসাহিত্যিক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি স্বর্গীয় ত্রিপুরা চরণ চৌধুরীর স্বহস্ত লিখিত রোজনামচা এবং কবি, গীতকার ও উপন্যাসিক দেশভক্ত শ্রীসত্যেন সেনের প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে রচিত বই "মহা বিদ্রোহের কাহিনী" থেকে।

যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাস এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গোপন সংগঠন গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায়। তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী নীতির ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কাছে আবেদন নিবেদন ছাড়া আর কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া তখন সম্ভব ছিল না। বাঙ্গালী অনেক তরুণ তাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য যে কোন পথ, তা যত বিঘ্নসঙ্কুলই হোক না কেন, গ্রহণ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে।

এর ফলে ১৮৯৯—১৯০১ সালে কলকাতায় তরুণ ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের (জন্ম ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, নৈহাটিতে) উদ্যোগে বাংলার প্রথম গোপন বিপ্লবীদল "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি হন প্রমথনাথ নিজে এবং সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু) এবং কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতকে স্বাধীন করা। "অনুশীলন সমিতির" সদস্যদের লাঠি খেলা, অসি খেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের জন্যও শিক্ষা দেওয়া হত। এসব প্রকাশ্য ভাবেই দেওয়া হত। তারপর এর ভিতর থেকে গুপ্ত সমিতির সদস্য নির্বাচিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তাদের তৈরী করা হত।

বাংলাদেশের মত মহারাষ্ট্র দেশেও বিপ্লবী সংগঠন স্বতন্ত্রভাবেই গড়ে ওঠে। মারাঠা দেশে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন দামোদর হরি চাপেকার ও রামকৃষ্ণ হরি চাপেকার। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদা কলেজের অধ্যাপক, তখন তিনি চাপেকারদের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবীমতে দীক্ষিত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলায় বিপ্লবীদল গঠনের সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং আপন সহোদর বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে কলিকাতা ও মারাঠার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পাঠান। ক্রমে ক্রমে বাংলার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন

যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

কিছুদিন পর বারীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে একদল তরুণ বিপ্লবী শুধু লাঠি খেলা, ছোরা খেলা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা সভাপতি প্রমথনাথ মিত্রের কাছে দাবী করলেন যে, দেশবাসীকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে, স্বাধীনতার জন্য উন্মাদনা জাগাতে হলে, দরকার নিজেদের পত্রিকা। প্রমথনাথ তাতে রাজী না হওয়ায় ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে এই বিপ্লবীদের উদ্যোগে সাপ্তাহিক "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশিত হোল। এই পত্রিকার যারা প্রকাশক ও পরিচালক তাদের এক চক্র থেকে ক্রমে একটি আলাদা বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে এবং তাই ক্রমে বাংলার গোপন বিপ্লবীদলের অন্যতম "যুগান্তর" দল হিসেবে গড়ে ওঠে। ক্রমে "যুগান্তরের" শাখা পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার প্রায় সব জিলাতেই ছড়িয়ে পড়ে। আর কলিকাতায় যে "অনুশীলন" দল প্রথম গড়ে ওঠে তারই অনুপ্রেরণায় পূর্ব-বাংলায় এই "অনুশীলন" দলের শাখা গড়ে ওঠে ঢাকার পুলিন দাস, প্রতুল গাঙ্গুলী, কেদারেশ্বর সেন, রবি সেন ইত্যাদির প্রচেষ্টায়। এর মধ্যে পুলিন দাস লাঠি, ছোরা, অসি খেলায় খুবই পারদর্শী ছিলেন, তাঁর লেখা "লাঠি খেলা ও অসি শিক্ষা" বই বাংলার দুইটি প্রধান বিপ্লবীদলের সদস্যের কাছেই অপরিহার্য ছিল।

"যুগান্তর" আর "অনুশীলন" উভয় বিপ্লবীদলেরই আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সাহায্যে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রধানতঃ ব্যক্তিগত নেতৃত্বের সংঘর্ষ ছাড়া এই দুইটি প্রধান বিপ্লবী দলের মধ্যে কোন নীতিগত বিভেদ ছিল না। উভয় দলই প্রধানতঃ ডাকাতিদ্বারা অর্থসংগ্রহ, সন্ত্রাসবাদী কার্যদ্বারা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করা ব্যাপারে এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করত। তবে "যুগান্তরের" বিভিন্ন জিলাভিত্তিক দলগুলি স্বায়ত্বশাসিত দল ছিল এবং বিভিন্ন দলের গোপন অর্থভাণ্ডার, অস্ত্রশস্ত্র ও আশ্রয়স্থলগুলি পরস্পরের কাছেও গোপন থাকত। "অনুশীলন" বিরোধিতায় এবং পরবর্তীকালে বাংলা কংগ্রেসের দুই দিক্‌পাল সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) ও

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের মধ্যে যখন তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলে তখন "যুগান্তর" দল সুভাষচন্দ্রকে এবং "অনুশীলন" দল দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে সমর্থন করতেন। তবে দল হিসাবে "অনুশীলনে" অনেকটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিদ্যমান ছিল।

বাংলায় বিপ্লবীদলের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী দেওঘর পাহাড়ে কুমিল্লার বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের তৈরী বোমা পরীক্ষার সময় মারা যান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বিহারের মজঃফরপুরে ইংরেজ রাজকর্মচারী কিংসফোর্ডকে বোমা মারতে গিয়ে ভুল করে এবং তা পড়ে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডির গাড়ীতে। প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলী দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন আর বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। আজও উভয় বাংলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানে মানুষ চোখের জল ফেলে। বিপ্লবীদের প্রথম গোপন ট্রাইব্যুনাল নাকি গঠিত হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি, অরবিন্দ ঘোষ আর রাজা সুবোধ মল্লিককে নিয়ে। এঁরাই মজঃফরপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন এবং সেই নির্দেশেই নাকি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে ওখানে যায়।

তারপর বাংলায় বিপ্লবীদলের কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ এখানে অবান্তর, কারণ এঁদের সঙ্গে চট্টগ্রামে সন্ত্রাসবাদী গোপন বিপ্লবীদল প্রতিষ্ঠার কি যোগাযোগ ছিল তাই পরে আলোচিত হচ্ছে। বাংলার বিপ্লবীদলের বড় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেই এই অধ্যায় আমি শেষ করব।

মানিকতলা বোমা মামলা ও আলীপুর বোমার মামলা—এই দুইটি ঐ সময়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলা। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীগণ ঐ উপলক্ষে ধৃত হয়ে বিচারার্থ প্রেরিত হন। আলীপুর বোমার মামলায় রাজসাক্ষী হন অন্যতম বিপ্লবী সহকর্মী নরেন গোঁসাই। বিপ্লবী কানাইলাল ও সত্যেন বসু পাকা কাঁঠালের মধ্যে গোপনে রিভলভার সংগ্রহ করে জেলের

মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের দু'জনেরই ফাঁসী হয়।

এর পরে বড় বৈপ্লবিক কাজ ঘটে দিল্লীতে ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে। তখন বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সরকারীভাবে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ও তাঁর স্ত্রী সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চড়ে বৃটিশ ভারতের নূতন রাজধানীতে খুব জাঁকজমক করে নির্দিষ্ট দিনে প্রবেশ করবেন। সরকারী উদ্যোগে ঐতিহাসিক দিল্লী নগরী উৎসব মুখরিত। অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল উৎসবের আলোক, স্বর্ণালংকারসজ্জিত বড়লাটের ঐ হাতীর উপরই নিক্ষিপ্ত হ'ল বোমা। বড়লাট-গৃহিণী পড়লেন ভূতলে। বড়লাট কিছুটা আহত, বেচারা মাহুতের মৃত্যু হল। এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বাঙ্গালী বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। কয়েকমাস বিচারের পর তাঁর ফাঁসী হয়।

গেরিলা পদ্ধতিতে বাংলার বিপ্লবীরা প্রথম যুদ্ধ করেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী, উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে সমুদ্রের বালুচরে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৯) চলছে। ভারতের বৃটিশ সরকার ঐ সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে ভারতের অগণিত মানুষকে কামানের খোরাক হিসেবে নিয়ে গেছে ইউরোপে, তুরস্কে, আরবদেশে—কত অর্থ আদায় করে নিয়েছে গরীব ভারতবাসীর কাছ থেকে। তখন মুক্তিপাগল বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জি (বাঘা যতীন) এবং তাঁর সহকর্মী অন্য কয়েকজন বিপ্লবী গোপনে বিদেশ থেকে জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজরা যখন জার্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত, তখন ঐভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতেও তাদের উপর যদি আঘাত হানা যায়, অন্ততঃ গেরিলা পদ্ধতিতে যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও আক্রমণ করা যায়, তা'হলে দেশের স্বাধীনতাকে অনেকটা এগিয়ে আনা সম্ভব হবে।

উক্ত তারিখে যতীন মুখার্জি অন্য চারজন বিপ্লবীকে নিয়ে বালেশ্বরের গভীর জঙ্গলে অপেক্ষা করছেন, জার্মেনী থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে পৌঁছবে। কোন সূত্রে খবর পেয়ে কলিকাতা পুলিশের

স্পেশাল সুপার টেগার্ট অনেক সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে ওখানে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে টেগার্টের বাহিনীর উপর গুলী চালাতে আরম্ভ করল। উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ গুলী চলতে থাকল। যতীন মুখার্জির দলে মাত্র পাঁচজন, সরকারী সিপাহী বহুগুণ বেশী। তাই বাঘা যতীনের দল সেখানে বালির মধ্যে পরিখা কেটে তার ভিতর থেকে যুদ্ধ করতে থাকে। ওখানে শহীদ হয় চিত্তপ্রিয়। বাঘা যতীন ও অন্যান্যরা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন। কটক হাসপাতালে ঐ গুলীর আঘাতের ফলেই বাঘা যতীনের মৃত্যু হয়। তাঁর সাথী নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপার ভূপেন চাটার্জি নানাভাবে বহু বিপ্লবীদের উপর ঐ সময় খুব বেশী জুলুম ও অত্যাচার করছিল। তাই জেলে যখন সে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বিচারাধীন বন্দীদের জবানবন্দী নেবার চেষ্টায় প্রায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত তখন তাকে কলিকাতার আলীপুর জেলের মধ্যেই শেষ করার সিদ্ধান্ত করে বিপ্লবীরা। ভূপেন চাটার্জিকে হত্যা করার জন্য অনন্তহরি মিত্র, চট্টগ্রামের কেলীশহর গ্রামের বিপ্লবী প্রমোদ চৌধুরী ও অন্যান্য বিপ্লবীরা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতে ভূপেন চাটার্জি নিহত হয়। এই ঘটনার জন্য ঐ জেলে প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের ফাঁসী হয়।

অনেকের কথাই বলা দরকার, তবু এই স্বল্প পরিসরে সব কিছু বলার উপায় নেই। বিশেষ করে চট্টগ্রামের কথাই এই বইয়ের মুখ্য বক্তব্য। তবু বীর বিপ্লবী যতীন দাসের অমর আত্মদানের কথা না বলে পারি না কারণ ৬৪ দিন অনশন ধর্মঘট করে তিনি আটক বন্দীদের বীরত্বের ও সংগ্রামের এক নূতন ইতিহাস রচনা করে অমর হয়ে আছেন। আজও বিনাবিচারে আটক এবং রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত দেশভক্ত বন্দীরা কারাগারে যেইসব সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা পাচ্ছেন, তার জন্য যতীনদাসের বীরত্বপূর্ণ কারা-সংগ্রাম অনেকাংশে দায়ী। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন যতীনদাস, পাঞ্জাবের বিপ্লবী বীর ভগৎসিংহ আর বটুকেশ্বর দত্ত। জেল কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক এই বন্দীদের যথোচিত

মর্যাদা না দেওয়াতে বন্দীরা জেলের লড়াইয়ের সর্বশেষ হাতিয়ার অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত দুর্বলতা বা অসুস্থতার জন্য অন্যান্য বন্দীরা অনশন ত্যাগ করলেও সকলের বহু অনুরোধ সত্বেও বিপ্লবী যতীনদাস বন্দীদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। অনেক চেষ্টা করেও যতীন দাসের জীবন রক্ষা করা যায়নি। ১৯২৯ এর ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬৪ দিন অনশনের ফলে লাহোর জেলে যতীন দাসের যখন মৃত্যু হয়েছিল, তখন সারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। তার প্রতিবাদে সারা ভারতে হরতাল পালিত হয়। কলিকাতায় যখন লাহোর থেকে যতীনদাসের মৃতদেহ আনা হয় তখন লক্ষ লক্ষ নরনারী এই দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী বীরের মৃতদেহটি একটু দেখবার জন্য এমন ভিড় করে যে তার চাপে হাওড়া প্লাটফরমের শক্ত লোহার রেলিং ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ যতীন-দাসের মৃত্যুবরণের সংবাদ শোনার পর থেকে উপবাস পালন করেছে, খালি পায়ে রেল ষ্টেশনে, মিছিলে ও শ্মশানে এসেছে।

যতীনদাসের মৃতদেহ হাওড়া টাউন হল থেকে দক্ষিণ কলিকাতার কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত যাঁরা বহন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং বাংলার আরও অনেক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ নিয়ে যে বিরাট শোক-শোভাযাত্রা কলিকাতায় ১৯২৪ সালে হয়েছিল, অনেকের মতে বীর বিপ্লবী যতীনদাসের মৃতদেহ নিয়ে হাওড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত সেই মিছিল অনেক বড় হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রতি বাংলার বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মধ্যবিত্ত মজুর চাষীর হয়ত সমর্থন ছিল না, কিন্তু বিপ্লবীদের অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রতি জনসাধারণের যে কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা এইসব ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

রামমোহন, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ দেশের সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য বিভিন্ন ভাবে যে প্রেরণা সঞ্চার করেন, মুক্তিচঞ্চল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী তরুণ তা আকণ্ঠ পান করেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লব, আইরিশ বিপ্লব, ১৯০৫ সালের বিফল রুশ বিপ্লবের কাহিনীও তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ক্ষয়িষ্ণু

সামন্ততন্ত্রকে বাংলায় উৎখাত করে' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে শোষণ ও নিপীড়ন শুরু করেছিল এবং বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রধান অংশ যখন আবেদন নিবেদনের অবমাননাকর পদলেহী নীতি গ্রহণ করেছিল, তখনই বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী তরুণ ঐ অবৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করেছিল। সেই পথ বন্ধুর, সে পথে ছিল অত্যাচার, জেল, গুলী, ফাঁসীর দড়ি। ছিল নিজ প্রিয় পরিজনকে অক্লেশে ত্যাগ করে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করা। তবু দলে দলে তারা যে এগিয়ে গিয়েছিল তার মূলে ছিল মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সর্বস্ব পণ করা ও নিজের মহামূল্য জীবনকে স্বাধীনতার বেদী মূলে উৎসর্গ করার অদম্য কামনা।

আজ এসব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিকদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়, আমাদের দেশে যে স্বাধীনতা আজ আমরা ভোগ করছি তার ভিত্তি রচনা করেছে এই রকম বহু নাম-না-জানা শহীদরা। গুলীর মুখে, ফাঁসীর দড়িতে, পুলিশের লাঠির কাছে, গোয়েন্দা পুলিশ অফিসের গোপন কুঠরীর নির্মম অত্যাচারে এরা বিদায় নিয়েছিল এই সুন্দর ধরণী থেকে—স্বাধীনতার মধু পান করার সময় এদের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাদের নীতি ভুল, পথ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ভুল—এ সব আজ বড় কথা নয়। কেমন করে দেশকে ভালবেসে, দেশের মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি সব হেলায় বিসর্জন দেওয়ার এই শক্তি ও ক্ষমতা তারা অর্জন করেছিল, শ্রদ্ধার সহিত আমাদের সে কথা স্মরণ করতে হবে, তার সত্য মূল্য দিতে হবে।

দুই

এবার চট্টগ্রাম জিলায় আমরা ফিরে আসি। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন, শৈলকিরিটিনী, সাগরমেখলা এই চটলা সৃষ্টি করেছে আলাওল, দৌলত কাজী আর নবীন সেন। বাংলার সীমান্তবর্তী এই জিলার মানুষ পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের পরিবেশে স্বভাব-কবি, অনুভূতিপরায়ণ ও দরদী। তাই দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনেও চট্টগ্রামের অবদান যথেষ্ট।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অবিভক্ত বাংলায় যেসব আন্দোলন হয়েছে, কংগ্রেস, খিলাফত, স্বরাজ্য পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি রাজনৈতিক দল তাতে কি অংশ গ্রহণ করেছিল তার সমগ্র ইতিহাস বা বিশ্লেষণ এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। স্বাধীনতার যে জ্বলন্ত স্পৃহা চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিমকে আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আজ তাঁদের কথা যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা আলোচনা করব। কারণ, দেশপ্রেমের সে ঐতিহ্যকে যদি ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয়, সুখ-সমৃদ্ধি ও মুক্তির উচ্চতম শিখরে যদি দেশকে টেনে তুলতে হয়, তা'হলে যারা ঐ শিখরে আরোহণের জন্য এক একটি ধাপ রচনা করেছিল নিজের জীবন দিয়ে, মহৎ মরণ দিয়ে, তাদের কথা তাদের পরবর্তীদের জানতে হবে। তাদের আত্মদানকে যথোচিত মর্যাদা দান করার মত মনকে আমাদের তৈরী করতে হবে।

জাতির ভবিষ্যত যারা, তাদের বিশেষ করে এই ইতিহাস জানা দরকার। কেবল রোমাঞ্চক কাহিনী শোনার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি নয়—সেই সব অমর শহীদ ও দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত চলার পথে যদি কিছু শিখবার থাকে তা গ্রহণ করে তাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নূতনভাবে প্রয়োগ করার পদ্ধতি শিখতে এই ইতিহাস সহায়ক হবে।

চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক অবদানের কথা যেমন করে বলার চেষ্টা করছি, এভাবে ঢাকা ও বরিশাল ইত্যাদি বিভিন্ন জেলায় দেশকে পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত করার জন্য যে সব হিন্দু-মুসলিম নরনারী আত্মদান করেছেন, তাঁদের কথাও বিশদভাবে তুলে ধরা দরকার। তা'হলে ভবিষ্যত বংশধররা সঠিকভাবে গড়ে উঠবে এবং প্রধানতঃ তাদের জন্য রচিত এই ইতিহাস পাঠ করে তারা তাদের পিতা পিতামহদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখবে—প্রকৃত জাতি হিসেবে তারা গড়ে উঠবে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ১৭৬০ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বরের এক সন্ধির সর্ত অনুসারে নবাব মীরকাশিম বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম জিলা সমর্পণ করতে বাধ্য হন। তারপর চট্টগ্রামের তৎকালীন শাসক নবাব রেজা খাঁ মিঃ হেরিভেলেটের হাতে চট্টগ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন বলে জানা যায়। তখন থেকে ইংরেজরা চট্টগ্রামের উপর চেপে বসে।

তারপর থেকে ১৯শ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা জানা যায় না। ১৮৬৭ খৃঃ এবং তার দশ বৎসর পরে ইংরেজরা যখন চট্টগ্রামে জরীপ শুরু করে, তখন তাতে বাধা দেওয়ায় পটিয়া থানার গুয়াতলী নিবাসী প্যারীমোহন চৌধুরী এবং আনোয়ারার ডাঃ রামকিনু দত্তের জেল হয়। যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিপ্লবকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিপাহী-বিদ্রোহ রূপে চিত্রিত করেছেন, তা' যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম তা আর এক শতাব্দী পরে আজ আমরা স্বীকার করছি। সেই বিপ্লবের দিনে চট্টগ্রামও নিষ্ক্রিয় ছিল না তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২ ইংরেজী তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামের আইনজীবি দুর্গাদাস দস্তিদারের, ইংরেজ প্রবর্তিত আয়কর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত লেখার অপরাধে ১ মাসের জেল হয়।

তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০৫ খৃঃ বাংলায় যখন "স্বদেশী আন্দোলন" শুরু হয়, তখন তার ঢেউ এসে চট্টগ্রামের বুকেও লাগে। তখন রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রামের যামিনী সেনের উদ্যোগে "চট্টল হিতসাধিনী সভা" নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধলঘাটের কবি শশাঙ্ক সেন, পটিয়ার নিকটবর্তী জঙ্গলখাইন গ্রামের কবি বিপিন নন্দী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভার সদস্য ছিলেন। যামিনী সেনের সঙ্গে কলিকাতার বিপ্লবী দলের সংযোগ ছিল। তবে খোলাখুলি রাজনীতি বা বিপ্লবী কার্য করা তখন সম্ভব ছিল না। এই সভার কার্যসূচী ছিল—বিভিন্ন খেলাধূলা, কর্ণফুলীতে সন্তরণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন, শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদি করা। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করাই ছিল সভার উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। চট্টগ্রামে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও বৃটিশ পণ্য-বর্জন দ্বারা স্বদেশী গ্রহণের জন্য আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন এই সভার সদস্যরা। তখনকার স্বদেশী-আন্দোলনের প্রধান নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গেও এই সভার যোগাযোগ ছিল। চট্টগ্রামের মুসলিমও অনেকে ঐ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সেই সময় যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে মৌঃ একরাম-উল-হকের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্কুল থেকে নিম্নলিখিত শিক্ষকরা স্কুল ত্যাগ ক'রে এই আন্দোলনে যোগদান করেন :—

মহিমচন্দ্র দাস—কলেজিয়েট স্কুল,
(পরে জিলা কংগ্রেস সভাপতি ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য)

মৌঃ কাজেম আলী—কাজেম আলী স্কুল,
(পরে 'শেখ-এ-চাটগাম' নামে খ্যাত)

বিপিনবিহারী চৌধুরী—খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক,
(পরে পাহাড়তলী রেলওয়ে হাইস্কুল ও পাথরঘাটা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন)

১৯০৫ সালের ৬ই ও ৭ই আগষ্ট চট্টগ্রামে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই বছরের ১২ই ডিসেম্বর বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর চট্টগ্রামে আসেন। তখন "স্বদেশী আন্দোলনের" একমাত্র ধ্বনি "বন্দেমাতরম" দিতে দিতে কিছু জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে

তাদের উপর পুলিশ লাঠি চালনা করে। "চট্টল হিতসাধিনী সভার" যামিনী সেন কলিকাতা থেকে এই সময় স্বদেশী প্রচারের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চট্টগ্রাম আমন্ত্রণ করে আনেন।

তখন স্বদেশী প্রচারের কাজে উদ্বুদ্ধ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, কাজেম আলী মাষ্টার প্রমুখ নেতারা চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে উহা ফুল ও পাতা দিয়ে সজ্জিত করেন। তারপর পুষ্প-সজ্জিত ঘোড়ার গাড়ীতে করে কবি রবীন্দ্রনাথকে হাসপাতালের পাহাড়ের উত্তরদিকে যামিনী সেনের দ্বিতল বাড়ীতে আনা হয়। ১৯২১শে আন্দোলনের সময় ঐ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ মাত্র ছিল। ঐ বাড়ীর সম্মুখস্থ মাঠে রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য বহু জনসমাগম হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় ঐ সময়েই রচিত একটি গান করেন।

যেই মাঠে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ পদার্পণ করেন পরবর্তীকালে ঐ মাঠ বহু হিন্দু-মুসলিম দেশবরেণ্য সর্বভারতীয় নেতার শুভাগমনে কি ভাবে ধন্য হয়েছিল তা' পরে আলোচিত হবে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চট্টগ্রামে আসার ফলে এই জিলার স্বদেশী আন্দোলনে নূতন এক উদ্দীপনা জাগে। তাঁর বক্তৃতার জন্য জনসভার ব্যবস্থা হয় সদরঘাটে কমলবাবুর থিয়েটার হলে।*

সেদিন চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক ও সংস্কৃতিমনা অনেক বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলিম রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধমূলক বক্তৃতা শোনার জন্য ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব একরাম-উল-হক উপস্থিত মুসলিম নেতাদের মধ্যে অন্যতম।

---

* বর্তমানে চট্টগ্রামের সদরঘাটে যে 'লায়ন সিনেমা' আছে, তাই হল তখনকার "কমলবাবুর থিয়েটার হল।" কোয়েপাড়া গ্রামের জমিদার কমল সেন এই সৌখিন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অন্য এক ধনী, বিশ্বম্ভর পাল এই ঘর কিনলে, এর নাম পরিবর্তিত হয়ে "বিশ্বম্ভর হল" হয়। পরে ঢাকার জনাব কাদের সর্দার এটা কিনেছিলেন এবং বর্তমানে এই ঘরেই "লায়ন সিনেমা" চলছে।

১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম শহরে বিলাতী কাপড় বর্জন ও পোড়ানো যথেষ্ট হয়েছিল। যে সব দোকান বিলাতী অর্থাৎ বিদেশী কাপড় বিক্রয় করত, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দোকানে দোকানে গিয়ে বিলাতী কাপড় আদায় করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় আগুন দিয়ে তা' পুড়িয়েছিল।

তখন জনতার রুদ্ররোষের একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করব। সুলকবহরের আবদুল হামিদ সওদাগর ছিল অতিমাত্রায় রাজভক্ত আর বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ী। শহরের চন্দনপুরা এলাকায় এই সওদাগরের ঘোড়ার আস্তাবল ছিল এবং তার মধ্যে ছিল তার এক-ঘোড়ার টম্‌টম্ গাড়ী। বিক্ষুব্ধ হিন্দু-মুসলিম সেই আন্দোলনের সময় ঐ টম্‌টম্ গাড়ী, ঘোড়া ও আস্তাবল পুড়িয়ে দেয়।

তখন বিদেশী বর্জনের উদ্দীপনা বিশেষভাবে চলছে। চট্টগ্রাম তখন ভারতের পূর্ব সীমান্তের প্রাচীন বন্দর। কিন্তু সমস্ত উপকূল বাণিজ্য তখন ছিল ইংরেজ কোম্পানীর (সম্ভবতঃ টার্ণার মরিসন) দখলে। তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ চট্টগ্রামের নেতা যাত্রামোহন সেন (দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহনের পিতা), আবদুল বারি চৌধুরী, দুর্গাদাস দস্তিদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় চট্টগ্রামে প্রথম বেঙ্গল ষ্টীম-নেভিগেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গৌরাঙ্গ রুদ্রের বাজার খেলার ঘাটের নিকটবর্তী মাঠে (যেখানে বর্তমান উচচ-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে) চট্টগ্রাম সম্মেলনীর এক অধিবেশন হয়। ১৯০৫ এবং ১৯০৬-তে এই বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। কিন্তু সরকার তাতে কোন বাধা না দিলেও ১৯০৭-এর এই সম্মেলনের উপর ১৪৪ ধারা জারী করে। অন্যান্য বৎসর যেমন এই সম্মেলনে এক সপ্তাহব্যাপী মেলা, শিল্প প্রদর্শনী, খেলাধূলা ইত্যাদি চলত, এই বৎসরও অনুরূপ কার্যক্রমই ছিল। তবুও ইহার উপর কেবল ১৪৪ ধারা জারী করেই সরকার ক্ষান্ত হয় নাই, সম্মেলনে উপস্থিত জনসাধারণের উপর পুলিশ লাঠি চালায় এবং প্রদর্শনী ইত্যাদি ভেঙ্গে দেয়। এই সভায় কলকাতা থেকে বিপিন পাল, কুমিল্লা থেকে অখিল দত্ত আর চট্টগ্রামের নেতা যাত্রামোহন সেন ছিলেন। চন্দনপুরায়

(শহরের উত্তরাংশে) কমল সেনের বাসায় এই নেতাদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। সেখানে আইন ভঙ্গ করে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠান পালন করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু আর সপ্তাহখানেক পরই বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আগেই করা হয়েছে; তখন চট্টগ্রামে ঐ আইন অমান্য আন্দোলন করা সংগত হবে না।

ঐ সম্মেলনকে বে-আইনী ঘোষণা করায় চট্টগ্রামে জনসাধারণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের স্থষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা উহার পরও বৃটিশ পণ্য বর্জন, স্বদেশী লবণ বিক্রয় ইত্যাদি কাজ করতেন, কিন্তু তা সত্বেও কিছুদিন এসব ব্যাপারে কাউকে ধরপাকড় করা হয় না। এই সময় চট্টগ্রামের শিক্ষিত মুসলিম যুবকরাও সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে শাহ বদিয়ুল আলম, মাষ্টার কাজেম আলী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯০৭-এ বরিশালের সম্মেলনকে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে, লাঠি চালিয়ে সভা ভেঙ্গে দেয় ও নেতাদের মধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করে। সেই সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে মোট ২৫ জন প্রতিনিধি যায়। তার মধ্যে যামিনী সেন (কোয়েপাড়া) মনীন্দ্র সেন (নয়াপাড়া) শশাঙ্ক সেন (কবি, ধলঘাট) মহিম দাসের (পরে জিলা কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) নাম উল্লেখযোগ্য। বরিশাল সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে এসেছিলেন স্থরেন বানার্জি আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত।

১৯০৭-এ চট্টগ্রামের উৎসাহী দেশপ্রেমিক যুবকদের সঙ্গে কলিকাতার বিপ্লবীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় এই স্বদেশী আন্দোলনের মারফত। "চট্টল হিতসাধিনী" সভার যামিনী সেনের সঙ্গে বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতিরও পরিচয় ছিল। চট্টগ্রামের নেতস্থানীয় ব্যক্তি যাত্রামোহন সেন প্রভৃতি জাতীয়তাবাদীরা ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী জাতীয় নরমপন্থী (মডারেট)-দের সমর্থন করতেন না। চট্টগ্রামের তরুণদের আন্দোলনের প্রতি তাঁরা সহানুভূতিশীল ছিলেন।

আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধৃত হওয়াতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পিতা যাত্রা মোহন সেন দুঃখ প্রকাশ করে নাকি বলেছিলেন এই সব যুবক দেশের স্বাধীনতার জন্য কত কিছুই করতে পারত। বিপ্লবীদলের বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে যখন কানাইলাল আর সত্যেন জেলের মধ্যে হত্যা করে, তখন যাত্রামোহন বাবু খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। তিনি ঐ মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্যও করেন।

ঐ মামলার পলাতক কিছু আসামী গোপনে চট্টগ্রাম আসেন। চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলের এক অংশ এঁদের আগ্রহের সঙ্গে লুকিয়ে রাখেন। চট্টগ্রাম তখন পর্যন্ত বৃটিশ সরকারী মতে রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই পশ্চাদপদ, তাই বিপ্লবীরা এখানে লুক্কায়িত থাকা নিরাপদ মনে করত।

আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার এই পলাতক আসামীরাই চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিপ্লবের বীজ বপন করেন। চট্টগ্রামের তরুণরা তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে জেলায় প্রথম একটি বিপ্লবী সংগঠনী কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে প্রথম চারজন মাত্র সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে ৩ জনের নাম জানা যায়—যামিনী সেন, মনীন্দ্র সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী। চতুর্থ ব্যক্তি সূর্য সেন কিনা সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নি। তবে অম্বিকা চক্রবর্তী ও সূর্য সেন একই রাউজান থানার পাশাপাশি গ্রামের হওয়াতে তখন থেকে দু'জনের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল।

এই বিপ্লবী সংগঠনীর কাজ ছিল, পলাতক বিপ্লবীদের জন্য আশ্রয়স্থল যোগাড় করা, বে-আইনী পুস্তক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা, দলের জন্য বাছাই করা সচ্চরিত্র ও সাহসী সদস্য সংগ্রহ করা ও ব্যায়ামাগার স্থাপন করা। তা'ছাড়া তখন ধর্মভাব বিশেষ প্রবল ছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদেরই তখন দলে আনা হত। কারণ তখনও বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে নি। ছাত্র ও যুবকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, গীতাপাঠ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বই ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা করা হত।

এসব অবশ্য তখন গোপনভাবেই করা হ'ত বিপ্লবীদলের প্রধান কাজ হিসাবে। প্রকাশ্য কাজের মধ্যে ছিল, জাতীয়তাবাদীদের সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ও জাতীয় কংগ্রেসের কাজ করা। এই বিপ্লবীদলের সদস্যরা কলিকাতা থেকে গোপনভাবে প্রকাশিত "যুগান্তর" "স্বাধীন ভারত" ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা ও ইস্তাহার গোপনে এই জিলায় বিলি করত।

১৯০৮ সালে সুরাট কংগ্রেসে চট্টগ্রামের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে বিপ্লবীদলেরও কিছু সদস্য প্রতিনিধি সেখানে যান। ঐ কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের এক প্রবল সংঘর্ষ হয়। ঐ সংঘর্ষে চট্টগ্রামের সমস্ত প্রতিনিধি চরমপন্থীদের সমর্থন করেন।

সুরাট কংগ্রেস থেকে ফিরবার পথে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কলিকাতায় "যুগান্তর" দলের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু তখনও চট্টগ্রাম বিভাগকে রাজনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা, কাজেই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সন্দ্বীপ ইত্যাদি জায়গায় পলাতক বিপ্লবীদের জন্য আশ্রয়স্থল এবং বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র রাখার গোপন ঘাঁটি যোগাড় করতে হবে। বাইরে থেকে এসব কাজের কোন আভাস পর্যন্ত যাতে কেউ না জানতে পারে, গোপন কাজ এমন বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সঙ্গে করতে হবে যাতে চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট উপরোক্ত কাজগুলির যেন কোন ক্ষতি না হয়। এই দলের লোকেরা প্রকাশ্যে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকত।

ইতিমধ্যে "হিতসাধিনী সভা" নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তার জায়গায় গড়ে উঠে "চটল সাহিত্য পরিষদ"। এই পরিষদই আবার পূর্বোক্ত "হিতসাধিনী সভা"র প্রায় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৯১০-এর ৬ই ও ৭ই এপ্রিল চট্টগ্রামে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও জাতীয়তাবাদী নেতা মিঃ এ, রসুলের সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

তিন

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের দম্ভকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম সেদিন চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। ইংরেজ শাসক বড়গলায় বলেছিল যত আন্দোলনই হোক না কেন, বঙ্গভঙ্গ কিছুতেই রোধ হবে না—ওটা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ('It is a settled fact') কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোরে সেই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীরা। যদি সে সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামকে সংযুক্ত করে কার্জনের দম্ভোক্তিকে সফল করে সত্যই একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হত "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নাম দিয়ে, তা'হলে হয়ত আমাদের এক নূতন ভূগোল ও ইতিহাসের সঙ্গে আজ মোকাবিলা করতে হত। ১৯১২-তে ইংরেজ সরকার বাংলাকে এইভাবে ভাগ করে ঐ নূতন প্রদেশ গঠন করা হবে না বলে ঘোষণা করায়, জনগণ জয়যুক্ত হয় এবং ইংরেজ শাসকশ্রেণীর প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

এ সময় থেকে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা যায়। ওদিকে ইংরেজ যখন ইউরোপে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তখন যদি তাকে ভিতর থেকে এই বাংলায় ও ভারতে এক সশস্ত্র আঘাত দিতে পারা যায়, হয়ত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই সারা বাংলায় গণ-অভ্যুত্থানের এক পরিকল্পনা বিপ্লবীরা করেন। লক্ষ্য ছিল, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। এই জন্য বাংলার সব বিপ্লবীদলগুলির এক সুদৃঢ় ঐক্য ঐ সময় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলও ঐ কাজে সংযুক্ত হয়। অবশ্য সাংগঠনিক ও অন্যান্য দুর্বলতার জন্য ঐ পরিকল্পিত গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাংলার বিপ্লবীরা আর একবার ইংরেজের শত্রু জার্মেনদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করে। অস্ত্র বোঝাই জাহাজ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে বিপ্লবীদের কাছে সরবরাহ করা হবে স্থির হয়। সেই অস্ত্রের

জাহাজ একখানা যাবার কথা ছিল বালেশ্বর, যেখানে বাঘা যতীন (যতীন মুখার্জী) তাঁর বিপ্লবী সাথীদের নিয়ে কি ভাবে বীরত্বের ইতিহাস রচনা করেন তা আগেই বলেছি। তেমন একখানা অস্ত্রের জাহাজ আসার কথা ছিল সন্দ্বীপে। ঐ জাহাজ থেকে অস্ত্র গোপনে নামিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়েছিল চট্টগ্রামের গোপন বিপ্লবী সংগঠনের উপর। পাশাপাশি জিলার বিপ্লবীরাও প্রয়োজন মত অস্ত্র সংগ্রহে অক্ষমতার জন্য, এই বিষয়ে চট্টগ্রাম দলের সঙ্গে মিলিত হয়। কারণ এক জাহাজ অস্ত্র ও গোলাগুলী এলে তাদের সকলেরই হাতে প্রচুর অস্ত্র আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সন্দ্বীপের অস্ত্র সরবরাহ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এই সম্পর্কে চট্টগ্রামের সদরঘাটের নালাপাড়া এলাকার সুধাংশু নামে একটি যুবককে বিপ্লবীরা সন্দেহ করে। সেজন্য দুইজন অপরিচিত যুবক সুধাংশুকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে হত্যা করে। চট্টগ্রামে এটিই খুব সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

১ম মহাযুদ্ধের সময় "ভারতরক্ষা আইনে" চট্টগ্রামের অনেক দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদলের সংগে সংশ্লিষ্ট যুবককে গ্রেপ্তার করে' বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, চন্দ্রশেখর দে (চট্টগ্রাম কে-সি-দে রোডে যাঁর কমার্শিয়াল কলেজ ছিল), অমরেন্দ্র চৌধুরী, ক্ষেমেন্দ্র দস্তিদার, পঙ্কজ চৌধুরী, ধীরেন দাস, ক্ষেত্রমোহন সেন, নরেন চৌধুরী, রমাপ্রসন্ন সিংহ, মনীন্দ্র লাল সেন ও নগেন দাশগুপ্ত।*

১ম মহাযুদ্ধের সময় ভারতরক্ষা আইনে ধৃত কিছু রাজবন্দীকে চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হয়। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ পরিবেষ্টিত এই দ্বীপ থেকে পলায়ন করা কঠিন হবে আশা করেই সরকার রাজবন্দীদের ওখানে রাখে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে

* সেই সময় অনেকের উপর ঐ আইনে নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ভারতরক্ষা আইনে আটক, অন্তরীণ এবং নানা বিধিনিষেধ নিয়ে যাঁরা ছিলেন; (তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য......গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, শাহ বদিয়ল আলম, কাজেম আলী মিঞা, অম্বিকা চক্রবর্তী ইত্যাদি।

অবমাননাকর দুর্ব্যবহার করাতে তাঁরা কুতুবদিয়ার ঐ সামুদ্রিক খালটি সাঁতার দিয়ে পলায়নের সিদ্ধান্ত করেন। স্থানীয় রেজিষ্ট্রি আপিসের কেরাণী মুন্শী মিঞা এবং তথাকার ছাত্র যোগেশ পাল (পরে কক্সবাজারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, কয়েক বছর পূর্বে মৃত), অনঙ্গ দাস, রাজকুমার পাল, উপেন শীল প্রভৃতি ঐ আটক রাজবন্দীদের পলায়নে সাহায্য করেন। পরে তাঁদের মধ্যে অনেকে ধৃত হন এবং সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে। ঐ মামলা পরিচালনার জন্য চট্টগ্রামে তখন কলিকাতা থেকে এসেছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, জনাব এ, কে, ফজলুল হক এবং ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে সূর্য সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী একই থানার পাশাপাশি গ্রামের ছাত্র হিসাবে ছোট বেলা থেকেই পরস্পরের কাছে পরিচিত ছিলেন। সূর্য সেন ছেলেবেলা থেকেই খুব মনোযোগী ভাল ছাত্র ছিলেন এবং ধর্মভাবাপন্ন গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি তখন বিপ্লবী দলের সব খবর রাখতেন ও গোপনে বেআইনী রাজনৈতিক বইও পড়তেন। ১ম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবেই বিপ্লবী-দলের সঙ্গে মিশে যান। তখন ১৯১৬--১৭ সাল, ১ম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর চলে গেছে। দুর্বল বৃটিশকে আঘাত করার এইত সুযোগ। এই সুযোগ গ্রহণ করে' দেশের মুক্তির দিনকে এগিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করার জন্য ঐ সময় অনেক দেশভক্ত যুবক বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। সূর্য সেনও এই 'সময় বিপ্লবীদলের সঙ্গে ভালভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯১৮ সালে সূর্য সেন বহরমপুর কলেজে বি-এ পড়তে যান। ভাবুক প্রকৃতির ছাত্র সূর্য সেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ-এ (বর্তমান কালে আই-এ, আই-এস-সি এসবের জায়গায় ফার্ষ্ট আর্টস বা এফ-এ পরীক্ষার নিয়ম ছিল) পাশ করে বি-এ'তে ভর্তি হয়েছেন। ৩য় বর্ষ শ্রেণী বি-এ'তে এক সাময়িক পরীক্ষা হবে। সূর্য সেন ঐ বিষয়ের বইটি পরীক্ষার হলে আসবার সময় পড়তে পড়তে বাসা থেকে কলেজে চলে এসেছেন। তারপর যখন তিনি পরীক্ষা দিতে বসেছেন তখন তা নিজের সামনে টেবিলের উপর রেখে, তিনি প্রশ্নের জবাব

লিখছেন। ইংরেজ প্রিন্সিপাল এসে দেখে যে, সূর্য সেনের পরীক্ষার টেবিলে পাঠ্য বই। অবশ্য কেউ তাঁকে নকল করতে ধরতে পারেনি। কারণ সূর্য সেনের পক্ষে নকল করার মত জঘন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব। আর নকল করার জন্য পাঠ্য বই কেউ সবার চোখের সামনে রাখে না। যাই হোক পরীক্ষার হলে পাঠ্য বই আনার অপরাধে সূর্য সেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বিতাড়িত হন এবং সেইজন্যই তাঁকে বহরমপুর কলেজে বি-এ পড়তে যেতে হয়।

১৯১৮ সালে বৃটেন যখন ১ম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করে তারপর ১৯১৯-শে ফ্রান্সের ভার্সাইতে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। ১ম মহাযুদ্ধের সময়ই সারা মুসলিম জাহানের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় খলিফা তুরস্কের সুলতানকে ইংরেজরা বিতাড়িত করে এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অনেক অংশকে ইংরেজ প্রভাবাধীনে নিয়ে এসে তাদের দিয়ে "স্বাধীনতা" ঘোষণা করানো হয়।

তুরস্ক থেকে মুক্ত ঐসব তথাকথিত স্বাধীন দেশে জনসাধারণের অবস্থার যদিও কোন উন্নতি হয়েছিল না, তবু পবিত্র খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশ-প্রেমিক এই উপমহাদেশের মুসলিমরা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করার জন্য উদ্যোগী হন। এই আন্দোলনই "খিলাফত আন্দোলন" হিসাবে খ্যাত।

ভারতের অন্যান্য স্থানের মত এই জেলায়ও মুসলিম দেশভক্তদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। সামন্ততান্ত্রিক খলিফাকে তার হৃত আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করাই ছিল তখনকার "খিলাফত" আন্দোলনের লক্ষ্য। তবু তার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র ছিল এবং এই কারণেই গান্ধীজীর স্বরাজ প্রতিষ্ঠা আর খিলাফত আন্দোলন ক্রমে বিনা আয়াসেই যুক্তভাবে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে পরিচালিত হতে থাকে।

বৃটিশরা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে সারা ভারতে এক নির্দিষ্ট তারিখে উৎসবের আয়োজন করে।* লক্ষ্ণৌ এর ফিরিঙ্গি মহলের

---

* ঐ উৎসবের অন্যতম প্রধান কার্যসূচী ছিল জার্মেনীর তখনকার সম্রাট কাইজার আর তুরস্কের খলিফার ছবি বা মূর্তি আগুনে পোড়ানো হবে।

বিখ্যাত মৌলানা আবদুল বারি ফতোয়া দিলেন যে, ভারতীয় মুসলিমকে ঐ উৎসব বর্জন করতে হবে। চট্টগ্রাম শহরের পাঠানটুলীর জনাব আমানত খান সাহেবের বাড়ীতে এক বড় সভায় তখন বৃটিশের বিজয়োৎসব বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চট্টগ্রামে এই শান্তিচুক্তি উৎসব বর্জন আন্দোলন তখনকার দিনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৃটিশ সরকার ফিরিঙ্গি বাজারের আবদুর রহমান দোভাষীকে টাকা দিয়েছিলেন, ঐ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলের কয়েদীদের জন্য যেন ভাল খাদ্য বিতরণ করা হয়। সেই দিন এই উন্নত ধরনের খাদ্য জেলের কয়েদীদের মধ্যে একজনও স্পর্শ করে নাই। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল আপিসের সামনে দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণকে বিনামূল্যে চাউল ও কাপড়-চোপড় বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কয়েকজন ঘৃণ্য পদলেহী দেশদ্রোহী ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত দুঃস্থরাও ঐ চাউল আর বস্ত্রখণ্ড নিতে অস্বীকার করেছিল।

পাহাড়তলীর নেজামত পল্টনে সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় ঐ নিষ্প্রাণ উৎসবের আয়োজন হয়। উচ্চপদস্থ বৃটিশ ও ভারতীয় কর্মচারী আর মাত্র সামান্য কিছু গ্রামবাসী ঐ উৎসব দেখবার জন্য উপস্থিত ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের 'পিকেটিং' করার ফলে শহরের হিন্দু-মুসলিম প্রায় কেউ উৎসব ক্ষেত্রে যেতে পারেনি। ঐ উৎসবের জন্য যে বৈদ্যুতিক আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা ছিল, তা বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের পরে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম তখন ঐ "শান্তি উৎসব" বর্জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের এক অমর ইতিহাস রচনা ক'রে এবং অবিভক্ত বাংলার মুক্তি আন্দোলনে এ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তখনও পর্যন্ত বহু চক্রান্ত করেও বৃটিশ শাসকরা চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিমের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে পারেনি।

১৯১৯ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এবং ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিধিদল যায়। তার মধ্যে ছিলেন : অম্বিকা চক্রবর্তী, কাজেম আলী মাষ্টার এবং দশজন দেশভক্ত যুবক।

ঐ কংগ্রেসে চরমপন্থীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য আশু সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের দাবী করে। সেজন্য মহাত্মা গান্ধী এক বৎসরের জন্য সময় নেন। সারা ভারতের হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ—সমস্ত ভারতবাসী তখন নিদারুণ বিক্ষুব্ধ। কারণ পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ার আর সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ডায়ার মিলে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নরনারী ও শিশুদের যে নিষ্ঠুর ও পাশবিকভাবে মেশিনগানের গুলী চালিয়ে হত্যা করে, তেমন জঘন্য বর্বরতার কথা ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়।

অমৃতসর নগরীর বুকে তের-চৌদ্দ হাত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মাঠ—নাম তার জালিয়ানওয়ালাবাগ। প্রবেশ পথ মাত্র একটি গেট। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত অনেক সৈন্য ও অর্থ দিয়েছে, তাই তার পরিবর্তে সামান্য কিছু শাসন সংস্কার তারা দাবী করেছিল। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী তরুণরাও ঐ সুযোগে কিছু কিছু গোপন বিপ্লবী আন্দোলন করে। তাই ইংরেজরা ভারতীয় স্বাধীনতার সব রকম আন্দোলন ও দাবীকে দমিয়ে দেবার জন্য "রাউলাট আইন" পাশ করে। জালিয়ানওয়ালাবাগে সেদিন সভা হচ্ছিল ঐ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। ইংরেজ সরকার রক্তের বন্যায় অগণিত নারী, শিশু ও দেশবাসীর ঐ দাবীকে ভাসিয়ে দেয় এবং তারপরে অনেকদিন পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাব প্রদেশেই এক বর্বর অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করে। জালিয়ানওয়ালা-বাগের অত্যাচারের পরই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিয়ে মহাত্মা গান্ধী ভারতে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ বর্বরতার প্রতিবাদে সারা ভারতে যে প্রবল গণবিক্ষোভ জাগ্রত হয়, তার ফলে, কলিকাতায় ১৯২০ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। তাতে চট্টগ্রাম থেকে যাঁরা প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন, তার মধ্যে ছিলেন, শেখ-এ চাটগাম কাজেম আলী মিঞা, মহিম চন্দ্র দাস, শাহ বদিয়ল আলম, অম্বিকা চক্রবর্তী, মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, জালাল আহমদ (জগলুল নামে অভিহিত হতেন; চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে লোকান্তরিত), মৌঃ নজির আহমদ, শাহ নুরুদ্দীন, মৌলানা নুরুল হক, সুশান্ত চৌধুরী ইত্যাদি।

ঐ বিশেষ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে, সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বর্জন করা হবে। প্রতিনিধিরা অধিবেশন শেষে চট্টগ্রাম ফিরে এসেই ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করেন। স্কুল ধর্মঘটের কার্যসূচী অনুযায়ী ৮-১১-২০ ইং তারিখে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম মোসলেম হাই স্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। তারপর শহরের অন্যান্য স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মঘট করে রাস্তায় মিছিল করে বেরিয়ে আসে।

ধর্মঘটি ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট জনসভা তখন অনুষ্ঠিত হয় যাত্রামোহন সেন হলে (জে. এম. সেন হল)। তাতে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। ঐ সভার প্রস্তাবানুযায়ী চট্টগ্রামের শ্রীবিনোদ সেন, এম-এ, বি, এল (বর্তমানে চট্টগ্রাম জজকোর্টের এডভোকেট), শ্রীবিনয় দে (কাটলী গ্রামের) এবং অন্য দুইজন বিশিষ্ট দেশকর্মীকে এলাহাবাদে মতিলাল নেহেরুর (জওহরলাল নেহেরুর পিতা) বাড়ী "আনন্দ ভবনে" পাঠানো হয় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে চট্টগ্রামের স্কুল কলেজ ধর্মঘট ও অন্যান্য ব্যবস্থা জানাবার এবং তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য পরামর্শ নেওয়ার জন্য। মহাত্মা গান্ধী তখন থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছেন। চট্টগ্রামের ঐ প্রতিনিধিদলের কাছে তিনি কথা দেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চট্টগ্রাম সফরে আসবেন।

এই সময় জে.এম. সেন হলের কাছে স্থাপিত হয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতিষ্ঠান "স্বরাজ সংঘ" আর ঘাটফরহাদবেগ কমল সেনের বাড়ীতে চট্টগ্রাম জিলা খিলাফত কমিটির আপিস।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতে 'এক বছরে স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবীতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনে চট্টগ্রাম কি অংশ গ্রহণ করে এবং জেলার বিপ্লবীরা এই আন্দোলনকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তা' জানা দরকার।

অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণ যে বিপুল উৎসাহে যোগদান করে, তার স্মৃতি এখনও পুরাতন দেশভক্তের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে চট্টগ্রামবাসী সেই

আন্দোলনে যেভাবে বিপুল উৎসাহে যোগ দিয়েছিল, কংগ্রেসের সংগে নীতিগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা ঐ জনগণ-জাগরণের প্রবল জোয়ারের সামনে নিজেদের স্থির রাখতে পারেন নি। বিপ্লবীদলের স্বতন্ত্র গোপন অস্তিত্ব বজায় আছে, অথচ চরকায় সূতা কাটা, খদ্দরের কাপড় তাঁতে বোনা, বিলেতী দ্রব্য বিশেষ করে বস্ত্র বর্জন, স্কুল কলেজ আপিস আদালত বর্জন—এই সব নরম ধরণের কাজও বিপ্লবীরা স্বচ্ছন্দে আগ্রহ নিয়ে করেছেন, কেবল জনসাধারণের নাড়ীর সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল বলে। ঐ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী চট্টগ্রামের সব বিপ্লবীরাই নীতিগতভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন—তবু তাঁরা আন্তরিকভাবে ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বলেই, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে চট্টগ্রামের উপর সারা ভারতের দৃষ্টি পড়েছিল।

চট্টগ্রামে আন্দোলনকে দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারও বহু জুলুম করে। সেই নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুমকে উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত হিন্দু-মুসলমান জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঐ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষক ইত্যাদি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, আর গ্রামের চাষী, শহরের কারখানার মজুর, ছাত্র সম্প্রদায়—এক কথায় খুব বড় বড় জমিদার, জোতদার বা ধনীরা ছাড়া দেশের বিরাট শোষিত ও বঞ্চিত জনসাধারণ দেশপ্রেমের প্রবল উন্মাদনা নিয়ে ঐ আন্দোলনে যোগ দেয়। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁর ভাই শওকত আলী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ সর্বভারতীয় জাতীয় নেতা হিন্দু-মুসলিম "স্বরাজের" জন্য মিলিত হয়েছে এক মায়ের সন্তান হিসাবে। কংগ্রেস আর খিলাফতের মিলিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে এ ঐক্য দানা বেঁধে উঠেছে। চট্টগ্রামের মহিম দাস, কাজেম আলী মিঞা, কালীশঙ্কর চক্রবর্তী, শাহ বদিয়ল আলম, একরাম-উল-হক সাহেব, ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, প্রসন্ন সেন, রমেশ সেন ইত্যাদি নেতা ঘাটফরহাদবেগে কমল সেনের পুরাতন দোতলা বাড়ীতে এই জিলার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস আর খিলাফতের যুক্ত আপিস বসিয়েছেন।

ইংরেজের আদালতে বিচারের প্রার্থী আমরা হব না, সরকারী বিদ্যালয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়বে না, সরকারী চাকুরী আমরা করব না—এই হল "অসহযোগ"। এই সব ব্যাপারে ধর্মঘট, মিছিল, সভা ইত্যাদির উপর পুলিশের সব অত্যাচার আমাদের নীরবে সহ্য করতে হবে, পুলিশের লাঠি গুলীর বদলে হিংসাত্মক প্রতিশোধের কোন ব্যবস্থাই আমরা করব না। এটা হবে সম্পূর্ণ অহিংস আন্দোলন। ১৯২১ সালের এই নীতি নিয়ে মহাত্মার নেতৃত্বে এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অর্থ ও অন্যান্য সংকটে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী মুক্তির জন্য পথের সন্ধান করছিল। সেই সন্ধান বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-সচেতনতার মধ্য দিয়ে তখনও পরিচালিত হয়নি। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য যে পথনির্দেশ কংগ্রেসের ও খেলাফতের নেতারা সেদিন দিয়েছিলেন, তাতেই মুক্তিপাগল দেশবাসী সাড়া দিয়েছিল। "স্বরাজের" প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তার প্রকৃত রূপ কি তখনও তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমাদের উপর এক বিদেশীরাজ ইংরেজ সরকার জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে। তা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে,—দেশে "স্বরাজ" আনতে হবে। ঐ "স্বরাজ" বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কিনা, শোষিত কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্তের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, এসব কোন কথাই, তখন যাঁরা সব কিছু ছেড়ে পূর্ণ আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়ে ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা ঠিক বুঝতেন না।

বিলাতী বর্জন করতে হবে, সেই বড় আন্দোলনে সব সময় এই কথাই উঠত। ১৯২০ সালের দিকে ভারতে সর্বপ্রথম বোম্বাইতে কাপড়ের কল বসে। ভারতীয় কলের কাপড় তখনও গুণে, চমৎকারিত্বে ও দামের দিক দিয়ে লাঙ্কাশায়ার, মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাই তখনকার দিনের বিলাতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের উদ্যোক্তারা নবোত্থিত ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী উন্নত ইংরেজ ও ইউরোপীয় যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে জাতীয়তাবাদের প্রেরণাকে ব্যবহার করেছিলেন কিনা, তা তখন যাঁরা বিলাতী সূক্ষ্মবস্ত্রের পরিবর্তে মোটা চরকায় হাতে কাটা ও তাঁতে বোনা কাপড় অতি শ্রদ্ধা

ও দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় ব্যবহার করতেন, তাঁরা চিন্তা করতেন না। দেশকে ভালবাসি, তাই দেশের লোকের হাতে কাটা মোটা কাপড় পরব, হোক না বিলাতী কাপড় সুন্দর ও মিহি, তা পরব না—এই ছিল সব দেশভক্তের মনোভাব।

এই চট্টগ্রামে তখন দেখা গেছে বিলাতী কাপড় পোড়াবার জন্য দলে দলে পথে বেরিয়েছে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র আর তরুণদল। ছোট ছেলে, হাতে তার ছোট বাঁশের কঞ্চি। শহরের মাঝখানে লালদিঘীর পাড় দিয়ে বিলাতী কাপড় পোড়াবার দল যাচ্ছে—পাশ দিয়ে এক মুসলমান বয়স্ক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। তাঁর মাথায় ফুলকাটা পাতলা বিলাতী কাপড়ের টুপি। ছেলেটি সামনে গিয়ে হেসে বলল, "কি আপনি শূয়রের চামড়া কেন মাথায় দিয়ে যাচ্ছেন," বলেই কাঠি দিয়ে মাথা থেকে সে টুপি নামিয়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলে। মুসলিম ভদ্রলোকটি একটুও উত্তেজিত না হয়ে হাসতে হাসতে চলে যান। আবার দেখা যায় বিলাতী এক পাতলা ফিনফিনে চাদর গলায় ঝুলিয়ে চলেছেন এক হিন্দু স্কুল শিক্ষক। একটি ছাত্র তাঁর কাছে গিয়ে বলে, "মাষ্টার মশাই, গরুর চামড়া এমন করে গলায় জড়িয়ে যাচ্ছেন কেন—দিন, পুড়িয়ে ফেলি।" দেরী করা হয় না, ঐ বিলাতী চাদর লালদিঘীর পাশে সদর রাস্তার উপর সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বিনা আপত্তিতে শিক্ষকটি চলে যান। এভাবে দেশপ্রেমের জন্য ধর্মীয় সংস্কারকেও তখন ব্যবহার হতে দেখা গেছে কিন্তু সবই হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে এবং দেশপ্রেমের জন্য হিন্দু-মুসলিমের অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্য দিয়ে। সে সব দিনের ঐ হিন্দু-মুসলিম একতার কথা আজও গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করি। চট্টগ্রাম শহরের পথে পথে বিলাতী কাপড় পোড়ানোর মিলিত অভিযানে গান হয়েছে,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশী
আর সাধ্য নাই।"

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য যে আহ্বান, তাতে সাড়া দিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (তিনি পূর্ব

বাংলার বিক্রমপুরের অধিবাসী)। তিনি তখন কলিকাতা হাই কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন। প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হিসাবে ভারতজোড়া তাঁর নাম, কলিকাতায় একাধিক বড় বড় পাকা বাড়ী। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীকে নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আইন ব্যবসায় ত্যাগ করলেন, নিজের সব বাড়ীগুলি জনসাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করলেন এবং স্বেচ্ছায় নিঃস্ব হয়ে, বাংলা ও ভারতের গুণমুগ্ধ মানুষের কাছে পরিচিত হলেন "দেশবন্ধু" ব'লে।

সারা বাংলায় তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতা। সেই জনপ্রিয় খ্যাতনামা জননেতা দেশবন্ধু চট্টগ্রামে এলেন ১৯২১ সালে আন্দোলন প্রচারের জন্য। তিনি এসে উঠলেন তরুণ ব্যারিষ্টার চট্টগ্রামের অন্যতম দেশপ্রেমিক ও শ্রদ্ধেয় জননেতা যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের রহমতগঞ্জের বাড়ীতে। বিলাত ফেরত যতীন্দ্র মোহন ব্যারিষ্টারীতে মাত্র সুনাম অর্জন করছেন। তাঁর চোখে ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠালাভের রঙ্গীন স্বপ্ন। দেশবন্ধু তাঁকে ধরে বসলেন, এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য। তাঁকে একেবারে না হলেও অন্ততঃ তিন মাসের জন্য আইন ব্যবসায় ত্যাগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকল শক্তি নিয়ে তাঁকে প্রচারে ও সংগঠনে নেমে যেতে হবে—দেশবন্ধু এই অনুরোধ করলেন। যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু আন্দোলনের মায়ায় ও দেশপ্রেমের দায়িত্বে তিনি প্রথমে তিন মাসের জন্যই ব্যারিষ্টারী ছাড়লেও ঐ তিন মাস অতিক্রান্ত হলেও অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত তিনি আর আইনব্যবসায়ে যোগ দেন নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে তখনকার 'গান্ধী ময়দানে' (পরবর্তীকালে মোসলেম হল প্রাঙ্গণে, বর্তমানে 'জেমিসন' প্রসূতি হাসপাতালের পূর্ব দিকের মাঠে) যে বিরাট সভা হয়, তখনকার দিনে তত বড় সভা কেউ দেখেনি। সেই সভার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শক্ত বাঁশের বহু খুঁটি দিতে হয় এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবক সভার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দরকার হয়। শহরের চার পাশের গ্রাম থেকে, কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড় থেকে নদী পার হয়ে, অগণিত হিন্দু-মুসলিম এসে গান্ধী

ময়দানে, হাসপাতালের পাহাড়ে, মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে রাস্তায় জমায়েত হয়। সভা আরম্ভ হবার অল্পক্ষণ পরে, এখন যেখানে একটি বড় ছাপাখানা, সেই প্রবেশপথে বেশ গোলমাল দেখা গেল। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মাসে ৭৫০˙০০ টাকা বেতন পান। তিনি খালি গায়ে খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে এসে সভায় ঢুকতে চেষ্টা করছেন দেখে অনেক পরিচিত ছাত্র বিস্মিত হয়। পরে তাঁকে সসম্মানে সভাস্থলে নিলে, হিন্দুদের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেও তিনি দেশবন্ধুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। সেখানে দেশবন্ধু ঘোষণা করলেন যে, অধ্যাপক নৃপেন বানার্জী বড় সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে সেদিন থেকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

এই সময় দূরে ঐ প্রবেশ পথে আবার একটু বেশী গোলমাল ও জটলা লক্ষ্য করে দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী প্রমুখ নেতারা, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে কিসের গোলযোগ তা দেখতে পাঠালেন। তারা খবর আনল, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের দপ্তরী সারদা দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তার মাসিক ১২˙০০ টাকা বেতনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছে। দেশবন্ধু সানন্দে বললেন, গরীব দপ্তরীর এই ত্যাগ অনেক বড়, তাকে যেন সসম্মানে সভাবেদীতে আনা হয়। তখন সবাই তার আসবার জন্য রাস্তা করে দেয়। কাছে আসতেই দেশবন্ধু এগিয়ে গিয়ে দপ্তরী সারদাকে এমন ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরেন যে, গোটা জনসমুদ্র তাতে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই সময় অনেক উকিল, মোক্তার তাঁদের আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চট্টগ্রাম সফরের ফলে এই জিলার স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নূতন জোয়ার আসে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের কর্মীরাও এই সময় তাঁদের গোপন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে গণ-আন্দোলনের এই বিরাট স্রোতের সামিল হয়ে যায়। সূর্য সেন, গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী,* অম্বিকা

* গাছবাড়িয়া উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি বহু বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করেন, ১৯৫৫ সনে এক ছুটিতে তিনি ও একটি ছাত্র নদী পার হয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মাঝখানে ঝড় উঠলে নৌকা ডুবে যায় এবং ছাত্রটিকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

চক্রবর্তী ইত্যাদি বিপ্লবী নেতা তখন এই অসহযোগ আন্দোলনে তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে যোগ দেন এবং পরিচালনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় দেওয়ানবাজার দেওয়ানজী পুকুর পাড়ে বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা জুলু সেনের বাসায় বাংলার সব গোপন বিপ্লবীদলের নেতাদের এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে অসহযোগ আন্দোলনের অন্তরালে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের মধ্যে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। যেহেতু তখনও পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক সুস্পষ্ট চেতনা অথবা লক্ষ্যগত বিভেদ ছিলনা এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্বের দ্বন্দ্বই ছিল বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের প্রধান কারণ, তাই বহু আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও ঐ ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই সময় চাঁদপুরের একটি দুর্ঘটনার ফলে সারা বাংলায় এক নূতন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আসামের চা বাগানের ইউরোপীয় মালিকরা চা-শ্রমিকদের উপর যে অকথ্য জুলুম করত, তার কলঙ্কজনক ইতিহাস তখন সকলেরই আলোচনার বস্তু ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন গিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ঐ চা-শ্রমিক নরনারীকেও বিচলিত করে। মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের ইউনিয়ন মারফত সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কায়দা তখনও তারা শিখতে পারেনি। তাই তারা স্থির করে যে, তারা দল বেঁধে বাগান ত্যাগ করে তাদের নিজেদের প্রদেশ বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানে ফিরে যাবে। ইউরোপীয় মালিকদের স্বার্থে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঐ চা শ্রমিকদের রেলের টিকেট বন্ধ করে দেয়। বেপরোয়া হয়ে দলে দলে শ্রমিকরা হেঁটে রওনা হয় এবং কয়েক হাজার শ্রমিক নরনারী এসে চাঁদপুরের রেল ষ্টেশনে সমবেত হয়। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দে যাওয়ার আর উপায় নেই কারণ রেল কর্তৃপক্ষ নদী পার হওয়ার ষ্টীমারেরও মালিক। তাই বাধ্য হয়ে চাঁদপুর রেল ষ্টেশনের বিশ্রাম ঘরে ও তার আশেপাশে শ্রমিকদের অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে থাকতে হয়। তখন মিঃ কে, সি, দে ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার। চাঁদপুর এস, ডি, ও-র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ষ্টেশনের বিজলী বাতি নিবিয়ে দিয়ে ও কমিশনারের নির্দেশে ঐ অসহায় শ্রমিকদের রেল ষ্টেশন ত্যাগ করার আদেশ অমান্য করাতে, পুলিশ

তাদের উপর গুলী চালায়। নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর এই বর্বরোচিত অত্যাচার তখন "চাঁদপুর কুলী নিগ্রহ" হিসাবে দেশে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন চট্টগ্রামের সর্বপ্রধান জনপ্রিয় নেতা। চাঁদপুরের এই দুর্ঘটনার সংবাদ তখন যতীন্দ্রমোহনের কানে এসে পৌঁছায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাঁদপুর চলে যান। তাঁর সঙ্গে তখন তাঁর সেক্রেটারী দ্বিজেন কুণ্ডু, বিশিষ্ট কর্মী মোহাম্মদ হারুন (পরে রেলওয়ে ইউনিয়নের প্রধান নেতা) ও জালাল আহমদ (জগলুল) চাঁদপুরে যান। যতীন্দ্রমোহন চাঁদপুরে গিয়েই স্থানীয় কংগ্রেস নেতা হরদয়াল নাগের সহযোগিতায় নির্যাতিত শ্রমিকদের জন্য রিলিফ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করেন। চাঁদপুরের বড় বড় পাট ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের থাকার জন্যে তাঁদের প্রশস্ত গুদাম অনেকগুলি ছেড়ে দেন। চাঁদপুরের "কুলী নিগ্রহের" প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত লাইনে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট হয়ে যায়। সেই সময় চট্টগ্রাম রেলওয়ে ধর্মঘট সারা বাংলাদেশে এক বিরাট সাড়া জাগায়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মজুর থেকে শুরু করে কেরাণী ও অন্যান্য অনেক বড় বড় রেলওয়ে কর্মচারীও এই ধর্মঘটে যোগ দেন। এর ফলে রেলগাড়ীর চাকা একেবারে অচল হয়ে যায়। কড়া সশস্ত্র বাহিনীর পাহারায় অল্প কয়েকখানা গাড়ী দিনে দুইবার কেবল জরুরী সরকারী ডাক নিয়ে চট্টগ্রাম ও চাঁদপুরের মধ্যে যাতায়াত করত। চট্টগ্রামের কংগ্রেস ও খিলাফত প্রতিষ্ঠান দু'টি তখন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কার্যতঃ একই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়। উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একসঙ্গে তখন পিকেটিং করার ও অন্যান্য কাজ করার মধ্য দিয়ে এক সুস্থ ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়। রেল ধর্মঘটের ফলে ডাক স্বাভাবিকভাবে না চলায় চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম কর্মীরা চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত রেল লাইন ধরে হাঁটা ডাক বিতরণের ব্যবস্থা করে।

রেল ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে চট্টগ্রামের বি-ও-সি, টার্ণার মরিসন ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীর কেরাণী ও মজুররা ধর্মঘট করে ও সারা শহরে মিছিল করে। চট্টগ্রাম কলেজ, সরকারী কলেজিয়েট স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল ইত্যাদি থেকে ছাত্ররাও এই সময় ধর্মঘট করে।

এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের প্রথম অঙ্কুর সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চট্টগ্রামে বর্তমানে যেখানে পুলিশ সুপারের অফিস, তখন ঐ ঘরে ছিল মোসলেম হাইস্কুল আর কিছু অংশ 'এন্তেকালী কাছারী'। পাহাড়ের উপর ঐ ঘরটি চট্টগ্রামে ১৯শ শতাব্দীতে অবস্থানরত পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা তাদের গুদাম ও অফিসের জন্য তৈরী করেছিল। পাহাড়ের সানুদেশে খেলার মাঠ আজ চট্টগ্রামের বড় বড় জনসভার স্থান "লালদিঘীর ময়দান" হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে।

ঐ দালানের এক অংশে তখনকার আন্দোলন দমনের জন্য একদল গুর্খা সৈন্য রাখা হয়। পানোন্মত্ত গুর্খা সিপাহী পাথরঘাটার দিকে কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর (তখন ছিল বর্তমান মুসলিম হাইস্কুল যেখানে অবস্থিত সেই বাড়ীতে) ছাত্র পুলিন চক্রবর্তীকে বেত দিয়ে আঘাত করে। বৃটিশ সরকারের সেই গুর্খা সৈনিকেরা ঐ ছাত্রকে আঘাত করার প্রতিবাদে শহরের সব স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পরদিন বিকালেই জে, এম, সেন হল প্রাঙ্গণে এক সভা করে। চট্টগ্রামে কেবল ছাত্রদের উদ্যোগে সম্ভবতঃ এটাই প্রথম ছাত্রসভা।

এই সভায় স্থির হয়, পরদিন সকাল ১০টায় সব স্কুলে গুর্খা সৈনিকের ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে ধর্মঘট করা হবে। ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা শহরের ছাত্রগণ ধর্মঘট করে এবং রেল ও অন্যান্য ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সভা ও মিছিল ইত্যাদিতে যোগ দেয়।

চট্টগ্রাম রেল ধর্মঘটের সময় রেল কর্তৃপক্ষ আদেশ দেয় যে, ধর্মঘটীদের সকলকে চট্টগ্রাম ও পাহাড়তলীর সমস্ত রেলওয়ে কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যেতে হবে। চট্টগ্রাম ষ্টেশনের নিকটবর্তী কোয়ার্টারের রেল-কর্মচারীরা এসে জে. এম. সেন হল এবং তার চারপাশে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। অসুবিধায় পড়েন পাহাড়তলী রেলওয়ে কোয়ার্টারের কর্মচারীরা। রেলকর্মচারীদের জন্য নিয়মিত যে সরকারী গাড়ী তাও অচল, অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থাও তাঁরা করতে পারছিলেন না। তখন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন নীচের বর্ণিত কর্মীদের যত ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ী লাগে তার ব্যবস্থা করে পাহাড়তলীর

রেলকর্মচারীদের চট্টগ্রামে নিয়ে আসার জন্য পাঠান: মোহাম্মদ হারুন, সামসুদ্দীন সাসারামী (যার চশমার দোকান ছিল বক্‌শির হাট পুলিশ বিটের সামনে), প্রেমানন্দ দত্ত (যিনি রেলওয়ে ডাকাতির কিছুদিন পর পল্টনে বিপ্লবীদলের নির্দেশে প্রফুল্ল দারোগাকে গুলী করে হত্যা করেন), মোহাম্মদ সিরাজুল হক (শেখ-এ চাটগাম কাজেম আলীর ২য় পুত্র), গণপতরাম গোঙ্গা (তখনকার বিখ্যাত খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা মেয়ার কোম্পানীর ম্যানেজার), মাহামুদুল হক, মোহাম্মদ মুসা, জালাল আহমদ (জগলুল) এবং সুখেন্দু সেন—মোট নয়জন এই দায়িত্ব পালন করতে যান।

সেদিন ছিল তুমুল বর্ষণ, তার ভিতরেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা অনেক ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী যোগাড় করে পাহাড়তলী নিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা রাত্রি প্রায় ১২টায় শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কদমতলী পর্যন্ত পৌঁছলে এই নয়জন কর্মীকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানায় এনে সারারাত আটক করে রাখে। পরদিন শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

পাহাড়তলী থেকে রেল ধর্মঘটীদের শহরে আনার প্রচেষ্টায় এভাবে অন্যায়ভাবে বাধাদানের প্রতিবাদে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ,তাঁর সহকর্মী চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজেম আলী মিঞা, শিখ মন্দিরের মোহান্ত কৃপালদাস উদাসী, শাহ বদিয়ল আলম, আবদুল করিম নিজামপুরী, ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় প্রজাপতি (ছাত্র) ইত্যাদিকে নিয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা স্থির করেন যে, তাঁরা মিছিল করে চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী কালীবাড়ী, কাতালগঞ্জের অলি খাঁ মসজিদ ও শিখ মন্দিরে যাবেন এবং ঐ তিনটি প্রধান ধর্মস্থানে আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করবেন। ২০-১০-২১ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার ঐ মিছিল যখন ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে আসে, তখন ঐ মিছিলের সামনে থেকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য নেতাদের ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরদিন এর প্রতিবাদে জে. এম. সেন হলে এক বিরাট জনসভা হয়। সভার পূর্বে লক্ষ লক্ষ

হিন্দু-মুসলিম জনতার দাবীতে নেতাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তার এক সপ্তাহ পরে পুলিশের কাজে বাধাদানের মিথ্যা অভিযোগে শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী, সুখেন্দু সেন, কালী শঙ্কর চক্রবর্তী (সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক "জ্যোতিঃ" পত্রিকার সম্পাদক) ও সিরাজুল হক গ্রেপ্তার হন এবং মামলায় তাঁদের চারমাস করে কারাদণ্ড হয়।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, চট্টগ্রাম কোর্টে তাঁদের বিচার হয় এবং সকলের ৬ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গোপনে গোপনে তাঁদের কলিকাতার আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করার ব্যবস্থা করে বৃটিশ সরকারের পুলিস যখন চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে নিয়ে যায়, তখন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম দেশবাসী খবর পেয়ে ষ্টেশন রোড থেকে শুরু করে ষ্টেশনের সব প্ল্যাটফরমে এসে জমায়েত হয় তাদের প্রিয় নেতাদের বিদায় দেবার জন্য।

ঐদিকে চাঁদপুরের চা শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের খবর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের কাছে পেয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চালান। রেল ধর্মঘটের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত নৌকায় চড়ে আসতে হয়। তাঁর সঙ্গে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী প'রে আসেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মানবপ্রেমিক ইংরেজ অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ডরুজ। বহু আলাপ আলোচনার পর এইসব চা শ্রমিকদের নিজ নিজ প্রদেশে পাঠাবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

চট্টগ্রামের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, আজ তাঁদের সেদিনকার দেশপ্রেমের, নির্ভীক সংগ্রামের, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের কথা স্মরণ করলে আনন্দ ও গৌরবের অপূর্ব স্মৃতিতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। দেশের ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, আইনজীবি, ব্যবসায়ী—সব শ্রেণীর, বর্ণের ও ধর্মের মানুষ সেইদিন মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার জন্য গণ-আন্দোলনে বিপুল ভাবে যোগ দেয়। "বিভেদ কর ও শাসন চালাও" —বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই হীন কৌশল শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম শতকের "বঙ্গভঙ্গ নিরোধ" আন্দোলনের সময় থেকে।

কিন্তু "অহিংস অসহযোগ" আন্দোলনে সারা ভারতের নির্যাতিত, নিপীড়িত শোষিত মানুষ বিপুলভাবে সাড়া দেয়।

চট্টগ্রামে সেইদিনকার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন যখন ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে গ্রেপ্তার হন, তার পরদিন তাঁকে বিচারের জন্য কোর্টে নেওয়া হয়। তখন চট্টগ্রামের সাধারণ হিন্দু মুসলিম তাঁকে 'বারেষ্টর সাহেব' বলত। তাঁর গ্রেপ্তারের খবর দাবানলের মত শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে যখন কোর্টে আনা হয়, কোর্টের পাহাড়ের উপর দলে দলে জনতা উঠতে আরম্ভ করে। কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড় থেকে নৌকা সাম্পান করে গ্রামবাসী আসছে দলে দলে। ক্রমে কাছারী পাহাড়, তার চারিদিক, পরে লালদিঘীর পাড়, কোতোয়ালী থানা, ফিরিঙ্গী বাজার পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষ ভিড় করে আছে, তাদের দাবী তাদের "বারেষ্টর" সাহেবকে ছেড়ে দিতে হবে। চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতা ডাঃ বেণীদাস, শেখ-এ চাটগাম কাজেম আলী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা যতীন্দ্রমোহনকে জামিনে আনার জন্য খুব চেষ্টা করেন। বিকাল ৪টা ৫টার দিকে এক বিরাট জনসমুদ্রে কিছুটা বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। এমন অবস্থা হল, ভয় হল যে এই অসংগঠিত জনতা বুঝি আর "অহিংস" থাকে না। তখন শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী চট্টগ্রাম কোর্টের দোতালার দক্ষিণ দিকের খোলা ছাদ থেকে জনসাধারণের কাছে চট্টগ্রামী কথ্য ভাষায় এক বক্তৃতায় বলেন, "বন্ধুগণ আমাদের দেশে ইংরেজদের সংখ্যা নগন্য মাত্র, এক ধমকে তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু তা দিতে হবে ঐক্য আর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে।"

"আপনারা যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আজ সমবেত হয়েছেন, তাঁরা যদি একযোগে একটি করে ঢিল ছোঁড়েন তাতে ইংরেজের এই কোর্ট চুরমার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমরা অহিংসভাবে আন্দোলন করছি। আপনাদের দাবী ওরা পূরণ না করে পারবে না। এখনি 'বারেষ্টার' সাহেবকে আমরা নিয়ে আসছি"—বাইরে জনতার সংখ্যা ও মনোভাব দেখেই সম্ভবতঃ অল্পক্ষণের মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে জামিন দেওয়া হয়। জনতার সামনে কোর্টের দোতালার দক্ষিণ দিকের খোলা বারান্দায় এসে যখন তিনি দাঁড়ান, তখনকার উল্লাসধ্বনি এক বিরাট

রূপে ফেটে পড়ে। মানুষের ভিড়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের জন্য কোর্ট পাহাড়ের উপর কোন গাড়ী নেওয়া সম্ভব হয়নি। নীচে পূর্বদিকের রাস্তার পশু হাসপাতালের সামনে একখানা মোটরগাড়ী তাঁর জন্য রাখা হয়েছে। কোর্ট পাহাড় থেকে একরকম জনসাধারণের হাতে হাতে তাঁকে বহন করে নীচে রাস্তায় মোটরের কাছে আনা হ'ল এবং বহুকষ্টে তিনি কয়েকজন নেতাসহ তাতে উঠলেন। কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে মোটর চালানো অসম্ভব। তখন জনতার ভিতর থেকেই প্রস্তাব এল, মোটর গাড়ী শুদ্ধ নেতাদের তারা কাঁধে করে নেবে এবং প্রকৃতপক্ষে সেদিন সেই মোটরগাড়ীটি সমবেত মানুষের কাঁধে করে "গান্ধী ময়দানে" নিয়ে আসা হয়েছিল। বিরাট সভা, হাসপাতালের পাহাড় ও আন্দর-কিল্লার রাস্তা সব লোকে লোকারণ্য। দেশপ্রিয় বক্তৃতা শুরু করলেন, একটু পরেই এল তুমুল বৃষ্টি। যতীন্দ্রমোহনও ভিজছেন আর বিরাট জনতা বৃষ্টি মাথায় করে তাঁর বক্তৃতা শুনছে।

সবার কাপড়-চোপড় যখন একেবারে ভিজে গেছে তখন প্রস্তাব হল, এই খোলা ময়দান থেকে গিয়ে জে-এম-সেন হলে সভা হোক। সমস্ত লোক গান্ধী ময়দান থেকে জে-এম-সেন হলে চলে এল। দেশপ্রিয়ের বাসা নিকটেই, সবার অনুরোধে তিনি ভিজা কাপড় ছেড়ে অনেক আইন বই নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে জে-এম-সেন হলের সভায় ফিরে এলেন। রাত দু'টো পর্যন্ত চলল তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা, যার মধ্যে তিনি আইন বইয়ের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে, তাঁদের গ্রেপ্তার করা বে-আইনী হয়েছে। এত রাত পর্যন্ত ভিজা কাপড়ে সেদিনকার চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলিম সভায় বসেছিল।

তারপর ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য একটি সংগ্রাম পরিষদ হয়। তাতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ১ম অধিনায়ক ছিলেন তৎকালীন বিপ্লবী নেতা গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী। তাঁর গ্রেপ্তারের পরে অধিনায়ক হন জালাল আহমদ (জগলুল)। স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যাজ দিয়ে থানা বা পুলিশ বিটের সামনে গিয়ে তোলে দু'টি ধ্বনি —'বন্দেমাতরম' ও 'আল্লাহু-আকবর'। চট্টগ্রামের ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়েছিল, পাঁচ বা ততোধিক লোক এক সঙ্গে ঐ দু'টি ধ্বনি দিলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। এইভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য সেদিন হিন্দু মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক

দলে দলে এত আসতে থাকে যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল এক সমস্যা। মানুষ জেলে যেতে ভয় করে—কিন্তু সেদিন ঐ পাঁচ জনের দলে অন্তর্ভুক্ত হ'তে দেরী হলে দুঃখিত হতে দেখা গেছে, আকুতি লক্ষ্য করা গেছে, আগে যেন তাদের জেলে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে বয়স নেহাত কম বলে কোন ছাত্রকে পুলিশরা কোতোয়ালী নিয়েই ছেড়ে দেওয়ার ফলে, সেই ছাত্র বার বার অনুরোধ করে পরবর্তী দলের সঙ্গে গেছে। ঐ ভাবে তৃতীয় কি চতুর্থবার চেষ্টা করার পর সে জেলে গেছে। সেই আন্দোলনের ফলে চট্টগ্রাম জেলে এত লোক জমে যায় যে জেলের ওয়ার্ডগুলিতে তাদের বসবার জায়গা পর্যন্ত দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। জেলের নিয়মে প্রতি কয়েদীকে দু'খানা করে কম্বল দেওয়ার বদলে, তখন প্রতি দু'জনে একখানা করে কম্বল দেওয়া হয়, পরে তাও সম্ভব হয় না। কিছুদিন পরে আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়ে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করে।

সেই আন্দোলনে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই বড় বড় নেতা তখন চট্টগ্রামে আসছেন। মহাত্মা গান্ধী তখন চট্টগ্রামের আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও শক্তি দেখে তাঁর "তরুণ ভারত" সাপ্তাহিকে চট্টগ্রামকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে বলেছিলেন "চট্টগ্রাম সবার আগে" (Chittagong to the fore !) বড় নেতারা এলেই গান্ধী ময়দানে বিরাট সভা হত ও তাতেই অর্থ সংগ্রহ করা হত। দেশপ্রিয়ের সুযোগ্য সহধর্মিনী ইংরেজ মহিলা। তিনি তখন খদ্দরের শাড়ী প'রে একদিন সভায় এসেছেন। এই আন্দোলনে অর্থ সাহায্যের জন্য দেশ-প্রিয় গৃহিণী মিসেস নেলী সেনগুপ্তা তাঁর হাত থেকে দু'খানা সোনার চুড়ি খুলে দান করলেন। ঐ চুড়ি দু'খানা সঙ্গে সঙ্গে নীলামে দেওয়া হল—শেষ পর্যন্ত তা পাঁচশত টাকায় একজন কিনে নিলেন। আর এক-দিন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুল বারী চৌধুরী নিজে সভায় দাঁড়িয়ে স্বরাজ্য তহবিলে দশ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। বিশিষ্ট লুঙ্গি ব্যবসায়ী আবদুল গনি চৌধুরী একবার গান্ধী ময়দানের সভায় পাঁচ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। ইংরেজ শিক্ষাবিদ রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ডরুজ যখন চট্টগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা দেবার জন্য আসেন, তখন গান্ধী ময়দানের সভায় চট্টগ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে এক মানপত্র দেওয়া হয়। সেই মানপত্রখানা সোনার

জলে ছাপিয়ে তাঁকে হাতে হাতে দেওয়া হয়। তাতে তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করেন। ঐ স্বাক্ষরিত মানপত্রখানা নিলামে দেওয়া হয় সভায়। ক্রমে ক্রমে দর উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম সোডা লেমনেড ব্যবসায়ী রামচন্দ্র সিংহ তা পাঁচশত টাকায় কিনে নিয়ে যান। অন্যান্য মানপত্রগুলিতেও এওরুজ সাহেব স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গেই একশত ও পঞ্চাশ টাকায় হিন্দু মুসলিম অনেকে সেই সভায় কিনেছিলেন স্বরাজ্য তহবিলে চাঁদা দেবার আগ্রহে।

এই রকম অভুতপূর্ব আত্মদানের ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও সেদিনকার সেই গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দুর্বল ছিল। কারণ সেই জনসাধারণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে "স্বরাজ" বা দেশের স্বাধীনতার জন্য পুলিশের লাঠি, গুলী, জেল জুলুমকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরী ছিল, নেতৃত্ব তাদের এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেনি সচেতন ভাবে। কারণ নবগঠিত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও অতি দুর্বল এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তারা বিরোধী ছিল। এই নেতৃত্ব অবশ্য আগেকার নিছক দরখাস্ত মারফত আবেদন-নিবেদনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিছুটা উন্নত। তাই তারা গণ-আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু তাও তার পূর্ণ পরিণতির দিকে যাবার জন্য নয়—ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করে কিছুটা সংস্কার, কিছুটা শ্রেণীগত সুযোগসুবিধা আদায় করা—এই ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই যখন গুজরাটের চৌরিচোরায় কৃষকশ্রেণী তাদের দাবী আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে, তখনই আন্দোলনের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী, আন্দোলন "অহিংস" পথ পরিত্যাগ করে হিংসার পথ নিচ্ছে, এই অজুহাতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

১৯২১ এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের দোহাজারী—দেওয়ানহাটে পুলিশ দেশপ্রেমিক মাহমুদুর রহমানকে গুলী করে হত্যা করে। এই সময় আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার গ্রামে গ্রামে বিশেষ পুলিশ পাঠায়। গ্রামে এই সব পুলিশ জনসাধারণের উপর নানারকম জুলুম করত, হাট, বাজার, দোকান থেকে জিনিসপত্র তারা

দাম না দিয়ে জোর করে নিত। দোহাজারী—দেওয়ানহাটে ঐভাবে যখন পুলিশ জোর করে দাম না দিয়ে জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল, অখ্যাত দেশভক্ত মাহমুদুর রহমান তার প্রতিবাদ করেন। পুলিশ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করে হত্যা করে। এইভাবে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ একজন দেশবাসীকে খুন করার ব্যাপারে সরকার তখন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে না এবং অপরাধী পুলিশকে কোন শাস্তি তখন দেওয়া হয়েছিল না।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে তখন কাউন্সিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে ইংরেজদের গোটা নির্বাচন পদ্ধতিকে হেয় প্রমাণ করার জন্য স্থির হয় যে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে দুইজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। শহরের আলকরণ এলাকার আমীর আলী এবং পাঠানটুলী এলাকার আইয়ুব আলী, এই দুই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান তখন বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিল। শহরের ফিরিঙ্গী বাজারের মুদী দোকানের দোকানদার আবদুর রহমান ও পাথরঘাটার জেলে অপর্ণা চরণ পাতর কেন্দ্রীয় পরিষদে (দিল্লী) নির্বাচিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম শহরের রামলাল মুচীকেও দাঁড় করানো হয়েছিল, সে অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে অনেক ছাত্র ও শিক্ষক সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ত্যাগ করে। তখন সমস্যা সৃষ্টি হয় যে, ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট হবার মত। তাই তখন শহরে স্থানীয় নেতাদের উদ্যোগে কিছু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন নন্দনকাননে হরিশদত্ত প্রতিষ্ঠিত এই রকম এক জাতীয় বিদ্যালয় ন্যাশনাল হাইস্কুলে প্রথম শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করার পর চট্টগ্রামের এই আন্দোলনও ক্রমে থেমে যায়। খদ্দর ব্যবহার, চরকায় সূতা কাটা, তাঁতঘর প্রতিষ্ঠা করে তাতে খদ্দরের বিভিন্ন কাপড় বোনা ও বিক্রয় করা ইত্যাদির মধ্যেই চট্টগ্রামের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-এর কর্মীরা আত্মনিয়োগ করেন—কেউ কেউ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল,

হিন্দু মুসলিম দেশবাসীর মধ্যে এক নিবিড় ও অন্তরঙ্গ আদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম দেশপ্রেমিকদের মধ্যে এই সখ্য অটুট ছিল। ১৯২৩-এ চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী কংগ্রেসে যে প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, তার গঠন লক্ষণীয়। চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিধি হিসাবে যান:—

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, মহিম চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, অলি আহমদ অলি ইসলামাবাদী, বঙ্কিম দস্তিদার, তাঁর স্ত্রী নিরুপমা দস্তিদার, জালাল আহমদ (জগলুল) ইত্যাদি।

চার

এখন বিপ্লবীদের কথায় ফিরে আসি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে শ্রেণীচেতনা জনগণের মধ্যে না জাগলেও, বিরাট জনতা তখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহীদের অভ্যুত্থানই যে দেশের সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন তা আজ স্বীকৃত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই প্রথম গণ-অভ্যুত্থান অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল প্রচুর। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ (যিনি 'জাফর' ছদ্মনামে অনেক উন্নত ধরনের উর্দু কবিতা রচনা করেছেন) এবং তাঁর শিশু-পুত্রদের যে নিষ্ঠুরতা ও লাঞ্ছনা ঐ আন্দোলনে সহ্য করতে হয়, ব্যারাকপুরে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডেকে যেভাবে ইংরেজ বণিক শাসকরা ফাঁসি দেয় এবং তাঁতিয়া তোপী, বীরাঙ্গনা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইত্যাদি দেশভক্ত যেভাবে আত্মাহুতি তখন দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যদি তখন সচেতন ও সুসংগঠিত জনসাধারণের সংগ্রাম যুক্ত থাকত, তাহলে স্বাধীনতার সেই সংগ্রাম অনেক দূর এগিয়ে যেত।

তারপর থেকে ১৯২১ সালের এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা তৈরী করে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, বালেশ্বরে বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের যে সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধ ও আত্মাহুতি—তার সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে এসব অমর বিপ্লবীরা হেলায় তাঁদের প্রাণ বিলিয়ে গেছেন—দেশবাসী তার সংবাদ শুনেছে, তাদের আত্মদানের প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কেউ কেউ গোপনে অর্থ ও আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু দলে দলে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি, তাদের ব্যক্তিগত অথবা চক্রগত ও দলগত আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে পারেনি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হ'লে এর নেতৃত্বের শ্রেণীবিন্যাস হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। যাঁরা এই আন্দোলনের পরিচালক তাঁরা ছিলেন নবগঠিত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ধনীশ্রেণীর

প্রতিনিধি। তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাঁদের মূলতঃ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। চাপ দিয়ে নিজের শ্রেণীর স্বার্থ আদায় করার প্রচেষ্টা এবং আপোষমূলক মনোভাবই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের নেতৃত্বে ১৯২১ এর আন্দোলনে বিপুল সংখ্যায় যে হিন্দু মুসলিম, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, এমন কি ছোটখাট জমিদার জোতদারও যোগ দেয়, অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শ তাদের ছিল। তাই বৃটিশ ভারতে ১৯২১-এ গান্ধীজীর আহ্বানে যে আন্দোলন হয় তার শত দুর্বলতা সত্ত্বেও, এই আন্দোলনেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনসাধারণ যোগ দেয়, পুলিশের লাঠি, গুলী ও কারাগারকে সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে বৃটিশ ঐতিহাসিকদের মতে যে আন্দোলন কয়েকটি সিপাহীর "বিপ্লব" হিসাবেই চিত্রিত, তার পরেই জনসাধারণের ব্যাপক অংশের নৈতিক ও প্রত্যক্ষ সমর্থনের উপর ভিত্তি করে এই ১৯২১-এর প্রথম গণ-আন্দোলন।

বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব বজায় রেখে গণ আন্দোলনের এই নতুন জোয়ারের স্রোতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের প্রায় সকলেই এসে যোগ দেয়। শুধু তাই নয়, স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়কত্ব এবং অন্যান্য জরুরী কাজের নেতৃত্ব ঐ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবীরা গ্রহণ করে। তাঁরা অবশ্য নীতি হিসাবে "অহিংসায়" বিশ্বাস করতেন না। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের মারফত মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনই ছিল বিপ্লবীদের আদর্শ। "হিংসায়" পূর্ণ বিশ্বাসী বিপ্লবীরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কেবল এর পরিচালনায় সুদক্ষ সহায়তা করেন তা নয়, এর মধ্য থেকে সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ তরুণদের গোপনে দলভুক্ত করার কাজও তাঁরা সম্পন্ন করেন।

১৯১৯ থেকে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদলের মধ্যে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ছাড়াও দুইটি চিন্তাধারার সংঘাত শুরু হয়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে জার্মেনীকে বৃটিশরা পরাজিত করেছে, এই কথাই সরকারী মহল থেকে নানাভাবে ঘোষণা করে, এই দেশের সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করা ঠিক হবে না। তারা কেমন শক্তি ধরে এই যুদ্ধে কি তার প্রমাণ হল না?

কিন্তু তাদেরই মূর্খতাবশতঃ পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, চাঁদপুরের কুলীনিগ্রহ ইত্যাদি বর্বরতা তারা যখন অনুষ্ঠান করে, তখন থেকে বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে তার প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতে থাকে এবং তার আয়োজন শুরু করে।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের হাতে তখনও অস্ত্রশস্ত্র বেশী ছিল না। সম্ভবতঃ দুইটি পুরাণো পিস্তল, কিছু গুর্খা ভোজালী আর বিপ্লবীদলের সদস্য কয়েকজনের অভিভাবকদের লাইসেন্স করা বন্দুক। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন পূর্বেই বলা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী যখন সেই আন্দোলনকে প্রত্যাহার করলেন, তখন বিপ্লবীরা নিজেদের গোপন সংগঠন ও অস্ত্রসংগ্রহের প্রতি আবার বেশী সক্রিয় হয়ে উঠলেন। বাংলার অন্যান্য জেলার বিপ্লবীরা আগে থেকেই ডাকাতি দ্বারা বিপ্লবী সংগঠনের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করতেন। কিন্তু চট্টগ্রামে তখন পর্যন্ত (১৯২৩) কোন রাজনৈতিক ডাকাতি হয়নি।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত এক যুবক তখনকার বিখ্যাত ৪৯নং বাঙ্গালী রেজিমেণ্টে যোগ দিয়ে সম্ভবতঃ নায়েক পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১ম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন মধ্য প্রাচ্যের মেসোপটেমিয়ার ঐ রেজিমেণ্টের একটি অংশকে করাচীতে আনা হয়। চট্টগ্রামের ঐ নায়েক তার অধীনস্থ আট নয়জন সিপাহীকে নিয়ে তখন করাচীর একটি সরকারী অস্ত্রাগার পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ওখানকার আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরিকল্পনা করেন যে ঐ অস্ত্রাগার থেকে তাঁরা রাইফেল, রিভলভার ইত্যাদি বাংলার বিপ্লবীদলকে গোপনে দিয়ে দেবেন। সেই সিদ্ধান্ত করে তিনি সামান্য কয়দিনের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন এবং কলিকাতা ও চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর নাম নগেন সেন (জুলু সেন হিসাবে পরিচিত), বাড়ী রাউজান থানার কোয়েপাড়ায়। কিন্তু এতদূর থেকে গোপনে ঐ অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব হয় না।

অথচ বিপ্লবী কাজ করার জন্য তখন চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীদের এক বিশিষ্ট অংশ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে যদি সশস্ত্র

অভ্যুত্থান করতে হয়, তার জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। সেইজন্য প্রয়োজন অর্থের এবং ডাকাতি ছাড়া সেই অর্থ সংগ্রহের কোন পথ নেই। এই সম্পর্কেই তখন জোর আলাপ আলোচনা চলছে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের ভিতরে।

বিপ্লবীনেতা সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী তখন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার দেওয়ানজীপুকুর পাড়ে 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে ওখানে থাকেন। সেখানে গোপনে বিপ্লবীরা জমায়েত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তখনও চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল একটিই ছিল। বাংলার যে প্রধান বিপ্লবীদল "যুগান্তর" এবং "অনুশীলন" এর কোনটির সঙ্গেই একেবারে মিশে যাওয়ার কোন সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল তখনও গ্রহণ করেনি। বরং চট্টগ্রামদল স্বতন্ত্র বিপ্লবীদল হিসাবে কাজ করে যাবে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা শ্রীযুত চারুবিকাশ দত্ত ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে "অনুশীলন" দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের মধ্যে প্রথম ভাঙ্গন আসে। বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব এই কাজের জন্য তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করে কিন্তু তিনি কোন কৈফিয়ত দেন না, সেইজন্য বিপ্লবীদলের জুলু সেন, অনুরূপ সেন, অনন্ত সিংহ ইত্যাদি চারুবাবু সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানান। কিন্তু সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখ নেতারা তা সমর্থন করেন না। কেবল দল থেকে তাঁর বহিষ্কারের সিদ্ধান্তই পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এভাবে চট্টগ্রামে ও বাংলার অন্যান্য জেলার মত দুইটি বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে। এই দুই দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও, অনেকটা চক্র বা গোষ্ঠিগত সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। বিপ্লবী দলের অন্যতম কার্যসূচী ছিল, দলের জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহ। বিশেষতঃ নৈতিক চরিত্রে উন্নত এবং সুস্থ ও সাহসী তরুণদেরই দলে নেওয়া হত। হয়ত একদল কোন স্কুল বা কলেজের তেমন একটি ছেলেকে দলে নেওয়ার পদ্ধতির প্রথম পর্যায় হিসাবে বে-আইনী

বই "কানাইলাল" (বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জীবনী—লেখক মতিলাল রায় "প্রবর্তক সংঘ", চন্দননগর এর প্রতিষ্ঠাতা) পড়তে দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় অন্যদল তার খবর পেয়ে ঐ ছেলেটির সঙ্গে তারাও সংযোগ করার চেষ্টা করল। ছেলেদের আকর্ষণ করার অন্যতম বস্তু ছিল সাইকেল চড়তে শেখা। তাই বিপ্লবী দল দু'টিই সাইকেল যোগাড় করত এবং তা সব সময় প্রচলিত সততার নিয়মে যে হত না তা বলাই বাহুল্য। যেমন জনৈক গ্রাম্য জোতদারের ছেলে মা-বাপের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে শহরে এসেছে। কিনেছে ভাল সাইকেল এবং সামনে পিছনে বাতি, কেরিয়ার, লাল লাল কাঁচের ফলক, দু'টো দু'রকম বেল, এসব লাগিয়ে নিয়েছে। তখন লালদীঘির চারপাড় ছিল নানা ঝোপে ভর্তি। ঐ নূতন সাইকেলের মালিক ঝোপের পাশে সাইকেল-খানা রেখে প্রাকৃতিক আহ্বানে রাস্তার দিকে পিঠ দিয়ে হয়ত বসেছে একটু দূরে। বিপ্লবীদলের এক ক্ষুদে ছাত্র নেতা আগে থেকে বসে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। এক পলকে সে ঐ নূতন সাইকেলখানা নিয়ে জোরে চালিয়ে চলে গেল জামালখাঁতে আসকার খাঁর দীঘির পাড়ে অন্য এক বিপ্লবীর বাসায়। সাইকেল দিনের বেলায় আশ্রয় নিল দোতালায়, পরে রাত্রে চামড়ার সিটখানা ও অন্যান্য অংশ-গুলি পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর থেকে সাইকেল বিপ্লবীদলের ব্যবহারে লেগে গেল।

সাইকেল শেখানো হ'ল নূতন সংগৃহীত সদস্যকে। তখন অন্যদল তাকে যেইসব গোপন বই পড়তে দিয়েছে তার সবগুলি এই দলকে এনে দিয়ে দিল। এইভাবে একদল অন্যদলের সদস্য ভাগাবার চেষ্টা করত এবং অনেক সময় সফলও হ'ত। তারপর এই নিয়ে মারামারি কত যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একদল মারল, অপর দল প্রতিশোধ নিল। এভাবে দিনের পর দিন বাংলায় 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দুইটি বিপ্লবীদল একে অপরের কাছ থেকে বহু দূরে সরে যায়। যদিও বাংলার অন্যান্য জেলায় এই দুই দলের সংঘর্ষে অনেক খুন জখম হয়েছে, চট্টগ্রামের সংঘর্ষে মাত্র একটি ছাত্রকে এই দলাদলির যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। তা ঘটেছে আরও অনেক পরে এবং সে বিষয় পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

দুই দলে বিভক্ত হওয়ার পর চট্টগ্রামে যে বিপ্লবীদলটি নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে, কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে কলিকাতার 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সহযোগিতা করত, সেই দলের একটি কমিটি গঠিত হয়। চট্টগ্রামে সেই বিপ্লবীদলের কর্মকর্তা ছিল নিম্নরূপ :--

সভাপতি--সূর্য সেন

সহ-সভাপতি--অম্বিকা চক্রবর্তী; তাঁর কাজ ছিল বাংলার ও ভারতের অন্যান্য বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।

শহর সংগঠনের দায়িত্বে--গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ

গ্রামের সংগঠনের দায়িত্বে--নির্মল সেন।

পরে লোকনাথ বলকেও ছাত্র আন্দোলন ও ব্যায়ামাগার গঠন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ঐ বিপ্লবী কমিটির পূর্ণ সদস্য প্রথমে ছিলেন না। কমিটির দায়িত্ব ছিল সমষ্টিগত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মতই সকলের বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণীয় ছিল।

এই কমিটি গঠনের পরে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদল থেকে ডাকাতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সময় একটি বিষয়ের প্রতি বিপ্লবীদের বিশেষ নজর ছিল। যদিও সব কাজ তাঁদের গোপনে করতে হত, তবু জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যে কোন আন্দোলনের দুর্বলতা তা তাঁরা উপলব্ধি করতেন। তাই ডাকাতি কোথায় করা হবে, এ সম্পর্কে আলোচনায় স্থির হয় যে, পোষ্ট অফিস, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি থেকে সরকারী অর্থ ডাকাতি করে সংগ্রহ করতে হবে। যদি দেশের কোন অর্থশালী ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করতে হয়, তা'হলে বেশী সুদখোর মহাজনের বাড়ীতেই করতে হবে। দরকার নগদ টাকা বা সোনার অলঙ্কার। তখনকার দিনে এত কণ্ট্রাক্টার, 'ডিলার' ও 'পারমিটের' ব্যবসায়ী ছিল না, এবং বর্তমানে যেমন 'চেক' বইয়ের ব্যবস্থা তাও খুব কম ছিল। বড় বড় মহাজনরা নিজ ঘরের লোহার সিন্দুকে অনেক টাকা জমিয়ে রাখত।

চট্টগ্রামের প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি হয়, আনোয়ারা থানায় পরৈকোড়া গ্রামের জনৈক হিন্দু বড় মহাজনের বাড়ীতে। তখনকার

দিনে বড় ডাকাতি সারা বছরেও দু'চারখানার বেশী চট্টগ্রাম জেলায় হয়নি। পরৈকোড়া ডাকাতিতে গুলী চলেছে, ডাকাতরা হিন্দুস্থানী বা উর্দু ভাষায় হাঁক ডাক দিয়েছে—এসব কথা শহরে, গ্রামের হাটে বাজারে খুব আলোচিত হতে থাকে। আর ঘটনার কাহিনী শুনে, সবাই বলতে থাকে, পনর বিশ হাজার টাকা নগদ আর গহনায় এমন করে নেওয়া ও সাফল্যের সঙ্গে 'পলায়ন' করা—চট্টগ্রামের লোকের কর্ম নয়। নিশ্চয়ই কলিকাতা থেকে পাকা ডাকাত এসেছে। পুলিশও ঐ ডাকাতিকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলে কখনও সন্দেহ করেনি। ১৯২৩-এর আগষ্ট মাসে ঐ ডাকাতি হয়। ডাকাতির বেশ কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম শহরের হিন্দু মুসলিম কিছু যুবক, যাদের সাধারণভাবে লোকে "গুণ্ডা" বলত, তেমন ১৫/২০ জনকে পুলিশ ঐ ডাকাতিতে সংযুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল পরে প্রমাণাভাবে তাদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পরৈকোড়া রাজনৈতিক ডাকাতি এদিক থেকে সফল হয়। তাতে কাউকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়নি এবং বিপ্লবীদলের কোন সদস্য তার জন্য ধরাও পড়েনি। ঐ ডাকাতিতে চট্টগ্রাম জেলার বাইরের কোন লোক ছিল না। যাঁরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বীর শহীদ বিপ্লবীনেতা নির্মল সেন অন্যতম। কৈয়েপাড়ার জুলু সেন, উপেনদা* ও অন্য কয়েকজন বিপ্লবী তাঁর সঙ্গে ঐ ডাকাতিতে ছিলেন।

এরপরে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদল বেশ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রথম সাফল্যজনক অর্থসংগ্রহের ফলে, অস্ত্রশস্ত্রও কিছু গোপনে সংগৃহীত হয় এবং আরও চাঞ্চল্যকর বিপ্লবী কাজের আয়োজন চলে। ঠিক হয় শহরের বুকের উপর সোজা দিনের বেলায় এক ডাকাতি করতে হবে।

---

* উপেনদা'র মানে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—এর পূর্ণ পরিচয় কোন সময় চট্টগ্রামবাসী জানতে পারেনি। চিরকুমার, নির্বাক ও অপূর্ব দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই চট্টগ্রাম বিপ্লবীর অবদান চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব বিপ্লবীরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। ১৯৬৪ তে এই অখ্যাত দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হয়েছে। রাঙ্গুনীয়া থানার বেতাগী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা শাঁখারীটোলা পোষ্টাপিস ডাকাতি (১৯২৩), চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডাকাতি (১৯২৩) ও অস্ত্রাগার দখল (১৯৩০) ও জালালাবাদ যুদ্ধের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

তখনকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের অন্যতম বড় কারখানা পাহাড়তলীতে ছিল। চট্টগ্রাম কোর্টের ট্রেজারী থেকে কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন নিয়ে যাওয়া হত। রেলের খাজাঞ্চী ও কেরাণী ঘোড়ার গাড়ীতে করে যখন বেতনের টাকা নিয়ে আসত তখন দু'জন সশস্ত্র পুলিশ নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে দেওয়া হত। সেই সময় চট্টগ্রাম শহরে মোটর গাড়ীর বিশেষ প্রচলন হয় নি। কেবল বড় বড় ইংরেজ রাজকর্মচারী ও দু'একটি বড় ধনীর তখন মোটর গাড়ী ছিল। তাই ঘোড়ার গাড়ীতে করেই পাহাড়তলী কারখানার বেতন নিয়ে যাওয়া হত। যেহেতু, শ্রমিক ও কর্মচারীদের খুচরা দিতে হবে, তাই বেতনের টাকা বিভিন্ন মুদ্রায় বস্তা ভরতি করে নেওয়া হত। চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং থেকে গাড়ী জামালখাঁ দিয়ে পল্টনের পূর্বদিকের রাস্তা ধরে তখনকার ইউরোপীয়ান ক্লাব (বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্লাব) ফেলে নির্জন 'টাইগার পাস' অতিক্রম করে সুন্দর রেলওয়ের ছায়া ঢাকা পিচঢালা রাস্তা ধরে বেলা সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে পাহাড়তলী কারখানায় পৌঁছে যাবে। নির্জন 'টাইগার পাসের' মোড়ই এই রাজনৈতিক ডাকাতির উপযুক্ত স্থান বলে স্থির হয়।

তখন কলিকাতার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলীর দলের অন্যতম সদস্য দেবেন দে (আজাদীর পরে পশ্চিম বাংলায় মন্ত্রী ছিলেন) গোপনে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। সূর্য সেনকে এই বিপ্লবী নেতা (বিপিনদা) খুব স্নেহ করতেন এবং বিভিন্ন বিপ্লবী এবং প্রকাশ্য কাজে সূর্য সেনও এই বিপিনদার মতামতকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতেন। তাই চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাঁরাও চেষ্টা করতেন। স্থির হয় চট্টগ্রামের তিনজন বিপ্লবী উপেন ভট্টাচার্য, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস ও কলিকাতার বন্ধুস্থানীয় ও অভিজ্ঞতর বিপ্লবী নেতা দেবেন দে ঐ রেলওয়ে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করবেন। দেবেন দে অবশ্য কলিকাতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ডাকাতি ও অন্যান্য মামলার ফেরারী আসামী হিসাবেই তখন চট্টগ্রাম ছিলেন।

স্থির হয়েছিল, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ ইংরেজী সকাল দশটায় আঘাত করা হবে। 'টাইগার পাস'* এর নিকটে রাস্তা বেশ সঙ্কীর্ণ। উঁচু পাহাড়ের মাথায় মলয় হিল্লোলিত চমৎকার বাংলো গুলিতে সে সময় থাকতো ইংরেজ কর্মচারী বা তাদের পরিবার। বিপ্লবী নেতা দু'জন অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে গিয়ে 'টাইগার পাস'এর মোড়ে পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবেন। উপেনদাও কাছে নির্বিরোধী ভাল মানুষটির মত রাস্তায় পথিকের অভিনয় করবেন। আর ঠিক সময়ে রাজেন দাস আসবেন সাইকেলে ক'রে। বলা বাহুল্য গুলী ভরা পিস্তল তাঁদের সকলের সঙ্গেই ছিল।

১৭,০০০৲ টাকার বস্তা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী এগিয়ে আসছে। বিপ্লবীদের সামনে আসতেই হাতে পিস্তল নিয়ে তারা গাড়ীর সামনে লাফ দিয়ে পড়ে চীৎকার করে বলে, "থাম"। ভীতসন্ত্রস্ত খাজাঞ্চী, কেরাণী, সশস্ত্র পুলিশ ও ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী থামায়। বিদ্যুতগতিতে অনন্ত সিংহ লাফ দিয়ে উঠে গাড়োয়ানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং ঘোড়ার রাশ ও চাবুক নিজে নিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে উপেনদা, দেবেন দে আর রাজেন দাস বুকের উপর পিস্তল ধরে' কেরাণী ও সশস্ত্র সিপাহী দু'টিকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেন। নতুন গাড়োয়ান ছেঁড়া লুঙ্গি আর টুপি আগেই যোগাড় করেছিল—নতুন পোষাকে অনন্ত সিংহ চাবুকের জোর ঘা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলেন। ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে গাড়ী আবার শহরের পথে ফিরল। মাত্র দু'তিন মিনিট সময়। বিভ্রান্ত সিপাহী তাদের গুলী ভরা বন্দুক নিয়ে শুধু খাজাঞ্চি আর কেরাণীকে সঙ্গে ক'রে 'টাইগার পাস' মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা এমন বিভ্রান্ত হল যে তাদের বন্দুকের গুলী চলল না। প্রবল

---

* পাহাড়ী শহর সুন্দর চট্টগ্রামের এই রাস্তার মোড়ের নাম 'টাইগার পাস' কেন হ'ল অনেকের জানবার কৌতূহল হবে। এইখানটায় রাস্তার দু'পাশে পাহাড় ও ঘন সবুজ ঝোপ জঙ্গল। এদিকে ছিল বিরল জনবসতি এবং ঐসব জঙ্গলে শীতের সময় বাঘ চলাফেরা করত। রাস্তার ঐ মোড়ে বাঘ অনেক গরু, ছাগল ও মানুষ মারত। তখন বাঘ মারার কল বসিয়ে ওখানে বাঘ ধরা হ'ত। পরে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং লোক চলাচল বেড়ে গেলে বাঘের আবির্ভাব কমে যায় এবং সম্পূর্ণ দূর হয়। এইজন্যে ইংরেজরা ঐ মোড়ের নাম 'টাইগার পাস' দিয়েছিল।

বেগে অল্পক্ষণের মধ্যে ১৭,০০০ টাকা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে বিপ্লবীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরে বিকাল সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় পুলিশ ও জনসাধারণ দেখল, চট্টগ্রাম ইস্‌লামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পাহাড়ে উঠবার যে রাস্তা পাহাড়ের গায়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেখানে একটি পরিত্যক্ত ঘোড়ার গাড়ী। ঐ গাড়োয়ান এসে তার গাড়ী সনাক্ত করল এবং তা নিয়ে যাওয়া হ'ল কোতোয়ালী থানায়।

এই ডাকাতির পর শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল, কারণ প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনা আর কোনদিন এই জেলায় ঘটেনি। সশস্ত্র সিপাহীদের হাত থেকে এতগুলি টাকা যারা ছিনিয়ে নিতে পারে ঐভাবে, তারা নিশ্চয়ই অসাধারণ মানুষ—এ সব কথা আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, চায়ের দোকানে উত্তেজনার সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ডাকাতির দু'একদিন পরই শহরে বড় বড় প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, এই ডাকাতির সংবাদ পাওয়ার জন্য টাকা ১০০০ পুরস্কার ঘোষণা করল। বিপ্লবী দলের কঠোর গোপনীয়তার জন্য বিপ্লবী দলের অনেক কম বয়সী সদস্যরা পর্যন্ত এই ডাকাতির বিষয় কিছু জানত না। তবু দলের নির্দেশে তাদের অনেককে রেলওয়ের ঐ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি গোপনে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। চট্টগ্রাম পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ এই ডাকাতির কোন হদিস পায় না। তাই অভিজ্ঞ কলিকাতার গোয়েন্দা এই ডাকাতির ব্যাপারে বিশেষ তদন্তের জন্য নিযুক্ত হয়। কোন মতেই তারা এর কোন কূল কিনারা না পেয়ে খুবই মনেকষ্ট পায়। দেশের মানুষ অনেকে নিজেদের ঘরোয়া আলাপের সময় ইংরেজের এত টাকা লুণ্ঠিত হওয়ায় উল্লাস জানায় এবং বিশেষভাবে কামনা করে যেন ঐ সব বীর লোকগুলি ধরা না পড়ে।

ডাকাতির পরে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য ডাকাতির সতর হাজার টাকার মধ্যে বেশীর ভাগ কলিকাতায় বিপ্লবী সহযোগিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও গোয়েন্দার তল্লাসী ও জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বোঝা যায়, এই ডাকাতিকে তারা অরাজনৈতিক, সাধারণ অপরাধ-মূলক ডাকাতি বলে মনে করে নাই। তাই বাকী অর্ধ নিয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য ফেরারী দেবেন দে এবং এই ডাকাতিতে অংশ

গ্রহণকারী রাজেন দাস, উপেন দা, অনন্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারাও শহরের উপকণ্ঠে সুলকবহরে এক পরিত্যক্ত ও পুরাতন বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সূর্য সেন তখন চট্টগ্রামের অধুনালুপ্ত দেওয়ান বাজার এলাকায় তৎকালীন বিশিষ্ট উকীল পরৈকোড়ার অন্নদা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'উমাতারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের' শিক্ষক। আর অম্বিকা চক্রবর্তী সম্ভবতঃ তখনও চট্টগ্রাম কাষ্টম অফিসে চাকুরী করতেন। ডাকাতির প্রায় দুই সপ্তাহ পরে পূর্বোক্ত সুলকবহরের গোপন আস্তানায় এই জেলার বিপ্লবীদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা আলোচনার জন্য এক বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী সেই বৈঠকে যোগ দেবার জন্য গোপনে শহর থেকে গেছেন। আগে থেকে রেলওয়ের ডাকাতির ব্যাপারে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা এবং অন্য কয়েকজন বিপ্লবী ওখানে ছিলেন।

এই সময় পুলিশ কোন সূত্রে ঐ আস্তানার সন্ধান পেয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরে বিকাল প্রায় ৩টায় ঐ যায়গা থেকে কিছুদূরে সুলতান বায়েজিদ বোস্তামির মাজার—এর কাছে নাগরখানা পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়—এই সংঘর্ষকে তার সাত বছর পরে নিকটবর্তী জালালাবাদ পাহাড়ের গৌরবময় যুদ্ধের পূর্বাভাস বা মহড়া বলা যেতে পারে। একে আমরা বলব 'নাগরখানা পাহাড় খণ্ডযুদ্ধ'। নীচে এই খণ্ডযুদ্ধের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ নিজে লেখককে যেভাবে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তা উধৃত করা হল:

"আমাদের হেড-কোয়ার্টার ছিল সুলকবহর হাউসে (পুরানো খালি পাকা বাড়ী)। এ বাড়ীর চার পাশে ছিল মুসলিম বসতি। আমরা সাতজন যুবক যখন ঐ বাড়ীতে বাস করছি তখন বিভিন্ন প্রতিবেশীর মনে সন্দেহজাগা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে চাঞ্চল্যকর ঐ ডাকাতির পরে আমরা তখনও ঐ বাড়ী ছাড়বার ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না। মাষ্টারদা, অম্বিকাদা আমাদের আরও নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য অনেকবার বলেছিলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ

চট্টগ্রাম শহরের অনেক বাড়ীতে হানা দেয় এবং আমাদের নন্দনকানন তামাকুমণ্ডীর বাড়ীতেও কয়েকবার তল্লাশী হয়। তবু আমি জোর করি যে এই হেড কোয়ার্টার আমি কোন মতেই ছাড়ব না। যতীন মুখার্জির "বালেশ্বর যুদ্ধের" মত এক খণ্ডযুদ্ধ আমি চাই। কোন মতে এই স্থান ত্যাগ করতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

দিন কেটে যায়, কোন ঘটনাই ঘটছে না। সংগ্রামের জন্য আমার আশা বাস্তব রূপ গ্রহণ করছে না। সে সময় চলছিল বড় দিনের ছুটি। রেলওয়ে ডাকাতির দশদিন পরে অম্বিকাদা ভোরের মেলে কলিকাতা থেকে ফিরেই হেড-কোয়ার্টারে এলেন। তিনি কলিকাতায় আমাদের প্রধান সদর দফতরে টাকাগুলি দিয়ে এসেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে অসময়ে পূর্ব-নির্ধারিত বৈঠকের জন্য মাষ্টারদা ও অম্বিকাদা আমাদের ঘাঁটিতে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈঠক বসল। অম্বিকাদা কলিকাতা থেকে যে রিপোর্ট এনেছিলেন তা আমাদের বললেন। তিনি বললেন, কলিকাতার দাদারা (বিপ্লবী নেতারা) এবং খোকাদাও আমাকে ওখানে যাবার জন্য বলেছেন।....... আমিও এতবড় সফল একটি কাজের পর কলিকাতার দাদাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কিছুটা উৎসুক হ'লাম।

এই বৈঠকে স্থির হল খোকাদা ও আমাকে কলিকাতা চলে যেতে হবে। তখন আমরা আমাদের রিভলভার ও পিস্তল ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পাঠাবার আয়োজন করতে আরম্ভ করলাম। মাষ্টারদা, অম্বিকাদাও তখন ঘর থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করবেন। এমন সময় বাড়ীর সামনে ঘোড়ার গাড়ীর ঘণ্টা ডিং ডিং করে বেজে উঠল। আগে ওপাশ দিয়ে এ রকম ঘোড়ার গাড়ী চলার কত শব্দ আমরা শুনেছি। তাই একে কোন গুরুত্ব আমরা দিই নি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেই পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টারটি জনসাধারণের উপর জুলুম ও উৎপীড়ন করে কুখ্যাত হয়েছিল, তেমন এক পরিচিত দারোগা ঐ গাড়ী থেকে নেমেই আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়াল। তার সঙ্গে তার কয়েকজন সাথী অর্থাৎ সিপাহীও এসেছে। দারোগা আমাকে ঠিকমত চিনত না। আমাদের পাঁচজন সাথীও এসে সামনে দাঁড়ালেন। দারোগা কিছু

জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারল যে আমরা একেবারে সাধারণ যুবক মাত্র নই। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা তার ঐ অল্প কয়জন সাথীকে নিয়ে সম্ভব ছিল না। তাই সে এমন ভাব দেখাল যে সে যেন আমাদের কোন সন্দেহই করছে না। সে আমাদের ওখান থেকে চলে গেল কিন্তু তার চৌকিদার, দফাদার ও তার প্রভাবে যে সব গ্রামবাসী আছে, আমাদের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য তাদের নির্দেশ দিয়ে গেল।

আমরা তখন আমাদের অবস্থা যে কত সঙ্গীন হয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারলাম। কিন্তু দেরী করার কোন সময় নেই। তাহলে দারোগা তার সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে এসে পড়বে। তাই আমরা ছয়জন যুবক হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দারোগার নিযুক্ত লোকগুলোকে ঠেলেই আমরা তাদের ঘেরাও ভেঙ্গে ফেললাম। তখন তাদের চেঁচামেচিতে ওখানে অনেক গ্রামবাসী এসে হাজির হল। তারা আমাদের তাড়া করতে আরম্ভ করল, আর প্রবল ভাবে আমাদের ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আমরাও আমাদের দূরপাল্লার রিভলভার ও পিস্তল থেকে উপরের দিকে গুলী ছুঁড়ে তার জবাব দিতে আরম্ভ করলাম। আমরা ঐ সব লোককে এভাবে সব সময় আমাদের কাছে থেকে বেশ দূরে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের পিছন পিছন আসতেই থাকল, কোন মতে আমরা ঠেকাতে পারলাম না। যেহেতু, তারা লক্ষ্য করল যে আমরা তাদের লক্ষ্য করে কোন গুলী ছুঁড়ছি না, তখন আমাদের পিছন পিছন ধাওয়া করার উৎসাহ যেন তাদের আরও বেড়ে গেল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের হত্যা করার কোন উদ্দেশ্যই আমাদের নেই। তবু তারা প্রায় দেড় মাইল পর্যন্ত আমাদের পিছন পিছন বহদ্দার হাটে এসে পোঁছল। সেদিন ছিল হাটবার, তাই হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম ঐ বিখ্যাত হাটে এসেছে। ঠিক হাটের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা আমাদের পার হতে হোল। হাটে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গুলী চালানো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করলাম, কারণ আমাদের ঐ অনির্দিষ্ট গুলী গিয়ে হাটের কত নিরপরাধ নিরীহ মানুষের গায়ে লাগতে পারে। রিভলভারটি খাড়া রেখে আমরা ঐ প্রকাশ্য হাটের মধ্য দিয়েই এগিয়ে গেলাম। জনসাধারণের সহানুভূতি পাওয়ার আশায় আমি বেশ বড় করেই বললাম, এখন আমাদের গুলী চালানো বন্ধ করা দরকার,

নিরপরাধ মানুষ আহত হতে পারে। সেরকম কেউ যেন আহত না হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

তার ফলে আমরা ঈপ্সিত ফল পেলাম। আমাদের জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। কেউ আমাদের কোন বাধা দিল না। হাটের লোকজন কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে রইল। হাট পার হতেই দারোগার লোকজন হাটে এসে উপস্থিত হল। সেখানে নানা উত্তেজনা-মূলক প্রচার করে তারা আরও কিছু সমর্থক যোগাড় করল। তারপর নূতন উৎসাহে তারা সকলে আবার আমাদের পিছনে পিছনে আসতে আরম্ভ করল ও তাদের গাদা বন্দুক থেকে গুলী আর পাথর আমাদের দিকে ছুঁড়তে থাকল। একটু পরে আমরা খোলা ধানক্ষেতে এসে পৌঁছলাম। সেখানে উৎসাহী পশ্চাদ্ধাবনকারীদের ভয় দেখানোর জন্য আমরা একটি বোমা ফাটাবার ব্যবস্থা করলাম। তাদের দেখিয়েই আমরা বোমার 'ফিউজ' ফোটাবার জন্য সলিতা তৈরী করে নিলাম এবং চীৎকার করে তাদের আমরা বললাম, যদি তারা আর একটুও অগ্রসর হয় তাহলে বোমার আঘাতে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। সাময়িকভাবে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হল। প্রায় দুই তিন মিনিট পরে প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটল এবং ভারী ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে গেল।

যদিও ঐ বোমা ফাটার ফলে পিছনে পিছনে যারা ধাওয়া করছিল তাদের ও আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব কিছুটা সাময়িকভাবে বেড়ে যায়, তবু কোনমতে আমাদের পিছনে তাদের ধাওয়া করা আমরা বন্ধ করতে পারলাম না। তারা বিস্ফোরণের জায়গাটা ঘুরে আবার পশ্চাদ্ধাবন শুরু করল। তখন তাদের কাছে ঐ মাঠের মাঝখানে আমরা এক বক্তৃতা দেওয়া ঠিক করলাম। কংগ্রেস খিলাফতের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দেওয়া হল এবং আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আবেগময়ী ভাষায় আবেদন করা হল। আমরা তাদের বল্লাম আমরা "স্বদেশী" কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী দলের নেতা একজন আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কেই সন্দেহ করে বলল, 'তোমরা কেমন স্বদেশী, তোমাদের বোমার আঘাতে বৃদ্ধা বিধবার একটি মাত্র পুত্রের এইমাত্র মৃত্যু হল'। তখনও বোমাতে যে কারও মৃত্যু হয়েছে তা আমরা জানতাম না। ঐ খবর শুনে আমাদের মনও বেদনায় ভরে গেল। আমাদের কাছে প্রায় ষাট টাকার

খুচরা পয়সা ছিল। ঐ খুচরা পয়সা আমরা তাদের দিকে ছুড়ঁতে আরম্ভ করলাম আর বললাম, "আমরা ঐ মা ও আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের দেশবাসী কাউকে মারার কোন উদ্দেশ্যই আমাদের ছিল না। একটি যুবক যে ঐভাবে নিহত হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, ঐ টাকাগুলি তার বৃদ্ধা মাকে দেবেন।"

তখন ঐ সব লোক আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা সবাই চেঁচাতে লাগল 'আরও দে, আরও দে'। টাকা দিয়েই আমরা ভুল করেছিলাম। এর ফলে তাদের মনে আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণাই হ'ল। যাই হোক আমরা বোঝাতে চাইলাম যে, আমাদের কাছে আর টাকা পয়সা নেই, কিন্তু তারা শুনেছে যে, ঐ ডাকাতির আমরা ১৭,০০০ টাকা পেয়েছি। তাই তারা আমাদের পিঠের বোঝাগুলির দিকে দেখিয়ে আরও অর্থ দাবী করল। তাদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য আমরা বললাম যে আমাদের কাঁধের বোঝার মধ্যে কেবল গুলী ভর্তি আছে, তাতে আর কিছু নেই। তারা তখন তাতে না দমে গিয়ে আরও বেশী পরিমাণে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। এমন সময় কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের ব্রজবিহারী বর্মন জেলা আই-বি ইন্‌স্‌পেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী দলের সঙ্গে এসে মিলিত হল। ডি-আই-বি ইন্‌সপেক্টার শচীন ভৌমিক ও সার্জেন্ট বেচারাও অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছল।

সেই সময় আমরা তাদের দিকেই সোজা লক্ষ্য করে গুলী চালাতে আরম্ভ করলাম। ফলে তাদের ভিতরে অনেকে আহত হল। তখন ঐ গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্মচারীরা উর্ধ্বশ্বাসে ওখান থেকে পলায়ন করে। পরে মামলায় ঐ দু'টি গোয়েন্দা কর্মচারী তাদের সাক্ষ্যে বলেছিল যেহেতু তাদের সাইকেল বিকল হয়ে গিয়েছিল তারা আমাদের পিছন পিছন আর না গিয়ে গুলীবিদ্ধ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিল। আমাদের মামলার সওয়াল জবাবের সময় তাই দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'এক বিশেষ মনস্তাত্বিক মুহূর্তে দু'জন গোয়েন্দা বিভাগীয় কর্মচারীর দু'খানা সাইকেলই এক সঙ্গে বিকল হয়ে গেল'।

এইভাবে আমরা এগিয়ে যেতে যেতে বেলা যখন প্রায় ১টা তখন আমরা ছোট ছোট পাহাড়গুলির কাছে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা

নিকটবর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। ঐ সময় প্রথমবারের মত ঐ পশ্চাদ্ধাবনকারী দল থামল। এতক্ষণ ঐভাবে আসার ফলে আমরা সবাই তখন নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে গেছি, কারও কারও আর চলবার কোন ক্ষমতা নেই। কেউ কেউ বললেন আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই আমরা যেন ওখানে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। আমরা ক'জন দাবী করলাম মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমরা চলতে থাকব।

আমাদের মনে হল ঐ ঝোপজঙ্গল পুলিশ নিশ্চয়ই তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করবে। তাই এগিয়ে যাওয়াই সকলের মত হল। কয়েকশত গজ এগিয়ে যাবার পর আমরা আর একটি ছোট পাহাড় পেলাম। আমাদের ইচ্ছা, ঐ দূরে পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে গিয়ে পোঁছান। কিছুটা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে আবার আমাদের চলতে হল। আমরা এগিয়ে চলেছি এমন সময় একটি চৌকিদার ওখানে লুকানো অবস্থায় ছিল, তার হাতে এক বন্দুক ছিল। সে আমাদের থামতে বলায় আমরা থামলাম। ওদিকে সামান্য দূরে আগেকার পশ্চাদ্ধাবনকারীরা আছে। সে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করল, আমরা কে কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি। একবার মনে হ'ল তার কাছ থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিই, কিন্তু এত কাছে যাবার আগেই সে যদি আমার দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে সেই আশঙ্কাও ছিল। তাই আমি কথাবার্তায় তাকে ব্যস্ত রাখার মধ্যে আমাদের অন্যান্য সাথীরা এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে।

আমার কাছাকাছি ছিল খোকা (দেবেন দে, ইনি পশ্চিমবঙ্গে বিধান রায় মন্ত্রী সভার অন্যতম উপমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং বছর কয়েক পূর্বে মারা গেছেন)। যদিও আমাদের রিভলভার আমরা তখন পোষাকের তলায় নিয়েছিলাম তবু আমাদের বিশৃস্ত পোষাক পরিচ্ছদে যে কোন লোকেরই সন্দেহ উদ্রেক করত। আমাদের দেখে ঐ চৌকিদারটির বেশ সন্দেহ হয়। চৌকিদারের বন্দুকটি তখনও তার কাঁধে, আর আমার আঙ্গুল রিভলভারের 'ট্রিগারে'। আমি যখন চৌকিদারের বেশী কাছে এগিয়ে গেছি, তখন তার সন্দেহ আরও বেশী হল। আমি যেই বন্দুকটি ধরতে যাব, তখনই সে এত মরীয়া হয়ে উঠল যে সে চোখের পলকে তার বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল। আমি চট্ করে

পাশে সরে গিয়ে হঠাৎ তার বন্দুকটিতে হাত দিয়ে ধরে ফেললাম। গুলী আমার গায়ে লাগল না, কিন্তু অদূরে খোকার উরুতে গিয়ে একটি ছর্‌রা আঘাত করল। তা আমি তখন টের পাইনি। আমি আমার রিভলভার থেকে দুই রাউণ্ড গুলী ছুড়লাম এবং ঐ বন্দুকটি ভেঙ্গে ফেললাম। যে দু'টি গুলী আমি করলাম তা কারও গায়ে লাগল না কারণ চৌকিদারের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। চৌকিদার তখন ঐ খান থেকে পালিয়ে যায়।

আমি যখন চৌকিদারের সঙ্গে ঐ ভাবে ব্যস্ত তখন আমাদের অন্য চারজন সাথী পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে। আমিও তারপর পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। কিন্তু পা আর চলে না, শরীর ভয়ানক ক্লান্ত। তবু উপায় নেই, কর্তব্যে অবহেলা চলবে না—আমি বহু কষ্টে উঠতে লাগলাম। বাঘা যতীন আর নেপোলিয়নের কথা আমার তখন মনে পড়তে লাগল।

এমন সময় পিছন থেকে খোকা 'অনন্ত অনন্ত' বলে ডাক দিল। তখন আমি প্রায় উঠে গেছি পাহাড়ে, খোকা তখন প্রায় আধাআধি মাত্র উঠেছে। তার দিকে ফিরে দেখলাম, খোকা ভয়ানক কষ্টে উঠবার চেষ্টা করছে। একবার চেষ্টা করছে, আবার সে পড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রনায় তার মুখ বিকৃত—সে আমায় বলল, 'দেখ, আমি একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছি। আমার গায়ে একটি ছর্‌রা লেগেছে। আর আমি চলতে পারছি না।'

কিন্তু কি করব তাঁকে নিয়ে? কি সাহায্য তাঁকে আমি করতে পারি—আমারও ত কোন শক্তি নেই। আবার কোনমতে শক্তি সঞ্চয় করে আমি তাঁকে আমার ঘাড়ে উঠিয়ে আনবার জন্যে নীচে নেমে গেলাম। খোকা আমার পিঠে ঝুলে রইল। আমি বহু কষ্টে তাঁকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম এবং শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের উপর উঠলাম। মাষ্টারদা বললেন, 'আর এগিয়ে যাওয়া চলবে না—এখন চল আমরা ঘাঁটি বসাই।' আমাদের সাথীদের অনেকের স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল, তাই ঐ পাহাড়ের উপরই ঝোপের আড়ালে আমরা বসলাম। অবশ্য এই আড়াল কেবল চোখেরই, এর দ্বারা গুলী ঠেকানো

সম্ভব ছিলো না। যেই পাহাড়ের পাদদেশে চৌকিদারের সঙ্গে আমার কিছুক্ষণ পূর্বে সংঘর্ষ হয়ে গেল, আমরা ঠিক সেই পাহাড়ের উপরই তখন বসে বিশ্রাম করছি।

তাই আধঘণ্টার মধ্যেই ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে সশস্ত্র পুলিশরা উঠতে আরম্ভ করবে তাতে আর বিচিত্র কি? আমরা ঝোপের আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। তারা প্রায় পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি এসে গেছে, আর কয়েকগজ মাত্র, তারপর তারা একেবারে এসে পড়বে আমাদের পাশে। দু'টি রাইফেল ধারী কনষ্টেবল আগে আগে অন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল। তারা শেষ পর্যন্ত উপরে এসে পড়ল এবং ঝোপের ভিতর স্বভাবতই উঁকি দিল ও আমাদের দেখতে পেল।

এ সময় আমরা সশস্ত্র দাঁড়িয়েছি মৃত্যুর মুখোমুখি, হয় মারব নয় মরব। সিপাহীরা তাদের সামরিক শিক্ষা অনুসারে আস্তে আস্তে রাইফেলগুলি নিয়ে ঠিকমত গুলী ছোঁড়ার স্থান নিচ্ছে। আমাদের দলের মধ্যে আমি পড়ে গেলাম ওদের প্রায় সামনে। আমি আমার রিভলভার ওদের দিকে তাক করে বসে আছি। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করা যায় না। পরপর দু'টি গুলী আমার রিভলভার থেকে ছুঁড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরাও তাদের মাস্‌কেট বন্দুক থেকে গুলী করল। সৌভাগ্যবশতঃ তা আমাদের কারও গায়ে লাগল না। আন্দাজে মারলেও আমার রিভলভারের গুলীতে সিপাহীরা আহত হয়ে পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

এ সময় মাষ্টারদা আর অম্বিকাদা 'পটাসিয়াম সায়েনাইড' হিসাবে সংগৃহীত সাংঘাতিক বিষের গুড়া খেয়ে ফেলেন।* তা খেয়ে দাদারা ওখানে পড়ে রইলেন। আমরা কিন্তু ওখান থেকে যেমন করে হোক

---

* পরে বোঝা গেছে যে, ঐ গুড়া প্রকৃতপক্ষে 'পটাসিয়াম সায়েনাইড' বিষ নয়। কারণ ঐ মিষ্টিস্বাদযুক্ত বিষ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে কোন জীবের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য। হয়ত যে ডাক্তারী দোকান থেকে তাঁরা ঐ বিষ সংগ্রহ করেন, তারা ইচ্ছা করেই বিষ না দিয়ে অন্য কোন ঔষধের গুড়া দিয়েছিল যাতে বিপ্লবী নেতাদের অমূল্য প্রাণ রক্ষা হয়। —লেখক

বেরিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের প্রিয় নেতাদের দিকে শেষ-বারের মত একটিবার দেখে নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। আমাদের এক আহত সাথীও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু সামান্য কিছুদূর আসবার পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে সশস্ত্র পুলিশ ঐ বিচ্ছিন্ন টিলাটিকে ঘিরে ফেলেছে। তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। এই ছোট পাহাড়টিই হল "নাগরখানার পাহাড়।" আগে আমরা বুঝতেই পারিনি যে, এই পাহাড়টি এমন বিচ্ছিন্ন। আমাদের এগিয়ে যাবার সময় চারিদিক থেকে সিপাহীদের গুলী আমাদের দিকে আসছে। শুরু হল আমাদের সংগ্রাম। পুলিশের মাস্কেট বন্দুকের বিরুদ্ধে আমরা দূর পাল্লার "মসার" পিস্তল ও রিভলভার ব্যবহার করিতে লাগলাম। এভাবে আধঘণ্টার মত আমরা যুদ্ধ করি।

বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় আমরা হঠাৎ গুলী চালনা বন্ধ করি। আমরা যেন সব মরে গেছি, এই ধাপ্পাটি আমরা পুলিশকে দিতে চাইলাম। গুলী বন্ধ করে আমরা অতি সাবধানে পাহাড়ের গা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নামতে লাগলাম, নেমে পাহাড়ের পাদদেশে আমরা তিনজন সাথী বড় একটি গাছের আড়ালে স্থান নিলাম। ঐখান থেকে লক্ষ্য করলাম, দূরে যে পুলিশের ঘাঁটি, তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। যারা সেই দিকটায় পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত ছিল এবং ওদিকে কোন গোলমাল না দেখে বসে বসে নিশ্চিন্তে বিড়ি টানছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে চলে যেতে পেরেছিলাম।"

এইভাবে অস্ত্রসজ্জিত অনন্ত লাল সিংহ, দেবেন দে ও উপেনদা নাগরখানা পাহাড় থেকে আত্মরক্ষা করে চলে গেলেন। পড়ে রইলেন সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী এক যায়গায়। আর জঙ্গলের মধ্যে রইলেন রাজেন দাস। সশস্ত্র পুলিশ যখন এলোপাথারী গুলী চালায় তখন তারা ছররা গুলীও ব্যবহার করেছিল এবং তাতে বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর শরীরের দুই যায়গায় আহত হয়েছিলেন। তাঁর পায়ের মাংসপেশীর মধ্যে ছোট একটি ছররাগুলী তারপরে বহু বৎসর পর্যন্ত ছিল।

খণ্ডযুদ্ধ শেষে পুলিশ ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে যখন তল্লাসী আরম্ভ করে, তখন তারা আহত ও অবসন্ন অম্বিকা চক্রবর্তী ও সূর্য সেনকে পায় কিন্তু রাজেন দাসকে তারা খুঁজে পায় না।

এদিকে শহরে খবর রটে গেছে যে, রেলওয়ে ডাকাতি যারা করেছিল তাদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই চলছে ষোলশহরের দিকে পাহাড়ে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ী করে আহত সিপাহীকে শহরের উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে আনা হচ্ছে এবং লোক উৎসুক হয়ে দেখছে। তারা যে সাধারণ ডাকাত নয়, তারা স্বদেশী ডাকাত—একথাও শহরের সব যায়গায় আলোচিত হচ্ছে। চাপা গলায় সংগোপনে অনেকের এই কামনাও প্রকাশ হচ্ছে, স্বদেশী ডাকাতরা ধরা না পড়ুক।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চট্টগ্রাম শহরের কাতালগঞ্জের দিক থেকে বহু সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত একটি গরুর গাড়ী আসছে সন্ধ্যার কিছু আগে। শহরের ভিতরে এসে ঢুকতে ঢুকতে পুলিশের ধমক সত্বেও অনেক ছোট ছোট ছেলে ও ছাত্র ঐ গাড়ীতে উপবিষ্ট মানুষ দু'টিকে দেখছে ও তাদের পিছন পিছন আসছে। তার মধ্যে একজন খুব রোগামত, একখানা এণ্ডি চাদরে গা ঢেকে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। অন্যজন একটু পাশ ফিরে হেলান দিয়ে রয়েছে। লোকে শুনেছিল পুলিশ বহুকষ্ট করে গুলী চালিয়ে রেলওয়ে ডাকাতির লোকদের ধরে আনছে। কাছে আসতেই কিছু ছাত্র প্রথমে তাদের প্রিয় শিক্ষক সূর্য সেনকে চিনতে পারল। শান্ত সৌম্য এই শিক্ষকটির সব সময়ের সাথী এণ্ডি চাদরখানা। তিনি তা নিয়ে ক্লাশে আসতেন, রাস্তায়ও ওখানা তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখে লোকে বলাবলি করতে শুরু করল, 'এই বুঝি ডাকাত'?

ধরে নিয়ে এসেছে শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ মাষ্টার মশায়কে আর তাঁর এক বন্ধুকে, কোথাকার ডাকাত কোথায় পালিয়েছে। হয়ত ছুটির দিনে এঁরা ওখানকার বায়েজিদ বোস্তামীর আস্তানা দেখতে গিয়েছিলেন আর পুলিশ এই ভাল মানুষ দু'টিকে ধরে নিয়ে এসে তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছে। জঙ্গলে পরিত্যক্ত রাজেন দাস পরে কিছুটা সুস্থ হ'য়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

রেলওয়ে ডাকাতি মামলা শুরু হয় সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীকে নিয়ে। আর অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেওয়া হয় এই মামলার জন্য। এই মামলায় আসামী পক্ষে তখনকার কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আসেন। এই মামলা চলার সময় চট্টগ্রাম কোর্ট এজলাস ছাত্রও জনসাধারণে ভরা থাকত। যতীন্দ্রমোহনের সূক্ষ্ম আইনজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ মামলা পরিচালনার ফলে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী উক্ত মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস পান।

এর কিছুদিন পর চট্টগ্রামের প্রফুল্ল দারোগা কলিকাতার হাওড়া থেকে আত্মগোপন অবস্থায় বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহকে গ্রেপ্তার করে আনে। গৌহাটি থেকে গণেশ ঘোষও ধরা পড়েন। রেলওয়ে ডাকাতি সম্পর্কে বহু তথ্য উক্ত প্রফুল্ল দারোগা উদঘাটিত করে ফেলেছে বলে বিপ্লবীরা খবর পায়। তাই তাকে ধরাধাম থেকে অবলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম নন্দনকাননের তৎকালীন ন্যাশন্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী হরিশ দত্তের ছেলে প্রেমানন্দ দত্তের সঙ্গে ঐ প্রফুল্ল দারোগার কিছুটা সম্প্রীতি ছিল। তাই তাকে হত্যা করার জন্য প্রেমানন্দ দত্তকেই দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রেমানন্দ দত্ত তখন চট্টগ্রাম কাষ্টমস্ অপিসে কেরাণীর চাকুরী করতেন। বিশিষ্ট শিক্ষিত ও দেশভক্ত ব্রাহ্ম পরিবার হিসাবে এই পরিবারের শহরে তখন খুবই মর্যাদা ছিল।

প্রফুল্ল দারোগাকে যে দিন হত্যা করা হয়, সেদিন প্রেমানন্দ দত্ত বিকালে আপিস থেকে এসে নন্দনকাননে তাঁদের বাসায় ইজিচেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। তাঁর হাতে একখানা ইংরেজী উপন্যাস। প্রফুল্ল দারোগার সঙ্গে আগে থেকে তাঁর কথা আছে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় এসে প্রেমানন্দ দত্তকে বাসা থেকে সে ডাক দেবে এবং তারপর দু'জনে কোন নির্জন যায়গায় বসে আলাপ হবে। কিছুদিন আগে দারোগা তার নিজ বুদ্ধিমত প্রেমানন্দ দত্তকে একেবারে নিজেদের গোপন সহকারী বা চর হিসাবে কাজ করার প্রস্তাবও করে ফেলেছে এবং সম্মতির

আভাসও অন্যপক্ষ থেকে সে পেয়েছে। তাই সে পূর্বনির্ধারিত সময়ে একা এসে প্রেমানন্দ দত্তকে তাঁর বাসা থেকে ডাক দিলে তিনি গেঞ্জী গায়ে ধুতির খুট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা দু'জনে চলে আসেন পল্টনের মাঠে। বর্তমানে যেখানে চট্টগ্রাম "ষ্টেডিয়াম," সেখানটায় আগে ছিল ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের টেনিস খেলার মাঠ। তার দক্ষিণ পশ্চিমে পল্টনের মাঠের প্রায় মাঝখানে ছিল ছোট একটি পুকুর। তা এখন নেই, ভরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঠের মাঝখানে ঐ পুকুরের পাড়ে অনেক গাছ ছিল, যার তলায় বসে অনেকে বিকালে ও সন্ধ্যায় গল্প করত। বেড়াবার বেশ সুন্দর যায়গা ছিল ঐ পুকুরের নির্জন চার পাড়।

দারোগাকে নিয়ে প্রেমানন্দ দত্ত ঐ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বসলেন। দু'এক কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে লুকানো রিভলভার দিয়ে প্রেমানন্দ দত্ত প্রফুল্ল দারোগাকে গুলী করেই দৌড়ে পল্টনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় চলে আসেন। মিউনিসিপ্যালিটির এক বড় নালা বড় রাস্তার দক্ষিণ পাশ থেকে ঘুরে নন্দনকাননের কাছাকাছি চলে এসেছে। তিনি ঐ নালা দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজ বাসায় ফিরে গিয়ে আগের পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারে বসে ইংরেজী বইটিতে মন দিলেন। ভাব দেখে মনে হবে কোন কিছুই ঘটেনি, মুগ্ধ পাঠক যেন মন দিয়ে বহুক্ষণ ধরে সাহিত্যরস উপভোগ করছেন।

ওদিকে প্রফুল্ল দারোগা গুলী খাওয়ার পর কয়েক মিনিট বেঁচে ছিল। গুলীর শব্দে দূরে ভ্রমণরত কিছু লোক সেখানে ছুটে গিয়ে রক্তাপ্লুত দারোগাকে দেখতে পায়। সে মৃত্যুর পূর্বে এক জবানবন্দী দিতে পারে এবং তা'তে সে বলে যায় যে, তাকে প্রেমানন্দ দত্ত গুলী করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশ যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে যায়, তখনও তিনি ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন।

প্রফুল্ল দারোগা হত্যা মামলা চট্টগ্রামে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই মামলা পরিচালনার জন্যও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কলিকাতা থেকে আসেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় এবং বিপ্লবীদের গোপন প্রচেষ্টায় প্রেমানন্দ দত্ত বেকসুর খালাস পান। তৎকালীন সরকারী

উকীল সতীশ চন্দ্র সেনের বাসা ছিল পল্টনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায়। তাঁর বাড়ীখানা এখনও সেখানে (হস্তান্তরিত) আছে। নিম্ন আদালতে তিনি প্রধান সাক্ষী হিসাবে বলেছিলেন, তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে মিউনিসি-প্যাল নালা দিয়ে সাদা ধুতি পরা একটি লোক গুলীর অব্যবহিত পরেই ছুটে যেতে তিনি দেখেছেন। সেসন মামলায় সাক্ষ্য দেবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা দু'জন বিপ্লবী যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করে যে, তাঁর সাক্ষ্য সামান্য রদবদল না করলে প্রেমানন্দ দত্তকে বাঁচানো যাবে না বলে ব্যারিষ্টার সাহেব (দেশপ্রিয়) বলেছেন। তাই তাঁকে বলতে হবে, তিনি বৃদ্ধ, চোখে কম দেখেন, তাই দৌড়ে যেতে যা দেখেছেন তা কোন মানুষও হতে পারে, গরুও হতে পারে। সৎ, বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, নিম্ন আদালতে তাঁর মত লোক এক রকম বলে এসেছে, এখানে ঐরকম বলতে তিনি পারবেন না। তখন বিপ্লবী যুবকেরা একটি রিভলভার একটু শব্দ করে তাঁর টেবিলে রাখতেই, তিনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেন--"ওটা কি?"

বিপ্লবী যুবকের মধ্যে যিনি বড়, তিনি বিনীতভাবে বলেন, সামান্য একটা রিভলভার মাত্র বিশেষ কিছু নয়। প্রেমানন্দদাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হয় এটা আবার আমাদের ব্যবহার করতে হবে। তবে আপনি বৃদ্ধ, আপনার উপর এটা আমরা প্রয়োগ করব না--আপনার একমাত্র পুত্র চন্দ্রশেখর সেন কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট....

এইটুকু মাত্র বলাতেই পিতৃবৎসল বৃদ্ধ বিপ্লবী যুবকটির হাত ধরে বলেন "না, না, ও আমার একমাত্র পুত্র--তাকে তোমরা কিছু করো না, তোমরা যা বলছ তাই আমি কাল আমার সাক্ষ্যে বলব।" বৃদ্ধের চোখে তখন জল চক্‌চক্‌ করছে। বিপ্লবী যুবক দু'জনই তাঁর পদধূলি নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

পরে এই প্রক্রিয়া জুরীদের কয়েকজনের উপরও প্রয়োগ করতে হয়। নয়জন জুরীর মধ্যে সাতজনই প্রেমানন্দ দত্তকে নির্দোষ বলবেন বলে স্থির করেছিলেন, বাকী দু'জনের ধারণা যে তিনিই হত্যাকারী। জুরীদের সর্ববাদীসম্মত রায় প্রেমানন্দ দত্তকে রক্ষা করবে, এজন্য ঐ

দু'জন জুরীর বাসায় বিপ্লবীদের সম্পর্কে রায়দানের পূর্বরাত্রে গিয়ে ঐ রিভলভার নিয়ে প্রথমে বিনীত নিবেদন পরে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়। ফলে সব জুরী একবাক্যে তাঁকে নির্দোষ বলেন এবং প্রেমানন্দ দত্ত মুক্তিলাভ করেন।

তাঁকে চট্টগ্রাম জেলগেট থেকে আনবার জন্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব অনেকেই গেছেন। কয়েকটি ফুলের মালাও তাঁকে দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছেন প্রেমানন্দ দত্ত জেলখানার সদর রাস্তার সামনের গেটের দিকে। গেটের কাছে আসতেই তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার জেলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে আটক করা হল। প্রকাশ্য আদালতের বিচারে মুক্তি পেয়েও তিনি মুক্তজীবনে ফিরে আসতে পারলেন না। (ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত এই অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক কৌশল স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তান ও ভারত সরকার দেশপ্রেমিক বহুকর্মী সম্পর্কেই প্রয়োগ করেছে)। বিনা বিচারে আটক থাকা কালে প্রেমানন্দ দত্তের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এখনও তিনি ঐ অবস্থায় রাঁচী পাগলা গারদে আছেন বলে শোনা যায়।

এখানে বেঙ্গল অর্ডিনান্স সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে ১৯২২শে প্রত্যাহৃত হল, তারপর থেকে অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনে ডাকাতি এবং প্রফুল্ল দারোগার হত্যার মত আরও কিছু হত্যা অথবা তার প্রচেষ্টা, গোপন বিপ্লবী ইস্তাহার প্রচার ইত্যাদি করতে থাকে। অন্যদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু (জওহরলাল নেহেরুর পিতা) প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ অসহযোগিতার পথ ত্যাগ করে প্রতিবেদনশীল সহযোগিতার সর্তে "স্বরাজ্য পার্টির" প্রতিষ্ঠা করেন। এই পার্টির নীতি ছিল ইংরেজরা যতটুকু সংস্কার শাসন ব্যবস্থায় দিতে রাজী হয়েছে, তার সুযোগ গ্রহণ করে পার্লিয়ামেণ্টারী পদ্ধতির মারফত তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ

হতাশ হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর বহু বিশিষ্ট সহকর্মীর সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টির নেতাদের মতভেদ হয়। তবু স্বরাজ্যপার্টি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলে ও ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস অনেকগুলি আসন দখল করে। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাজ্যপার্টির নেতা ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

এই সময় ইংরেজ সরকার লক্ষ্য করে যে "বিপ্লবী" "রাষ্ট্রদ্রোহী" ও "ধ্বংসমূলক কাজে লিপ্ত" আখ্যায় তারা যাদের অভিযুক্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে সহজে সাক্ষপ্রমাণ কেউ দিতে চায় না, অথচ রাষ্ট্রকে অর্থাৎ তাদের শাসনকে 'রক্ষা' করা সবিশেষ প্রয়োজন। তাই তাদের বিনা বিচারে আটক করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই যুক্তিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য এক আইন পাশ করাবার জন্য উত্থাপন করে। বিনাবিচারে আটক করার জন্য ইংরেজ সরকার এর পূর্বে দু'টি আইন করে—একটি ১৮১৮ সালে ৩নং বেঙ্গল রেগুলেশন, অন্যটি ১৯১৭ সালের ভারত রক্ষা আইন। এই দুই আইনে অবিভক্ত ভারতের বহু হিন্দু মুসলিম মুক্তিযোদ্ধাকে বছরের পর বছর বিনা বিচারে ইংরেজের কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে "বেঙ্গল অর্ডিনান্সের" বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যুগান্তকারী বক্তৃতা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ঐ বক্তৃতায় তিনি এই আইনকে "বে-আইনী আইন" (Lawless law) আখ্যা দেন। তাঁর নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতায় ঐ আইন প্রাদেশিক পরিষদে ইংরেজ সরকার পাশ করাতে পারে না—সরকার পক্ষ ভোটে হেরে যায়। তখনকার শাসনতন্ত্র অনুসারে ঐ আইন কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকার আবার উত্থাপন করে। সেখানেও স্বরাজ্যপার্টির নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রচেষ্টায় এই অগণতান্ত্রিক আইন পাশ করানো সম্ভব হয় না। তখন বৃটিশ শ্রমিক দলের বিখ্যাত নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বৃটিশ শ্রমিকদলের বহুবিঘোষিত সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের নীতির মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করে শ্রমিকদলীয় ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী পার্লিয়ামেণ্টের সমর্থনে এই কালাকানুন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন পাক-ভারত উপমহাদেশে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য।

ঐ আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলার বিপ্লবী দলের এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ইত্যাদি বিপ্লবী নেতাকে রেলওয়ে ডাকাতির ব্যাপারে পরবর্তী এক মামলায় ধরা হয়েছিল। এই মামলা সম্পর্কে প্রফুল্ল দারোগা বহু তথ্য জেনে ফেলেছিল বলেই তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয় তা আগেই বলেছি। ঐ মামলায় পরে তাঁদেরও আসামী দেওয়া হয় কিন্তু বিচারে তাঁরাও মুক্তি পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঐ কুখ্যাত কালাকানুনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাছাড়া চট্টগ্রাম থেকে বিনা বিচারে ঐ আইনে ধৃত হন ১৯২৪-এর ২৫শে অক্টোবর তারিখে অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন সেন (জুলুদা), রাজেন দাস, অনুরূপ সেন, যশোদা চক্রবর্তী, যোগেশ দে, অনিল গুহ,* প্রবীণ বড়ুয়া, রাজেন দে, লোকনাথ বল, নির্মল সেন ইত্যাদি। সারা অবিভক্ত বাংলায় তখন প্রায় আড়াইশত বিপ্লবীকে আটক করা হয়। তাদের বাংলা, ভারত ও বার্মার বিভিন্ন জেলে বন্দী করে রাখা হয়। যখন (বেঙ্গল অর্ডিনান্স) সংশোধিত ফৌজদারী আইন, ১৯২৫ বলে সারা বাংলায় গ্রেপ্তারের অভিযান চলছিল, তখন বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ছিলেন দেওয়ান বাজারে তাঁর শ্বশুরের বাসায়। দেওয়ানজী পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে গলির ভিতর মাটির দোতালা বাড়ী। বৃটিশ শাসনকালে পুলিশের অন্যরকম রেওয়াজ ছিল। তারা আসত খুব ভোরে এবং যাকে তারা ধরবে তাদের বাড়ী তারা রাতের অন্ধকারে ঘেরাও করে রাখত। ভোরে লোকজন যখন উঠতে আরম্ভ করেছে তখন তারা অন্যায় কাজটি চিনিমোড়া কুইনাইন খাওয়ানোর মত ভদ্রভাবেই সম্পন্ন করত। (অবশ্য চট্টগ্রাম আর মেদিনীপুরে ১৯৩০ এর পরে ও ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সময় তাদের ঐ ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়েছিল, এবং তার ভিতর থেকে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার রক্তমাখা দাঁতগুলো দেখা গিয়েছিল।)

মাষ্টারদা (সূর্য সেন) যে বাসায় ছিলেন, তার ঠিক পিছন দিক দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির বড় নালা। তখন শীত আসন্ন তাই নালায় জল নেই, নরম বালি স্তর পড়ে আছে। পুলিশ পিছনের নালার দিকে

---

* বর্তমানে বিশিষ্ট আইনজীবি।

নিরাপদ মনে করেছে, আর ওদিকে বাসার কোন দরজাও ছিলনা। অন্য তিন দিক তারা ঘেরাও করেছে। মাষ্টারদা ছিলেন দোতলায়। পুলিশ যথাসম্ভব সাবধানতার সহিত নড়াচড়া করলেও মাষ্টারদা তার আভাসেই জেগে গেছেন। তিনি সতর্কতার সঙ্গে উঁকি মেরে দেখলেন যে, তাঁকে ধরবার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কিন্তু দেশের মুক্তি সংগ্রামের বড় দায়িত্ব তাঁর উপর, বিপ্লবের আয়োজন সম্পন্ন করার গুরুভার তাঁকে বহন করতে হবে। তাই তিনি স্থির করলেন, তিনি ধরা দেবেন না এবং যেমন করে হোক তিনি এই পুলিশের ব্যুহভেদ করে পলায়ন করবেন। পলায়নের পথ মাত্র ঐ পিছনের নালা এবং ছাদ থেকে দশ বার হাত নীচে যদি তিনি নালায় লাফিয়ে পড়তে পারেন তাহলে তাঁকে ধরা হয়ত সম্ভব হবেনা। নালায় যে পুরু বালির স্তর ছিল তা তিনি জানতেন।

সিদ্ধান্ত স্থির করেই ঐ বাসার দোতলা থেকে খালি পায়ে একখানা কাল রঙের পর্দাকে লুঙ্গির মত করে পরে দিলেন লাফ। বালিতে লাফ দেওয়ায় খুব বড় শব্দ কিছু হোল না। লাফ দেবার পর মিনিট-খানেক তিনি অপেক্ষা করে লক্ষ্য করলেন, তাঁর এই পলায়ন পুলিশ-বাহিনীর কারও চোখে পড়ল কিনা। দেখলেন তারা নিশ্চিন্ত মনে সকাল বেলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করবে বলে অপেক্ষা করছে। তিনি ঐ নালা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে গিয়ে উঠলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে তিনি পাশের যে পাহাড়ে খ্রীষ্টানদের কবরখানা আছে সে পাহাড়ে উঠে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজের পশ্চিম দিকের দেব পাহাড়ে চলে যান। দেব পাহাড় থেকে পূর্বদিকে নেমে এসে কলেজের পিছন দিকে এক বিপ্লবী কর্মীর বাসায় চন্দনপুরায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেখানে তিনি সেদিন লুকিয়ে থাকেন। লাফ দিতে গিয়ে তাঁর পায়ে ও হাঁটুতে সামান্য ব্যথা তিনি পান, কিন্তু দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়স্থলে আসতে তাঁর কোন কষ্ট হয়নি। তাঁর ও অম্বিকা চক্রবর্তীর অতি প্রিয় জালালাবাদ শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে এই সময় মাষ্টারদার প্রথম পরিচয়। তখন সে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে পড়ত।

ঐদিন পুলিশ মাষ্টারদাকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়ে। তাঁকে ধরবার জন্য পুলিশ প্রথমে আড়াইশত টাকা ও পরে তা বাড়িয়ে হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, কিন্তু মাষ্টারদা ১৯২৪-এর অক্টোবরের থেকে ১৯২৫-এর প্রথম কয়েকমাস পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরা, ঘাটফরহাদ বেগ, পাথরঘাটা, ফিরিঙ্গী বাজার ইত্যাদি জায়গায় পলাতক অবস্থায় থেকে বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সব চেয়ে মজার কথা, যে কোতোয়ালী থানা থেকে তাঁকে ধরার জন্যে প্রায়ই নানা ভূয়া ও কোন কোন সময় সত্য খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী শহরে বের হত, মাষ্টারদা সেই কোতোয়ালী থানার সামনেই এক দোতলা বাড়ীতে বসে বসে পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। পরে কলিকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি গোপনে কলিকাতায় যান। কলিকাতায় অন্যতম বিপ্লবী-দল "যুগান্তর" এর সঙ্গেই মাষ্টারদার হৃদ্যতা ও সাংগঠনিক যোগাযোগ বেশী ছিল। এই "যুগান্তর" দলের সঙ্গে বাংলার যেসব দলের সংযোগ ও বন্ধুত্ব ছিল, তাদের জিলার দলীয় অর্থভাণ্ডার মারণাস্ত্র ও বোমা ইত্যাদি এবং কোন বিপ্লবী কাজ করার ব্যাপারে পরস্পরকে সবাই গোপন করত। কেবল প্রকাশ্য কংগ্রেস ও অন্যান্য আন্দোলনের ব্যাপারে "অনুশীলন" দলের সঙ্গে বিরোধিতার ব্যাপারে নেতিবাচক এক ঐক্য ঐসব "যুগান্তরের" সহযোগী জিলার বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি এই দলের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকেন।

মাষ্টারদা কলিকাতায় পলাতক জীবনকালেও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন নি। সেখানে চট্টগ্রামের ও বাংলার অন্যান্য জিলার কিছু বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় যে একটি বোমার কারখানা কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরে বসানো হয় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মাষ্টারদা যুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি চট্টগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী শহীদ প্রমোদ চৌধুরী ও বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তীসহ শোভাবাজারের গোপন ঘাঁটিতে ছিলেন, পুলিশ খবর পেয়ে ঐ বাড়ী ঘেরাও করলে মাষ্টারদা দোতলা থেকে জলের নল বেয়ে নীচে নিরাপদে চলে যেতে পারেন এবং অন্য দুই বিপ্লবী ধরা পড়ে যান। এর কিছুদিন পর দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানায় পুলিশ হানা দিলে চট্টগ্রাম দলের রাখাল দে সহ (হরিনারায়ন চন্দ, রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র ইত্যাদি) বহু বিপ্লবী ধরা পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা শুরু হয়।

তখন প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা ছিল ভূপেন চাটার্জী নামে অতি ধূর্ত ও অত্যাচারী এক পুলিশ কর্মচারী। জেলের বাইরে এই কর্মচারীটি ধৃত বিপ্লবীদের উপর নানা অত্যাচার করত এবং আটক বিপ্লবী বন্দীরা জেলে বসে সে সব খবর পেতেন। এই ভূপেন চাটার্জী আবার জেলের ভিতরে এসে কপটহাস্যে ও সদ্ব্যবহারে রাজবন্দীদের তুষ্ট করার চেষ্টা করত। কোন কোন সময় সে আলাদাভাবে রাজবন্দীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করত এবং বিপ্লবীদেলের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য রাজবন্দীদের মধ্যে বিভেদ স্বষ্টির চেষ্টা করছিল।

দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার বন্দীরা এই ব্যাপারে একটি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তা করেন এবং তখনও কলিকাতায় পলাতক সূর্য সেনের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করার ব্যবস্থা জেল থেকেই করা হয়। স্থির হয় জেলের ভিতরেই ভূপেন চাটার্জীকে শেষ করে দিতে হবে। জেলের মধ্যে গোপনে লোহার 'রড্' বা টুকরা কিছু যোগাড় করে গোপনে রাখা হয়।

ভূপেন চাটার্জী একদিন বিকালে জেল ওয়ার্ডার পরিবেষ্টিত হয়ে রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে প্রবেশ করে এবং তখন হঠাৎ চট্টগ্রামের (কেলী-শহর গ্রামের) বিপ্লবী প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী এবং অন্য জেলার দুই বিপ্লবী ধ্রুবেশ চাটার্জী ও অনন্তহরি মিত্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে সংগৃহীত উপরোক্ত জিনিসগুলি দিয়ে আঘাত করতে করতে হত্যা করে ফেলে।

ইতিপূর্বে চন্দন নগরের কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁদের বিশ্বাসঘাতক সহকর্মী নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে সংগৃহীত পিস্তল দিয়ে হত্যা করে সারা দেশে যেমন বিস্ময় সঞ্চার করেছিল, তেমনই ভূপেন চাটার্জীর হত্যাতে বিপ্লবী মহলে ও দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ আলোড়ন স্বষ্টি হয়।

এই ব্যাপারে সরকার খুব তাড়াতাড়ি বিশেষ আদালতে বিপ্লবীদের বিচারের ব্যবস্থা করে। বিচারে প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরির ফাঁসীর আদেশ হয় এবং আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁদের ফাঁসী দেওয়া হয়।

তখন থেকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করা বিপ্লবীদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কারণ টেগার্ট এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার ধৃত বিপ্লবীদের উপর করত যে তার কোন সীমা নেই। কোন রাজনৈতিক মামলায় যুক্ত সন্দেহে যখন কাউকে গ্রেপ্তার করে, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের সদর দফতর "ইলিশিয়াম রো'-তে (বর্তমান লর্ড সিংহ রোড) নিয়ে যাওয়া হত, তখন তাদের উপর অমানুষিক বর্বরতা টেগার্ট-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে করা হত। সেই অত্যাচারের কথা এত বেশী বিপ্লবীদলের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, বিপ্লবী-দলের বিভিন্ন জিলা ও কলিকাতা উপদল প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্নভাবে টেগার্ট-হত্যা করার পরিকল্পনা করে। মাষ্টারদার অনুমতি নিয়ে কলিকাতার চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের কালী সেন, দেবেন্দ্র গুহ ইত্যাদির সহযোগিতায় চট্টগ্রাম দলের পক্ষ থেকেও ১৯২৮শে টেগার্ট হত্যার এক পরিকল্পনা করা হয়। তখনকার চিৎপুর রোড কলিকাতার নিকৃষ্ট পল্লী বলে গণ্য ছিল। সেখানে বারাঙ্গনা পল্লীতে একটি ছোট ঘর ভাড়া করা হয়। উপরে নীচে পাশে রূপোপজীবিনীরা রয়েছে, তার মধ্যে পূত চরিত্র বিপ্লবীরা থাকবে, একথা কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, এই ভেবেই ঐ ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। কালীসেন ছিলেন এম-এস-সি, তাই তাঁর তত্ত্বাবধানে খুব ভাল করে বোমার বিস্ফোরক প্রস্তুত করা শুরু হয় ঐ ঘরে। অন্যদিকে অত্যন্ত সাবধানী টেগার্ট কলিকাতায় যখন তার মটরকারে করে ঘুরে বেড়াত তখন সে কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে তা খুব গোপন রাখা হত। কয়েকবার আক্রান্ত হবার পর সে একই রং এর দু'খানা মোটরকার এবং প্রায় তার মত চেহারার আর একটি ইংরেজকে সেই মোটরকারে ঘোরাত, যাতে কোন্‌টা টেগার্ট তা কেউ না বুঝতে পারে। তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা ঠিক ঠিক তার খোঁজ করতে পারত এবং মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবীরাও টেগার্টের খোঁজ পেয়েছিল। তাকে আক্রমণ করতে হলে হাত বোমাই প্রশস্ত। তাই চিৎপুর রোডের ঐ বাড়ীতে কালীসেন ও চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবী (যাদের অধিকাংশই ছাত্র ছিল) মিলে হাত-বোমা তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ এক ভোরে দেখা গেল চিৎপুর রোডের ঐ বাড়ী লাল পাগড়ীতে ঘেরাও হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে বিস্ফোরক প্রায় তৈরী হয়ে গেছে,

আর দু'চার দিনের মধ্যেই বোমার খোলে তা ভরা হবে এবং পরের সপ্তাহেই টেগার্ট এর উপর হামলা হবে। রাত্রে ঐ ঘরে থাকতেন একমাত্র কালীসেন। দিনের বেলায় অন্য সহকর্মীরা এসে জুটত। পুলিশ এসে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে, কালীসেন জেগেছেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। ঐ ঘরখানা এমনভাবে তৈরী ছিল যে, তার ভিতরেই কলিকাতার মাটির নীচের নালার একটি মুখ ছিল। তার লোহার ঢাকনা খুলে এতদিনের কষ্টে তৈরী করা বিস্ফোরকগুলি বিপ্লবী কালীসেন নালায় ফেলে দিলেন এবং ঢাকনাটি ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তারপর দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সার্জেণ্ট, পুলিশ, ডি-আই-বির লোক দৌড়ে ঢুকেই তাঁকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু তাঁর সামান্য বিছানা ছাড়া কিছুই সেই ঘরে নেই। কেবল চূণকাম করা দেওয়ালে কিছুটা হলদে ছোপ লেগে আছে। তা থেকে সন্দেহ করা যায় যে, বিস্ফোরক তৈরীর হলদে ধোঁয়াই ওখানে লাগাই স্বাভাবিক। কালীসেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ইলিশিয়াম রোডে ঐ স্বল্পবাক বিপ্লবীর উপর বহু অত্যাচার করা হল, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ এই বিপ্লবী কোন কিছু জানেন না ছাড়া আর কিছুই বললেন না। কিছুদিন পরে তাঁকে পুলিশ ছেড়ে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন কোন অতি নিকটসাথী বিশ্বাসঘাতকতা না করলে পুলিশের পক্ষে এই চিৎপুরের বাড়ীর সন্ধান জানা সম্ভব নয়। এতে ব্যথা পেয়ে কালীসেন পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

এর কিছুদিন পর পলাতক অবস্থায় ১৯২৬শে মাষ্টারদা হঠাৎ একদিন ধরা পরে গেলেন কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক মেসে। ধরা পড়ার সময় তিনি অবশ্য আবার পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকা খবর পেয়ে পুলিশ আগাতে সবদিক তারা ভালভাবে আগলে রেখেছিল বলে তিনি পলায়নে ব্যর্থ হন।

মাষ্টারদাকে (বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে) সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক করা হল। পরে তাঁকে বোম্বাই-এর রত্নগিরি জেলে বরিশালের নিরঞ্জন সেন * ও অন্য কিছু বিপ্লবীর সঙ্গে আটক করে রাখা হয়।

* কয়েকমাস পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য থাকা অবস্থায় পরলোকগত।

মাষ্টারদা যখন রত্নগিরি জেলে আটক তখন তাঁর স্ত্রীর কঠিন টাইফয়েড রোগ হয়। দেওয়ান বাজারের বাসা থেকে মাষ্টারদা পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী সেখানে মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। বহু দরখাস্তের পর মাষ্টারদাকে পুলিশ পাহারায় রত্নগিরি জেল থেকে ছুটিতে চট্টগ্রাম আনা হয় তাঁর মুমূর্ষ স্ত্রীকে দেখবার জন্য।

এখানে মাষ্টারদার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগেই বলা হয়েছে তখনকার বিপ্লবীরা ধর্মভাব দ্বারাই বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করা একটি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তপস্যা হিসাবে গ্রহণ করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিপ্লবীদের বিবাহিত জীবনের কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না এবং বাংলার সেদিনের বহু বিপ্লবী নেতা চিরকুমার হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, কেউ কেউ সেই অবস্থায়ই এখনও বার্ধক্য যাপন করছেন। তাই মাষ্টারদা বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষিত হবার পর বিবাহ বিরোধী ছিলেন।

১৯১২ সালে নন্দনকাননে হরিশদত্তের ন্যাশন্যাল স্কুল থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ'তে ভর্তি হন। তারপর তিনি ১৯১৮ তে বহরমপুর কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন এবং তখন থেকেই বিপ্লবীদলের সঙ্গে তাঁর গভীরতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাশ করে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসার পর থেকেই তাঁর বিবাহের কথাবার্তা অভিভাবকরা তোলেন। তিনি সর্বদা বিবাহে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন। অবশেষে তাঁর বড়ভাই শিক্ষক চন্দ্রনাথ সেন (সহোদর নয়) ও অন্যান্য আত্মীয়দের বিশেষ অনুরোধে তিনি কানুনগোয় পাড়ার নগেন্দ্রনাথ দত্তের পরমাসুন্দরী ষোল বছরের কন্যা পুষ্প দত্তকে ১৯১৯শে বিবাহ করেন। মাষ্টারদার মনে বিবাহ সম্পর্কে এই ধারণা বলবৎ ছিল যে, বিপ্লবীর বিবাহিত জীবন তাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করবে, আদর্শচ্যুত করবে। তার ফলে ঐ সুরূপা ও ষোড়শী স্ত্রীর সঙ্গে একদিন তিনি কথা পর্যন্ত বলেন নাই। বিবাহের তৃতীয় দিনে হিন্দুদের মধ্যে যে ফুলশয্যার প্রথা প্রচলিত আছে, সেদিন তিনি তাঁর বৌদিকে বলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য তাই তিনি ঐদিনই গ্রামের বাড়ী ছেড়ে শহরে চলে আসেন এবং তারপর

আর কোনদিন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেননি। তাঁর স্ত্রী যখন এই জগত থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তখন শেষবারের মত তাঁকে তিনি দেখতে আসেন, রাজবন্দী হিসাবে। অবশ্য বৃটিশ সরকারী ব্যবস্থাও এমন হৃদয়হীন ছিল যে, মাষ্টারদাকে ছুটী দেওয়া হয় এমন অবস্থায়, যখন তিনি এসে দেখেন, তাঁর স্ত্রীর আয়ু সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। যে জীবনসঙ্গিনী বহু আশা করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, যিনি মাষ্টারদার অবর্তমানে তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে মাঝে মাঝে অনুযোগ করেছেন, "কেন, তোমরা যদি তোমাদের দাদার কাজে লাগতে পার, আমি কেন পারব না? কেন আমাকে তিনি কাজের যোগ্যা করে নেন না?"—এসবের মধ্য দিয়ে কি আকুতিই না ফুটে উঠত এই মহিলাটির, কিন্তু এ জীবনে তিনি তাঁর সমস্ত ঐকান্তিকতা ও সৌন্দর্য দিয়েও তখনকার আদর্শের কঠোর বর্ম দিয়ে ঢাকা শান্ত ও কঠোর এই বিপ্লবী নেতার দেহমনের সান্নিধ্যে যেতে পারেননি।

পাঁচ

১৯২৫—২৮ পর্যন্ত চট্টগ্রামের প্রধান বিপ্লবী নেতারা যখন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বিনাবিচারে আটক ছিলেন, তখন তার পরের স্তরের নেতা ও কর্মীরা গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রাখে। তখন কাজ ছিল গোপন অস্ত্রশস্ত্র ও বে-আইনী বিপ্লবী সাহিত্য সংগ্রহ করা, দলের সাইকেল ও অন্যান্য জিনিসপত্র সযত্নে রক্ষা করা, অর্থসংগ্রহ করা এবং দলের সদস্যসংখ্যা বাড়ানো। সেই সময় সূর্যসেন দলের বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম ব্যায়ামাগার স্থাপন করে শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে দেবপাহাড়ের উপর। প্রতি অপরাহ্নে ওখানে চট্টগ্রাম কলেজ, নর্মাল স্কুল ও অন্যান্য স্কুলের হিন্দু-মুসলিম প্রায় ২৫/৩০ জন ছাত্র ও যুবক নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করত।

তারপর ১৯২৮ সালের প্রথমদিকে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রথম, পরে অন্যান্য নেতা—সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন ও অন্যান্যরা ইংরেজ সরকারের আটকখানা থেকে মুক্ত হয়ে এলেন। তাঁরা ফিরে আসার পর থেকে চট্টগ্রামে বিপ্লবী কর্মোদ্যমের এক নূতন জোয়ার এল।

দলের নেতৃস্থানীয়দের এক বৈঠক তখন ডাকা হয়। সেই বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনায় স্থির হয় যে, প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কাজ করা হবে এবং সম্ভব হলে জিলা কংগ্রেসকে নিয়মানুগতভাবে দখল করতে হবে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানই লক্ষ্য, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও আদর্শনিষ্ঠ সচ্চরিত্র ও সাহসী যুবক। তার উপর বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন জেলে বিগত আটককালে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে অন্যান্য জিলার বিপ্লবীদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা হয়েছে। তাতে সর্বভারতীয়—সম্ভব না হলে নিখিল বঙ্গ একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান একই তারিখে, একই সময়ে করার স্বপ্নও তাঁরা দেখেছিলেন। তার জন্য প্রদেশের 'যুগান্তর'-দলের সঙ্গে যুক্ত এবং অনুশীলন দলের কিছু দলত্যাগী (যাদের অনুশীলন রিভোল্ট গ্রুপ

অথবা বিদ্রোহী দল বলা হত) নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনার কথা ঠিক হয়।

একটি বিশেষ জরুরী সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে গ্রহণ করা হয়। তা হল, বিপ্লবী কাজের জন্য অতীতের পরৈকোড়া ডাকাতি বা পাহাড়তলী রেলওয়ে ডাকাতির মত আর কোন ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ প্রস্তাবিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য করা হবে না। দলের সদস্যরা নিজ নিজ পরিবারের অর্থভাণ্ডার থেকে, পরিবারের সম্মতি বা অসম্মতি দ্বারা যেমনই হোক না কেন, অর্থ সংগ্রহ করবে। নিজের মা, বোন বা অন্য নিকটাত্মীয়ার নিকট থেকে বিপ্লবের কাজের কথা তাদের বুঝিয়ে তাদের ব্যবহৃত সোনার অলঙ্কার নেওয়ার কথাও এই বৈঠকে স্থির হয়। নেহাৎ বুঝিয়ে নেওয়া সম্ভব না হলে, চুরি করে নেওয়া হবে, এটাও ঠিক হয়। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এইসব কাজ নৈতিক দিক থেকে যে কোন অন্যায় হবে না তাও সাধারণ সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কথা স্থির হয়।

বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য সদস্য সংগ্রহের ও নূতন কৌশল ঠিক হয়। সদরঘাটে বর্তমান "পি-কে-সেন অয়েল মিলের" পাশেই সদর রাস্তা থেকে পূর্বদিকে একটি খালি মাঠ ছিল। তাতে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের পরিচালনায় একটি বড় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করা স্থির হয়। "সদরঘাট ক্লাব" নাম দিয়ে এই ব্যায়ামাগার অল্পদিনের মধ্যেই স্থাপিত হয়। তাছাড়া শহরের উত্তরাংশে দেব পাহাড়ের উপর যে ব্যায়ামাগার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দলের মুক্ত তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে তাকে নীচে সমতলে চন্দনপুরায় চট্টগ্রাম কলেজের উত্তর পূর্বদিকে যে বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল তাতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। পরে শহরে এবং সম্ভব হলে গ্রামেও এই রকম ব্যায়ামাগার আরও প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে স্থির হয়।

এইসব ব্যায়ামাগারে শহরের স্কুল কলেজের সচ্চরিত্র সাহসী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের আনতে হবে এবং তাদের ভিতর থেকেই বিপ্লবীদের সদস্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে স্থির করা হয়। এই সিদ্ধান্ত যে বাস্তবে পরে ভালভাবেই রূপায়িত হয়, তা ভবিষ্যৎ ঘটনা থেকে প্রমাণিত

হয়। ১৯৩০ এর অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ ও পরবর্তী বহু খণ্ড যুদ্ধে এইসব ব্যায়ামাগারে গড়ে তোলা ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেয়।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মুক্ত হয়ে আসার পরে জিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক আড়ম্বরপূর্ণ 'মুক্ত রাজবন্দী' সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। ১৯২৮ সালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতার মেয়র। তিনি এই সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিপ্লবীদের অম্লান দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের প্রতি অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান। জিলা কংগ্রেস সভাপতি মহিম চন্দ্র দাসও সুললিত ভাষায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী কর্মীদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমকে অভিনন্দিত করেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সূর্যসেন ও তাঁর সহকর্মীরা চট্টগ্রাম কংগ্রেসে কাজ আরম্ভ করেন। অম্বিকা চক্রবর্তী চট্টগ্রাম জিলা থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ.আই.সি.সি) অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হলেন। জিলার অন্যান্য প্রকৃত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে এই বিপ্লবীরাও প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কাজ করার ফলে দেশের লোকের কাছে কংগ্রেস নেতা হিসাবেও তাঁরা প্রতিভাত হয়ে উঠতে লাগলেন। অন্যদিকে গোপন বিপ্লবী সংগঠনের কাজও বেশ ভালভাবে চলছে। অর্থসংগ্রহের নূতন কৌশল প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া তখন থেকে কিছু কিছু দেখা গেল, কিন্তু নিজ পরিবারের ছেলে মেয়েদের অভিভাবকরা নিজেরা কিছু শাসন করা ছাড়া আর কিছু তখনও করেন নাই।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সূর্য সেন--দলের কিছু বিশিষ্ট সদস্য তখন কলিকাতায়। গোপন কার্যক্রমের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে, কলিকাতার গোপন অস্ত্র আমদানীকারকদের কাছ থেকে রিভলভার, পিস্তল কেনা, বিস্ফোরকের জন্য পিকরিক এসিড', 'গান-কটন' তৈরী করা, বোমার খোল গোপনে জিলায় নিয়ে আসা—এসব কাজ করা বা একাজে নেতাদের সাহায্য করা এবং অর্থ ও নূতন সদস্য সংগ্রহ করা ছিল, কলিকাতা অবস্থানকারী চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের কাজ।

কলিকাতার এই চট্টগ্রাম দলটি এই সময় (১৯২৮) একটি বড় "কাজ" করার পরিকল্পনা করে। মাষ্টারদা এই ব্যাপারে অনুমতি দেন। পূর্বেই কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট হত্যার যেই প্রচেষ্টার বিবরণ বলা হয়েছে তার ব্যর্থতার কারণ এবার বলি।

এখানে একটি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের নাম উল্লেখ করাতে হয়ত এই কাহিনীই কলঙ্কিত হবে। তবু তার নাম বলা দরকার। কারণ ১৯২৬শে কলিকাতায় মাষ্টারদা পলাতক অবস্থায় যে যায়গায় ধরা পড়েন, তার খোঁজ তাঁর অতি বিশ্বস্ত সহকর্মী একজন ছাড়া অন্য কেউ জানত না। তিনি অতর্কিতে গ্রেপ্তার হবার পর বিপ্লবীদলের অনেকেই সেজন্য ঐ সহকর্মীকে সন্দেহ করে। মাষ্টারদা যখন ১৯২৮শে রাজবন্দীদশা থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁকে এই সহকর্মীটির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। যে পরিবেশে তিনি গ্রেপ্তার হন, তাতে সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যে পুলিশকে সংবাদ সরবরাহ করতে পারেনা, এই কথা তাঁকে কিছু সহকর্মী বললেও তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও মহানুভবতার জন্য তাকে আরও কিছুদিন দেখতে বলেন। চিৎপুরের ঘটনার সঙ্গে চট্টগ্রামের যেসব বিপ্লবী যুক্ত ছিল, তাদের একজনের সঙ্গে এই লোকটির ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং সেই বিপ্লবী একে বিশ্বাস করার জন্য অন্যান্যদের অনুরোধ করে। তার ফলে টেগার্ট হত্যার এই ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিতেও তাকে একদিন নেওয়া হয়। এই ঘাঁটিও যে তারই বিশ্বাস-ঘাতকতায় পুলিশের গোচরীভূত হয় একথা বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকের ধারণা হয়। এবং ১৯২৬শে মাষ্টারদাকেও যে এই লোকটিই ধরিয়ে দিয়েছিল এই ধারণাও তাদের বদ্ধমূল হয়। তখন তারা নিজেরাই তাকে খতম করার এক পরিকল্পনা করে এবং কলিকাতার শিয়ালদহ-উত্তর লাইনের ঢাকুরিয়া যাদবপুর ষ্টেশনের মাঝামাঝি ঘন হোগলা বনের কাছে রাত দশটায় তার সঙ্গে জনৈক বিপ্লবী তরুণ দেখা করার অনুরোধ করে। সময়মত উভয়েই সেখানে মিলিত হয়, কিন্তু অন্য যেই বিপ্লবী সহকর্মীর উপর তাকে হত্যা করার জন্য রিভলভার নিয়ে আসার কথা ছিল, সে সময়মত আসে না। তাই ঐ বিশ্বাসঘাতক দেবেন্দ্র গুহ (বাড়ী ছনহরা) বেঁচে যায়। তার তিন চারদিনের মধ্যেই সে সরকারী খরচে বিমান পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে "গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং" শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসঘাতক

দেবেন্দ্র গুহ যে দেশে ফিরেছে তা জানা যায় নি। শোনা যায় সে সেখানে জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনীর অঙ্কশায়িনী হয়ে চাকুরী করছে। ইংরেজ সরকার এরকম ভাবে অর্থ দিয়ে বিলাত যাত্রার লোভ দেখিয়ে আরও কিছু বিপ্লবীকে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্যপথে নিতে প্রলুব্ধ করেছিল। এইরকম ইংলণ্ডগামী আর একটি বিশ্বাসঘাতকের কথা এই কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত বলে পরে উল্লেখ করা হবে।

এই সময়কার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এখানে বলা দরকার। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নৈতিকমান অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিল। এই দলে কোন মেয়েকে সদস্য করা সম্পর্কে তখন কড়া নিষেধ ছিল। যুক্তি ছিল, মেয়েদের দলের ভিতরে আনলে তাতে দলের ছেলে ও যুবকদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা ও চিত্তবৈকল্য আসতে পারে। তা ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন ও পরবর্তী অভ্যুত্থানে স্বভাব-কোমল বাঙ্গালী মেয়েরা কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়ত পারবে না। তাই দলের কড়া নির্দেশ ছিল, বিপ্লবী সদস্যরা নিজেদের মা ও তেমন শ্রদ্ধেয়া ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়াদের সঙ্গে ছাড়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে না, কথাবার্তাও যথাসম্ভব বলবে না। দলের সব সদস্য দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই নির্দেশ পালন করত।

বীরকন্যা প্রীতিলতা তখন (১৯২৭শে) চট্টগ্রাম ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে সম্মানের সহিত ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা ইডেনে আই-এ'তে ভর্তি হয়েছে। তার সম্পর্কিত বড় ভাই একজন তখন বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট কর্মী। সেই ভাই যখন নানা নিষিদ্ধ বিপ্লবী বই এনে পড়ত তখন প্রীতিলতা মাঝে মাঝে বড় ভাইয়ের অগোচরে চুরি করে ওসব বই পড়ত। একদিন প্রীতিলতা হঠাৎ তার সে ভাইকে বলে—"দাদা, আমরা তোমাদের ওসব কাজ পারি না?"

তার দাদা জবাব দেয়—"না, মেয়েদের দ্বারা ওসব কাজ চলে না। গুলী চালাতে হবে, মারামারি করতে হবে—কত কঠিন সব কাজ, তোমাদের মত নরম মেয়েদের দিয়ে সে সব কাজ কি করে হবে?

প্রীতিলতার ডাক নাম ছিল "রাণী" । সে বলে, ইতিহাসে দেখেছি ঝাঁন্সীর রাণী ঘোড়ায় চড়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমার নামও রাণী, আমিও পারব রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মত লড়তে। আমাকে তুমি সব শেখাও না—আমি চুরি করে তোমার বইয়ের ভিতর থেকে "বাঘা যতীন" "কানাইলাল", "দেশের কথা" (মহারাষ্ট্রীয় লেখক সখারাম গণেশ দেউস্করের বাংলা রচনা) বইগুলো পড়েছি। নাও না আমাকে তোমাদের দলে—স্বাধীনতার জন্য আমিও তাদের মত মরতে পারব।

বিপ্লবী বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনের এই আত্মত্যাগের আকুতি তার মনে প্রশ্ন জাগায়। অথচ কড়া নির্দেশ রয়েছে দলের। অনেক-দিন ভেবে বড় ভাই কথাটি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে প্রধান নেতা মাষ্টার-দাকে বলে। প্রীতির সব কথা শুনে তিনি ঐ কড়া নির্দেশ কিছুটা শিথিল করেন। নিজের আপন বোন এবং ঠিক তেমন সম্পর্ক বিশিষ্টা মেয়েদের দলের কিছু কাজ দেওয়া চলে এই সিদ্ধান্ত তিনি জানান। তারা নিষিদ্ধ বই পড়বে, তাদের অলঙ্কার দিয়ে পার্টির অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে ও পার্টির গোপন বই ও অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া আর কোন কাজে তাদের নেওয়া হবে না এবং আপাততঃ ঐ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সারা বিপ্লবীদলের মধ্যে চালু করা হবে না। কেবল শহরেই এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে এবং মাষ্টারদা নিজে তাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ নির্দেশাদি দেবেন।

এই নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত হয়েছিল, তা বিপ্লবীদলের সকলেই এবং দেশবাসীও পরে উপলব্ধি করেছিল। দলে মেয়েদের আনার সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন শহরে চার-পাঁচজন হিন্দু ও একজন মুসলিম ছাত্রী বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে মাষ্টারদা গোপনে দেখাও করেন। তাঁদের প্রায় সকলেই তখন বিপ্লবী দলকে গোপনে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ বাজার থেকে কাঁচের চুড়ি কিনে, তা হাতে দিয়ে সমস্ত সোনার অলঙ্কার বিপ্লবীদলের জন্য হাসতে হাসতে দিয়েছেন। কেউ পূর্বনির্দেশ অনুসারে নিজ পরিবারের হাজার দেড়হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার এনে দিয়েছেন। কেউ নিজের বিবাহের জন্য তৈরী

অলঙ্কার একটু প'রে দেবার মিথ্যা আবদার করেছে তাদের মায়ের কাছে...তারপর রাত্রি নিশীথে গ্রামে পুকুর পাড়ের পায়খানায় যাবার নাম করে গিয়ে প্রতীক্ষারত বিপ্লবী নেতাকে সব দিয়ে এসেছে। কেউ সেই রকমভাবে বিবাহের অলঙ্কার প'রে বাড়ীর পিছনের পুকুরে বহুক্ষণ সাঁতার কাটার পর ফিরে এসে কাঁদ কাঁদভাবে মাকে বলেছে, তার ভারী সোনার হারখানা গলা থেকে পুকুরে পড়ে গেছে। অভিভাবকরা ধরে ফেলেছে তাদের মেয়েদের ঐ পায়খানায় যাওয়া ছলনা, পায়খানায় কেউ নেই, কেবল বাতিটি জ্বলছে। পরে খোঁজ করতে করতে দেখা গেল, নিকটবর্তী স্কুল ঘরের বারান্দায় বসে সে এক ছোট বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আলাপ করছে। গলার হার খোঁজার জন্য জেলেকে দিয়ে সারা পুকুরে বার বার জাল ফেলে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সে হার ততক্ষণে বিপ্লবী সহোদয়ের মারফত বিপ্লবী-সদরে পৌঁছে গেছে। এসব মেয়েরা এই রকম ত্যাগের জন্য তখন অভিভাবকদের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছে। প্রহারের চোটে তাদের মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছে, কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরোয়নি। এমনই বিপ্লবী নিষ্ঠা ছিল ঐসব মেয়ে-বিপ্লবীদের। পরে ১৯২৯ সালে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে খ্যাতনাম্নী কল্পনা দত্তও বিপ্লবীদলে যোগদান করে।

ছয়

বাংলার কংগ্রেসে তখন চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুইদল। দুইটি বিপ্লবী সংস্থা "অনুশীলন" এবং "যুগান্তর" দলও ক্রমে কংগ্রেসের ঐ দুই দলের নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালের শেষে কলিকাতা পার্ক সার্কাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বাষিক অধিবেশন হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সেই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তার কারণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চাপে ১৯২৮শে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের রাজনৈতিক সাবালকত্ব পরীক্ষা করার জন্য "সাইমন কমিশন" নিয়োগ করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তা' বয়কট করা হয় এবং পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের কাছে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" (ঔপ-নিবেশিক স্বায়ত্বশাসন) দাবী উত্থাপনের জন্য এক কমিশন গঠিত হয়। তাতে ভারতের তৎকালীন যুব নেতা জহরলাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বসু এবং পাঞ্জাবের ডাঃ আলমও সদস্য ছিলেন। সেই "নেহেরু" কমিটির সুপারিশ পাশ করাবার জন্যই পণ্ডিত মতিলালকে ঐ কংগ্রেসে সভাপতি করা হয়েছিল।

ঐ "নেহেরু রিপোর্ট" এ চরমপন্থী ও তৎকালীন যুব-নেতা জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও পাঞ্জাবের চরমপন্থী নেতা ডাঃ আলম স্বাক্ষর করেন না--কারণ তাঁরা বৃটিশ-শাসন মুক্ত স্বাধীন ভারতই চান। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম "ডোমিনিয়ন" হিসাবে মর্যাদা লাভ তাঁদের কাম্য নয় বলে ঐ রিপোর্টে তাঁদের অসম্মতিজনক স্বাক্ষর করেন।

১৯২৮-এর কংগ্রেসে চট্টগ্রাম থেকে বিপ্লবীদলের যাঁরা প্রতিনিধি যান, তার মধ্যে ছিলেন: সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ ইত্যাদি। অন্যতম বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ ঐ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (জি ও সি) সুভাষ চন্দ্রের অধীনে অন্যতম "লেফটেনেণ্ট" ছিলেন।

ঐ কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সরকারী "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনেন। গান্ধীজী ও দিল্লীর প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ডাঃ আনসারী সরকারী প্রস্তাবের পক্ষে বহুবার বক্তৃতা দেন। সেই সুযোগ সমানভাবে সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া হয়েছিল না। তবু বাংলার বিভিন্ন জেলার যেসব "যুগান্তর" দলীয় বিপ্লবী কংগ্রেস প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের সমবেত চেষ্টায় অতি সামান্য ভোটে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নাকচ হয়। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কেবল একজন ছাড়া সমস্ত প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন গান্ধীজীর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন এবং চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার "অনুশীলন" দলীয় প্রতিনিধিরা ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

ঐ কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে বাংলা দেশের জাতীয় আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে এবং উভয়ের সমর্থক বিপ্লবী দল দুইটির দ্বারা প্রায় জেলাতেই সেই দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রামেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

১৯২৯শের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রধান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন। সভাপতি ছিলেন, দৈনিক "পাঞ্চজন্য" সম্পাদক ও জিলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাস। তখন সদরঘাট ক্লাব, চন্দনপুরা ক্লাব ও অন্যান্য "যুগান্তর' দলীয় ক্লাবগুলিতে সদস্য সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ আর লোকনাথ বল তখন ছাত্র ও যুব সমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। এঁরা তিনজনই চলন্ত মোটর গাড়ী দড়ি বেঁধে আটকে রাখতে পারেন এবং দৈহিক অমিত শক্তির অনেক ব্যায়াম-কৌশল দেখাতে পারেন। মোটা মোটা লোহার পাটা অবলীলাক্রমে অনন্ত সিংহ হাতের কবজীতে বেঁকিয়ে লোহার স্প্রিং এর মত করে ছুঁড়ে ফেলে দেন। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ হাতে চামড়ার আবরণ বেঁধে অসুরের মত মুষ্টিযুদ্ধ করেন—নরেশ রায় (জালালাবাদ শহীদ) তার অদ্ভুত ছোরাখেলা দেখায়; অন্যান্য ছেলেরা নানা ব্যায়াম-কৌশল দেখায়—অনন্ত সিংহ জাপানী যুযুৎসু শিখিয়েছেন ছেলেদের। তা দেখে লোক মোহিত হয়। তার উপর বাংলার বিখ্যাত যাদুকর গণপতি চক্রবর্তী যখন চট্টগ্রামে

আসেন, তাঁর কাছ থেকে বহু অনুনয় বিনয় করে অনন্ত সিংহ যাদু বিদ্যা শিখেছেন। শহরে গ্রামে বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে তাঁরা ব্যায়াম-কৌশল যখন দেখাতে যান, সঙ্গে অনন্ত সিংহের "ভৌতিক বাক্স"টিও যায়। অনুষ্ঠান শেষে অনন্ত সিংহের এই যাদুবিদ্যা দেখার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। আগে থেকে হাত পা তাঁর দড়ি দিয়ে বাঁধা হত, তারপর সেই অবস্থায় লম্বা চটের থলির ভিতরে দিয়ে শক্ত করে থলির মুখে দড়ি বেঁধে ঐ অবস্থায় তাঁকে ফেলে রাখা হবে শক্ত কাঠের, (দর্শকদের দ্বারা পরীক্ষিত), একটি সিন্দুকে। সিন্দুকের ডালায় তিনটি তালা—তালাগুলি বন্ধ করে চাবি থাকবে দর্শকদের হাতে। তারপর সিন্দুকের উপর একটি মশারী খাটানো হবে এবং ডাক দিলেই অনন্ত সিংহ সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসতেন। এসে কারও ঘড়ি, কারও চশমা, কারও আংটি তিনি চেয়ে নিয়ে আবার মশারীতে ঢুকতেন। একটু পরে মশারী তুলে দেওয়া হলে দেখা যেত তিনি নেই, তালাগুলি ঠিক আছে এবং চটের থলির মধ্যে ঐ আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে অনন্ত সিংহ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিও এই সময় অনন্ত সিংহকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলির জন্য ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করে। এই বছর (১৯২৯) মে মাসে চট্টগ্রামে চারখানা সম্মেলন সূর্য সেন দলের উদ্যোগে ডাকা হয়। সূর্য সেন নিজে জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক, তাই তিনি উদ্যোক্তা হলেন, জিলা রাজনৈতিক সম্মেলনের। তাতে সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রিত হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তখন বাংলায় সাধারণ যে দলাদলি তার প্রভাবে ছাত্র আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত হয়...যেটি 'অনুশীলন" প্রভাবিত ও যতীন্দ্র মোহনের সমর্থক তার নাম ছিল "অল বেঙ্গল ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশান' (এ.বি. এস.এ)। যুগান্তর প্রভাবিত ও সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল, 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশান' (বি.পি.এস.এ)। শেষোক্ত সংগঠনের প্রাদেশিক যুক্ত সম্পাদক চট্টগ্রামের সূর্য সেন দলের যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন ছাত্র ছিল।

চট্টগ্রামে প্রধানতঃ সূর্য সেনের উদ্যোগে জিলার দুইটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এই সম্মেলনকে উপলক্ষ করে একটি ঐক্য

স্থাপিত হয়। "যুগান্তর" দলের লোকনাথ বল হলেন জিলা ছাত্র সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং "অনুশীলন" দলের যশোদা চক্রবর্তী হলেন সম্পাদক। এই যুক্ত উদ্যোগে ডাকা হল "জিলা ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন।" সভাপতি হয়ে এলেন, ১৯২২শে চট্টগ্রাম কলেজের যেই ভাইস প্রিন্সিপ্যাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে ৭৫০ টাকার সরকারী চাকুরী হেলায় ত্যাগ করেছিলেন সেই বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর একটি সম্মেলন ডাকা হয় জিলা যুবকদের পক্ষ থেকে- "জিলা যুব সম্মেলন।" তার সভাপতি হিসাবে আসেন, বাংলার খ্যাতনামা বহুলাঞ্ছিত বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

জিলা নারীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা চারুবালা দত্তগুপ্তা ও তখনকার একমাত্র বেসরকারী লেডী ডাক্তার শ্রীযুক্তা সুহাসিনী মুখার্জি-র যুক্ত উদ্যোগে "জিলা নারী সম্মেলনও ডাকা হয়। তাতে সভানেত্রী হয়ে আসেন তখনকার নারী আন্দোলনের বিশিষ্টা নেত্রী শ্রীযুক্তা লতিকা বসু, এম. এ, (ক্যাণ্টাব)।

জিলা "ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন" ও "নারী সম্মেলনে" চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত মেয়েরা প্রথম প্রকাশ্য কাজের সুযোগ পায়। এই বছর কল্পনা দত্ত, চট্টগ্রামের ডাঃ খাস্তগীর স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পায়। কল্পনা দত্ত উপরোক্ত সম্মেলন-গুলিতে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে প্রথমে যোগদান করে এবং পরে বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চট্টগ্রামে এই চারিটি সম্মেলনই সূর্য সেন ও তাঁর অনুবর্তীরা পরি-চালনা করে। বিশেষতঃ সভাপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র ও অন্য তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনের প্রচারের ফলে শহরে ও সারা জিলায় এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীরা এই চারিটি প্রকাশ্য সম্মেলন উপলক্ষে দল নির্বিশেষে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী নেতাদের এখানে আমন্ত্রণ করেন।

উদ্দেশ্য ছিল ঐসব সম্মেলনের প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ ছাড়াও গোপনে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে কোন ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ সম্ভব কিনা তা আলাপ আলোচনা করা। যেসব বিপ্লবী নেতা আমন্ত্রিত হয়ে সেই সময় সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (ওরফে মধুদা, ময়মনসিং "যুগান্তর") ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (ওরফে মহারাজ, ময়মনসিংহ "অনুশীলন" ১৯৫৪—৫৮ পর্যন্ত ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ দলীয় পূর্ব পাক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) রবি সেন (ঢাকা, অনুশীলন) ইত্যাদি।

এই চারিটি সম্মেলনের আয়োজনের ও পরিচালনার জন্য যে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠিত হয়, তার সর্বাধিনায়ক ছিলেন গণেশ ঘোষ আর সহকারী অধিনায়ক ছিলেন অনন্তলাল সিংহ। এই সম্মেলনের পূর্বে চট্টগ্রামে "যুগান্তর" ও "অনুশীলনের" মধ্যে যে সাময়িক সমঝোতা সৃষ্টি হয়, সম্মেলনের সময় তা আবার বিফল হয়ে যায়। শহরের যেসব চরিত্রহীন হিন্দু মুসলিম বেকারকে তখন সাধারণভাবে লোকে "গুণ্ডা" বলত, তাদের অনেকে বিপ্লবীদের বিভিন্ন ক্লাবের ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারাও প্রহৃত হয়েছে, তাদের অন্যায় মন্তব্য ও ব্যবহারের জন্য তারা লোকনাথ বল, অনন্তসিংহ ইত্যাদি দ্বারা বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। তাই তারাও সুযোগ বুঝে এই সময় গোলমালে যোগ দিল।

জিলা সম্মেলনের শেষ দিন যখন সভাপতি সুভাষচন্দ্র তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন রহমতগঞ্জ ব্রাহ্ম মন্দিরের গলি দিয়ে এসে কে হঠাৎ স্বেচ্ছাসেবক সর্বাধিনায়ক গনেশ ঘোষকে মুখে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে অন্ধকারে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তা দেখে দ্বিতীয় অধিনায়ক অনন্তলাল সিংহ খদ্দরের খাকী রং-এর সামরিক পোষাক (এগুলো কলিকাতায় ১৯২৮-এর কংগ্রেসে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং চট্টগ্রাম সম্মেলনে তা থেকে কিছু অংশ ধার করে আনা হয়) পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কল্পিত গুণ্ডাদের পিছনে ধাওয়া করেন। তাঁরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে যেই "জে-এম-সেন হল"-র সম্মেলন স্থানে পাহারায় দাঁড়িয়েছেন, তখনই রাস্তার পশ্চিম দিকে ঘন সুপারী গাছের আড়াল থেকে একটি বড় ঢিল এসে একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাথায় জোরে লাগতেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল

ইত্যাদি বড় বড় লাঠি নিয়ে সেদিকে ছুটে যান এবং লাঠির আঘাতে একজন বয়স্ক ব্যক্তি আহত হয়। কাছেই জনৈক রাজভক্ত রায় বাহাদুর সরকারী উকীলের বাসা ছিল। তিনি এসব সম্মেলনের দরুন বড়ই বিরক্ত ছিলেন। কারণ এসবকে তিনি "রাজদ্রোহ' মনে করতেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার ইত্যাদিকে সম্মেলনস্থলে আনিয়ে, ঐ বয়স্ক ব্যক্তিকে আঘাত করার অজুহাতে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ইত্যাদি সহ ১০/১২ জন বিপ্লবীদলীয় স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করাবার ব্যবস্থা করেন।

চট্টগ্রাম মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কংগ্রেস নেতা ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, জিলা কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অক্ষয় কুমার দস্তিদার ইত্যাদির হস্তক্ষেপে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাদের জামিন হয়ে যায়। তবে এরপর থেকে চট্টগ্রামের এই দুই বিপ্লবীদলের মধ্যে সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। শহরে ও গ্রামে পরস্পর হাতাহাতি, মারামারি বেশ কিছুদিন চলতে থাকে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে জিলা কংগ্রেসের বার্ষিক নির্বাচন ব্যাপারে। জিলা কংগ্রেসে এতদিন সেনগুপ্ত (যতীন্দ্র মোহন) ও সুভাষ-চন্দ্র উভয়ের সমর্থকরাই ছিলেন। ১৯২৯শের নির্বাচনে সূর্য সেন দল অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সুভাষ-সমর্থকদের সহায়তায় জিলা কংগ্রেসের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দখলের আয়োজন করেন। সভার স্থান ছিল যাত্রামোহন সেন হল (জে এম সেন হল)। আগে থেকেই এই সভায় সেনগুপ্ত সমর্থকদের (অনুশীলন দলসহ) পক্ষ থেকে আক্রমণ হতে পারে জানা গিয়েছিল। সুভাষ সমর্থকরা তখন চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ব্যায়াম-বীর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল এবং তাদের বিভিন্ন ক্লাবের তরুণ সদস্যদের শক্ত এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে যে কোন আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে বিকালে সভা আরম্ভ করে। হঠাৎ কিছু ভাড়াটিয়া গুণ্ডা জে-এম-সেন হলে জোর করে ঢুকতে চায় এবং কিছু ভিতরে অল্পক্ষণের জন্য এসে হলের লোহার চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি করে। মাষ্টারদা'র মাথায় তখন প্রায় টাক পড়ে গেছে। লোহার নিক্ষিপ্ত এক চেয়ারের আঁঘাতে তাঁর মাথা ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকরা দুকৃতিকারীদের বিতাড়িত করলে, সভায় সুভাষপন্থীদের

পক্ষে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং তখনকার শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ মহিমচন্দ্র দাস সভাপতি নির্বাচিত হন।

ওদিকে গুণ্ডারা তাদের চেয়ে বহুগুণে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী বিপ্লবী-দলের স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে জে.এম. সেন হল থেকে বাইরের দিকে যাবার রাস্তায় কাপুরুষের মত লুকিয়ে থাকে। নিশ্চিন্ত মনে সভার শেষে যখন বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন আর দুই একজন সহকর্মীর সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল অফিসের কাছ দিয়ে সন্ধ্যার সময় যাচ্ছিলেন তখন অন্ধকার থেকে হঠাৎ তাঁর উপর আক্রমণ হয় এবং তাঁর মাথার খুলি কয়েক যায়গায় কেটে যায়। তিনি আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যান এবং পাশেই তখনকার বিখ্যাত ঔষধের দোকান এ, সি, দত্তের ফার্মেসীতে তাঁকে সাময়িক আশ্রয় দেওয়া হয়। অন্য রাস্তা দিয়ে দেওয়ান বাজারের পথ ধরে যাচ্ছিল দুই তরুণ বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক সুখেন্দু দত্ত ও মতি কানুনগো (পরে জালালাবাদ শহীদ)। অন্ধকারে অন্য এক দুকৃতিকারী ষোল বছরের ঐ তরুণ সুখেন্দুকে পিছন থেকে ছুরি দিয়ে ভীষণ আঘাত করে, মতি কানুনগো সামান্য আহত হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এই গুণ্ডামীর ফলে সারা চট্টগ্রাম শহরের হিন্দু মুসলিম দেশপ্রেমিকরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে। মাষ্টারদা, নিমল সেন ও সুখেন্দু দত্তকে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সেখানে সুখেন্দুর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে কলিকাতা থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র তখনকার অন্যতম বিপ্লবী নেতা খুলনার সতীশদা'কে চট্টগ্রাম পাঠান এবং যত অর্থ প্রয়োজন তা খরচ করে সুখেন্দুকে বাঁচাবার নির্দেশ দেন। এখানে চিকিৎসকরা কোন আশা নাই বলাতে বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী মরণাপন্ন তরুণ বিপ্লবী সুখেন্দু দত্তকে নিয়ে কলিকাতা চলে যান। ওখানে তাকে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমানে আর-জি-কর) ভর্তি করানো হয়। বাংলার কংগ্রেস নেতৃবর্গ যাঁরা তখন কলিকাতায় ছিলেন, প্রায় সকলেই সুখেন্দুকে সর্বদা হাসপাতালে দেখতে যেতেন। কিন্তু সুখেন্দুকে ডাক্তাররা বাঁচাতে পারেন নাই। কারণ ছুরির আঘাতে তার মেরুদণ্ড কেটে গিয়ে আহত স্থানের নীচের দিকে পা পর্যন্ত অবশ হয়ে গিয়েছিল। সুখেন্দুর মৃত্যুর সঙ্গে

সঙ্গে তার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য এসেছিলেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা (ভূতপূর্ব পূর্ব-পাক পরিষদ সদস্যা), কংগ্রেস নেতা কিরণ শঙ্কর রায়, বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী ইত্যাদি।

১৯২৯ সালে সারা ভারত আর একটি ঘটনায় আলোড়িত হয়ে উঠে। তা হচ্ছে এই বছরের ১৩ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী যতীন দাসের আত্মদান। ১৯২৮শের শেষদিকে লাহোরের পুলিশ সুপার মিঃ স্যাণ্ডার্স কোন অজ্ঞাত আততায়ী দ্বারা নিহত হয়। সন্দেহক্রমে ধরা পড়েন বাঙ্গালী বিপ্লবী যতীন দাস, বটুকেশ্বর দত্ত আর পাঞ্জাবের বিপ্লবী তরুণ ভগত সিং ও শুকদেব। বৃটিশ শাসনকালে বাংলার ও ভারতের বিপ্লবী রাজবন্দী (বিনা বিচারে আটক) ও রাজনৈতিক বন্দীরা (কোন রাজনৈতিক মামলায় যাদের সাজা হয়েছে) কারাগারের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ও অবমাননাকর ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করেছেন। নিরস্ত্র অবস্থায় কারাপ্রাচীরের আড়ালে বসে তাঁরা সয়েছেন নির্মম লাঠির আঘাত, অন্ধকার কুঠুরীতে বছরের পর বছর আটক রয়েছেন, এমন কি তাঁদের উপর গুলীও চালানো হয়েছে (হিজলী আটকখানাতে ১৯৩১শে, যাতে বিপ্লবী নেতা কলিকাতার সন্তোষ মিত্র ও বরিশালের তারকেশ্বর সেন নিহত হন ও প্রায় ১৫ জন আহত হন)। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অংশ হিসাবে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন জেলে এইসব বন্দীদের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী আজও সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়নি। তারমধ্যে জেলে রাজনৈতিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ৬৩ দিন অনশন ধর্মঘট করে বীর বিপ্লবী যতীন দাসের চরম আত্মদান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে—বিশেষ করে তাঁর আত্মদানের পর থেকেই রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বন্দীদশায় যেসব প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধা ও মর্যাদা আদায় করেছেন, তার জন্য যতীন-দাসের এই অমর আত্মত্যাগই দায়ী।

যতীন দাসের এই আত্মদানের অথবা বৃটিশ সরকারের চরম ঔদাসীন্য ও নিষ্ঠুরতার জন্য তিলে তিলে একটি মুক্তিপাগল বীরকে ইচ্ছাপূর্বক কারাকক্ষে হত্যা করার জন্য, সারা ভারতে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ দেখা

দেয়। সরকারকে এই বিক্ষোভের কাছে মাথা নত করে, বিশেষ রেলগাড়ীতে করে লাহোর থেকে যতীন দাসের মৃতদেহ কলিকাতায় পাঠাতে হয়। যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীর যে মিছিল সেদিন হাওড়া ষ্টেশন থেকে দক্ষিণ কলিকাতার যায়, তেমন শোক-মিছিল কলিকাতার বুকেও মানুষ কমই দেখেছে। সুভাষচন্দ্র খালিপায়ে শবাধার বহন করেছেন, রাস্তার এংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট অভিভূত হয়ে জুতো খুলে ফেলে দিয়ে শবাধার একটুখানি তাঁর কাঁধে দেওয়ার জন্য অনুনয় করেছে, মা বোনেরা পথে পথে চোখের জলে ফুল দিয়ে বীরকে অভিনন্দিত করেছেন—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

যতীন দাসের এই আত্মদানের সংবাদ চট্টগ্রামে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্কুল—কলেজের ছাত্র ও যুবকরা ধর্মঘট করে রাস্তায় নেমে আসে। বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে যে বিরাট মিছিল সেদিন সারা চট্টগ্রাম শহর পারভ্রমণ করে তাও অভূতপূর্ব। মিছিলের পর সকলে টাউন হলের জনসভায় মিলিত হয়। সেখানে বিপ্লবী নেতারা বজ্রনির্ঘোষে যতীন দাসের অসমাপ্ত কাজ সফল করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত ছাত্র-জনতা তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। তাতে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব নানা কৌশলে তরুণ নেতা জহরলাল নেহেরুকে সভাপতি নির্বাচিত করে। তার কারণ বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর জহরলাল নেহেরু সারা ইউরোপ ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘুরে এসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে চরমপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছেন এবং মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্রের কথাও বলছেন। সে সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ-কাহিনীও তিনি প্রকাশ করেন। কলিকাতা কংগ্রেসে পূর্ব বৎসর তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের এক পা পিছনে যাওয়া "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্' প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বিখ্যাত দেশপ্রেমিক নেতা মৌলানা হাসরত মোহানী খুব সম্ভবতঃ ১৯২৫-এ সর্বপ্রথম প্রস্তাব এনেছিলেন যে, ভারতের জাতীর কংগ্রেসের লক্ষ্য হল বৃটিশ শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই প্রস্তাব তখন গৃহীত হয় নাই। তারপর ১৯২৭-এর মাদ্রাজ কংগ্রেসে

তরুণ নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আবার ঐ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধীতা সত্বেও তা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই তখন কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব। তারা মনে করেছিল বিরাট ধনী ও প্রখ্যাত উকিল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর একমাত্র যেই পুত্র বৃটিশ যুবরাজের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সেই ভাল লেখক ও বক্তা জহরলালকে বামপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তাই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ভোটে জহরলাল ৪র্থ স্থান অধিকার করলেও, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত প্রভাবে প্রথম থেকে ৩য় স্থান যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ নাম প্রত্যাহার করেন এবং ৪র্থ স্থান অধিকারী জহরলাল অবশেষে নিজ পিতার পরের বৎসরই কংগ্রেস সভাপতি হতে পারেন।

দক্ষিণপন্থী নেতারা ১৯২৮শের কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র উত্থাপিত যে "পূর্ণ স্বাধীনতা" প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধীতা করেছিলেন, ১৯২৯শের লাহোর কংগ্রেসে সেই প্রস্তাব আনলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। তখন বামপন্থীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বাংলার বিপ্লবী নেতারা ও পাঞ্জাবের তরুণ কর্মীরা। বামপন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে সুভাষ চন্দ্র এই কংগ্রেসে "সমান্তরাল সরকার" গঠনের জন্য "পূর্ণ-স্বাধীনতা" প্রস্তাবের চেয়েও গরম প্রস্তাব আনেন।

চট্টগ্রাম থেকে লাহোর কংগ্রেসেও প্রতিনিধি হিসাবে যান—সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী। তখন জিলা কংগ্রেস সূর্য সেন দলের হাতে, তাই প্রতিনিধি দলেও তাঁদের পছন্দমত লোক তাঁরা নিয়েছেন। সেই সময় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে একটি সর্ব-ভারতীয় ছাত্র সংগঠন তৈরী করার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে যে নিখিল ভারত ছাত্র কন্‌ভেনশন ডাকা হয়, তাতেও চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধি তখন লাহোর যায়। তারা অনেকেই কংগ্রেস প্রতিনিধিও ছিল। এই কংগ্রেসে আবার যখন সুভাষ চন্দ্রের প্রস্তাব ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসে, তখন বাংলার দুই নেতা যতীন্দ্র মোহন ও সুভাষ চন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচারে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে চট্টগ্রামের প্রায় সকল প্রতিনিধিই সুভাষ চন্দ্রের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

সাত

১৯৩০ সালের শুরু থেকেই ভবিষ্যত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হয়ে যায়। ১৯২৯শে মাষ্টারদা আর অম্বিকা চক্রবর্তী দেওয়ান বাজার সদর রাস্তার পশ্চিম দিকে বৃন্দাবন আখেরার কাছে একটি পুরাতন একতলা বাড়ীতে কংগ্রেস অফিস করেছিলেন। ১৯৩০শে তাঁদের কংগ্রেস অফিস আসকার খাঁর দিঘীর পশ্চিম পাড়ে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে এই দুই বিপ্লবী নেতা বিভিন্ন কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। সেখানে গ্রাম থেকে অন্যতম নেতা নির্মল সেন আসেন—শহরের নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ইত্যাদি গোপনে এসে পরামর্শ করেন। গোপন চিঠি নিয়ে গ্রাম শহর থেকে ছোট ছোট ছেলেরা আসে ঐ কংগ্রেস অফিসে।

বিপ্লবায়োজনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। কঠোর গোপনীয়তার জন্য যার যার নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছাড়া অন্য কিছু কেউ জানতে পারে না। এবং দলের নিয়মানুবর্তিতার জন্য কেউ জানবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে না। এই সময় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজ নিজ পরিবার থেকে অর্থ, অলঙ্কার ও লাইসেন্স করা বন্দুক চুরি করার কাজ বেশ উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে।

শ্রীপতি চৌধুরী রাউজানের এক জমিদারের পুত্র। বিপ্লবী দলে টাকা দিতে হবে, তাই সে এক নূতন কৌশল গ্রহণ করল। তাদের কক্সবাজার জমিদারী থেকে গোমস্তা প্রায়ই টাকা নিয়ে জাহাজে বিকালে ডবলমুরিং-এ বন্দরে এসে পৌঁছে। একদিন বিকালে জমিদার বাড়ীর ছেলে শ্রীপতি সাইকেল নিয়ে জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই টাকার থলি নিয়ে কর্মচারী গেটের বাইরে এসেছেন। শ্রীপতি তাঁকে গিয়ে বলে, গদিতে টাকার খুবই দরকার, তাই বাবা আমাকে সাইকেল নিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তাড়াতাড়ি আমি টাকাগুলি নিয়ে যাই। কর্মচারী ভদ্রলোক মনিবের ছেলেকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। টাকা নিয়ে শ্রীপতি আর নিজ বাসায় ফিরে যায় নি

এবং সেই টাকা বিপ্লবীদলের তহবিলে জমা হয়। সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বে এই শ্রীপতিকেই এইভাবে টাকা দেওয়ার ফলে পলাতক-জীবন কাটাতে হয়। শ্রীপতি ষ্টীমার ঘাট থেকে বাসায় ফিরে না যাওয়াতে অভিভাবকরা বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাদের সন্দেহ হয় যে, সে বিপ্লবী দলের হাতেই টাকাগুলি দিয়েছে। তাই তারা কংগ্রেস অফিসে এসে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীকে পেয়ে ঐ সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন এবং স্বভাবতই তাঁরা সে সম্পর্কে বিস্ময়ের ভাব দেখান। বৃন্দাবন আখেরার গরীব ব্রাহ্মণ--পূজকের পুত্র কালীপদ চক্রবর্তী। এনায়েত বাজার সংস্কৃত টোলের ছাত্র হলেও নিজের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবী দলে নিয়ে আসতে পারত বলে তার সুনাম ছিল। টাকা সবাইকে দিতে হবে, সে বাদ গেলে চলবে না। বাবা মৃত্যুকালে ডাকঘরের খাতায় ছয়শত টাকা রেখে গেছেন, কালীপদের জন্য। কিন্তু বড় ভাই অনুমতি না দিলে সে টাকা আইনতঃ নাবালক কালীপদের পক্ষে ডাকঘর থেকে তোলা সম্ভব নয়। কালীপদ তার দাদাকে বোঝাল, পুরানো ঘরে টিনের ছাউনী দেওয়া অত্যাবশ্যক এবং সেইজন্য টাকা তোলা দরকার। দাদা এই যুক্তি গ্রহণ করে টাকা তোলার অনুমতি দেন এবং এই অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—বালক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ ছয়শত টাকাই ডাকঘর থেকে তুলে নিয়ে এসে মাষ্টারদার হাতে হাসতে হাসতে তুলে দেয়। নিজের অতি প্রিয় স্নেহাস্পদ সহযাত্রীর হাত থেকে ঐ টাকাগুলি নিতে গিয়ে, মাষ্টারদা তার মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্য চেয়ে রইলেন।

লাল মোহন সেন* সন্দ্বীপের এক অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে—শহরে নর্মাল স্কুলে পড়ত। সে দেশে গিয়ে তার জেঠামশায়ের সিন্দুক ভেঙ্গে বেশ কিছু টাকা চুরি করে বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারে দান করে।

---

* চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ১ম মামলায় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল—এঁদের সঙ্গে লাল মোহন সেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আন্দামান থেকে ফিরবার পর ১৯৪৬–এ ঢাকা জেল থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে মুক্তি পাওয়ার পর লালমোহন নিজের বাড়ী সন্দ্বীপে যান। ১৯৪৬–এ কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার বহু গুজব সন্দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। লাল মোহন সেন যখন সন্দ্বীপে "শান্তি কমিটি" করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে রুখবার চেষ্টা করছিলেন তখন স্থানীয় কয়েকজন ধর্মান্ধ লোক তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জীবন ঘোষাল (ওরফে মাখন) সদরঘাটের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঘোষাল পরিবারের ছেলে। সে এক অসমসাহসিক কাজ করে। সে তার বাবার চেক বইতে বাবার নাম জাল করে চেকটি ভাঙ্গাবার জন্য তার বাবার ব্যাঙ্কে নিয়ে জমা দেয়।

অভিজ্ঞ ক্যাশিয়ার চেকখানা নিয়ে বলে যে, সেই স্বাক্ষর মাখনের বাবার নয়। তাই তিনি বলেন, মাখন যেন তার বাবার কাছে গিয়ে আর একটি সই চেকে নিয়ে আসে। মাখন ঐ অবিশ্বাসের লক্ষণ দেখে একটু রাগ প্রকাশ করে। ব্যাঙ্কের এক কর্মচারী মাখনের বাবাকে টেলিফোন করেন আর যেহেতু সে বিশেষ পরিচিত ব্যবসায়ীর ছেলে কিছুটা বিশ্বাস নিয়ে ক্যাশিয়ার টাকা গুণতে থাকেন। ইতিমধ্যে টেলিফোনে খবর আসে, ঐদিন তার বাবা কোন চেকই সই করেন নি। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে মাখন তা শুনতে পেয়ে, ছোঁ মেরে কয়েক ভাঁজ নোট নিয়ে সাইকেলে চড়ে উধাও হয়ে যায়। দলের দফতরে গিয়ে দেখে দু'হাজার টাকার জাল চেক ভাঙ্গাতে না পেরে সে যা নিয়ে এসেছে তাতে প্রায় ষোলশত টাকা হয়ে গেছে। বিকালে বাড়ীতে ফিরলে জালিয়াতির অপরাধে পিতা তার উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের সাহায্যে মাখন পিতার রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা পায়। মা বুঝতে পারেন, তাঁর এমন ভাল ছেলে দেশের কাজের জন্যই ঐ টাকা নিয়ে গেছে—তা সব মা-বাবার মত তিনি তাকে বলেন, টাকা নিয়েছিস বাবা, তোকে আরও টাকা আমি দেব, তবু তুই ওসব সর্বনাশা দল ছাড়। মাকে জড়িয়ে ধরে ছেলে জবাব দেয়, আমাদের পরাধীন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য আমাকে যে কাজ করতেই হবে।

হরিপদ মহাজন* খাতুনগঞ্জের বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ীর পুত্র। দলের জন্য টাকা আনার সে এক ভয়ানক উপায় গ্রহণ করে। দোকানের টাকার বাক্সের সামনে বসে আছেন, বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী। হরিপদ হঠাৎ তার বুকের সামনে এক রিভলভার ধরে বলে, দেশের কাজের জন্য টাকা নেব, যা বাক্সে আছে তা শীগ্গীর দিয়ে ফেলুন। মনিবের

---

* হরিপদ মহাজন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার পলাতক আসামী ছিল। পুলিশের হাতে কখনও সে ধরা পড়েনি। পলাতক অবস্থায় বার্মায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রকাশ।

পুত্রের এই দাবী আসছে শুধু তার মুখ থেকে নয়, ডান হাতে আঙ্গুল দিয়ে চক্‌চকে রিভলভারের নলটি বুকের কাছেই ধরা। নীরবে তিনি বাক্‌স থেকে সাড়ে সাতশত টাকা দেন এবং হরিপদ টাকাগুলি নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

সে ধনীর পুত্র অতএব এর চেয়েও বেশী টাকা না দিলে তার মান থাকে না। তখন সে আর এক উপায় স্থির করল। তার এক বিবাহিত বোন তাদের বাড়ী থেকে নৌকা করে শ্বশুর বাড়ী যাবে। হরিপদ বলল যে, বোনের সঙ্গে সেই যাবে। নির্দিষ্ট দিনে বোনকে নিয়ে হরিপদ নৌকায় যাত্রা করে। ধনীর কন্যা বোন, সারা গায়ে সোনার অলঙ্কারের প্রাচুর্য। নৌকা যখন তাদের বাড়ী ছেড়ে বহুদূরে এগিয়ে গেছে, হরিপদ বোনের কাছে বলে যে, দেশকে স্বাধীন করার কাজে সে যদি সব অলঙ্কারগুলি তাকে দিয়ে দেয় কত বড় কাজ হবে। আর তার জন্য তখন অলংকার আবার দেবে বাবা তৈরী করে। বোনটি তখন স্বেচ্ছায় তার সব সোনার অলঙ্কার খুলে ভাইয়ের হাতে দিয়ে ফেলে এবং তার দু' একদিনের মধ্যেই তা গিয়ে দলের অর্থভাণ্ডারে জমা হয়। অর্ধেন্দু দস্তিদার এক সরকারী কর্মচারীর ছেলে। তার বাবা অত্যন্ত কড়া লোক। তিনি খুব বেশী রাগী ছিলেন। লেখাপড়া ও নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তিনি অর্ধেন্দু ও তাঁর অন্যান্য ছেলেদের নিদারুণ প্রহার করতেন। অথচ দলের সব ছেলেই যখন কাজের জন্য টাকা দেবে, তখন যেমন করে হোক তাকেও দিতে হবে। তার মা দুপুরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর শাড়ীর আঁচলে বাঁধা টাকা পয়সার বাক্‌সের চাবি। তাঁর ঘুমন্ত অবস্থা থেকে অর্ধেন্দু চাবির গোছা আস্তে আস্তে খুলে নেয়। আগের দিন তার বাবা মাসিক বেতন দুই শত টাকা এনে ঐ বাক্সের ভিতরে এক তামার পাত্রে রেখেছেন। পরদিন সব মাসিক পাওনাদারেরা আসবে এবং তাদের সবারই পাওনা দিয়ে ফেলা হবে। আঁচল থেকে নেওয়া চাবি দিয়ে বাক্স খুলে অর্ধেন্দু ঐ দুই শত টাকা নিয়ে আবার তালাটি বন্ধ করে দেয় এবং মায়ের চাবি আবার মায়ের আঁচলে বেঁধে রাখে। ঐ টাকা ছিল পরিবারের সারা মাসের খরচ, কিন্তু সে সব কথা ভাবলে দেশের জন্য ত্যাগ করা হচ্ছে কোথায়, তাই ঐ টাকা দলের অর্থভাণ্ডারে অর্ধেন্দু দিয়ে আসে।

এখানে অর্ধেন্দুর কথা কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হবে। দলের কাজের জন্য অর্ধেন্দু মাঝে মাঝে বাড়ীতে ঠিক সময়ে ফিরে যেতে পারত না। প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাকে ফিরতে হত। অথচ পিতার কঠিন আদেশ গোধূলিতে বাড়ী ফিরতে হবে। তখন নানা কাজের মধ্য দিয়ে অর্ধেন্দু দলের এক দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে গড়ে উঠেছে। তাই পিতার কঠোর শাসন ও আদেশ সত্ত্বেও সে সন্ধ্যায় বাড়ী প্রায়ই ফিরতে পারে না। একদিন ঘটনা চরমে উঠল। সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে অর্ধেন্দু ফিরেছে। তার পিতা তাকে ডেকে নিয়ে বললেন, বার বার বলা সত্ত্বেও তুমি তোমার পিতার আদেশ অবহেলা করছ। আজ তোমাকে বলতেই হবে তোমাদের স্বদেশী দলের নেতার নির্দেশ কি পিতার আদেশের চেয়েও বড়, যার জন্য কিছুতেই তুমি আমার কথা শুনতে পারছ না।

অর্ধেন্দু খুবই বিনীতভাবে জবাব দেয়, পিতাকে শ্রদ্ধা করি, তাঁর আদেশ মানতেও চেষ্টা করি, কিন্তু মাষ্টারদার কথাও আমাকে মানতে হবে।

শুনে পিতৃত্বের অভিমান আহত হয়। অর্ধেন্দুর পিতা অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেন, যে ছেলে পিতার আদেশের চেয়েও অন্যের নির্দেশকে বড় মনে করে, তার আমি মুখ দেখতে চাই না--তুমি যদি বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার সকল আদেশ না মানতে পার তাহলে এখুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। অর্ধেন্দু আনত হয়ে পিতাকে প্রণাম করে বিদায় নেয়। মার কাছে বিদায় নিতে গেলে অশ্রুসজল চোখে স্নেহময়ী মা তাকে ধরে রাখতে চান কিন্তু অর্ধেন্দু সেদিনই গৃহত্যাগ করে। ২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ ইং জালালাবাদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত অভিমানী পুত্র কোন দিন পিতৃগৃহে পদার্পণ করে নি। সে গিয়ে মাষ্টারদা আর অম্বিকা চক্রবর্তী যেখানে থাকতেন, সেই কংগ্রেস অফিসে তাঁদের সঙ্গী হয় এবং কঠোর পিতার শাসনমুক্ত হয়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকে।

এই সময় দলের নির্দেশ অনুসারে কিছু লাইসেন্স করা বন্দুকও নিজ নিজ পরিবার থেকে চুরি করা হয়। তার মধ্যে রণধীর দাশগুপ্ত, হরিপদ মহাজন, ধীরেন দস্তিদার, রজত সেন, মাখন ঘোষাল, সুবোধ

রায়, মধু দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী দলের সদস্যরা বাড়ী থেকে বন্দুক আর গুলী চুরি করে দলের দফতরে দেয়।

বিভিন্ন পরিবার থেকে এই ভাবে টাকা, অলংকার ও বন্দুক চুরির কথা ক্রমে পুলিশের কানে যায়। কোন কোন অভিভাবক নিজেই থানায় এ সব চুরি সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তাই তখন চট্টগ্রাম পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ কিছুটা তৎপর হয়েছে। তা সত্ত্বেও গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ যুবক নেতারা পুরা সামরিক পোষাকে সারা সহর ঘুরে বেড়ায়, কখনও কখনও তাদের কোমরে লুকানো রিভলভারও থাকে। অনন্ত সিংহের বেবী অষ্টিনে ও অন্য ট্যাক্সী যোগাড় করে দলের তরুণ সদস্যদের মোটর চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। চট্টগ্রামে তখন ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন ছিল। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের কাছ থেকে বিপ্লবীরা কয়েকটি ঘোড়া ধার করে এনে স্বেচ্ছাসেবক দলের খাঁকী রং-এর খদ্দরের সামরিক পোষাকে যখন কিছু দিন ঘোড়ায় চড়া শিখে রাস্তায়ও মার্চ করত, তখন বিস্ময়বিমূঢ় নেত্রে চট্টগ্রাম শহরের মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে গর্ব ও গৌরবে উল্লসিত হয়ে উঠত—তাদেরই সন্তান এরা, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের পথে এরা এগিয়ে যাচ্ছে—নীরবে তারা তখন এদের প্রতি শুভ কামনা জানাত।

অন্যদিকে কাট্টলী সমুদ্রতীরে, করলডেঙ্গা পাহাড়ের গভীর বনে শেখানো হতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা। সমুদ্র পাড়ের বিস্তীর্ণ বেলা ভূমিতে প্রবল শব্দে এসে ভেঙ্গে পড়ছে ফেনশুভ্র উর্মিমালা। একদিকে সাগরের নীল অন্যদিকে আকাশের নীল চক্রবাল রেখায় মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতির এই অপরূপ মহিমার দিকে চোখ দুটি তুলে মুগ্ধ হবার সময় নেই। দেশ পরাধীন, দেশের চাষী, মজুর মধ্যবিত্ত, দেশের শোষিত, নিপীড়িত সকল মানুষকে মুক্ত করতে হবে। তাই আপাততঃ তোলা থাক সৌন্দর্যভোগ, ব্যক্তিগত সুখের প্রয়াস। প্রকৃতির এই মোহময় পরিবেশে শিক্ষা চলে রিভলভারের লক্ষ্যস্থির করার—যাতে শোষক ইংরেজের বুকে ঠিকমত গুলী গিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে। দেশ স্বাধীন হবার পরও যদি আমরা বেঁচে থাকি তখন প্রাণভরে আনন্দ করব, পাহাড়, সাগর, আকাশ দেখব—মলয় হিল্লোলে দেহ শীতল করব—তাই তার জন্য এখন সবকিছু, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দেব এই মনোভাব নিয়ে সব কাজ চলে বিপ্লবীদের।

বোমা তৈরীর কাজও চলতে থাকে গোপনে। অস্ত্রাগার দখল করার পূর্বে ও তারপরে চট্টগ্রামের সূর্যসেন দলের বিপ্লবীরা যে বোমা তৈরী করে, তা ১ম মহাযুদ্ধে জার্মেনদের ব্যবহৃত হাতবোমার ফরমূলার উপর নির্ভর করেই করা হত। বিস্ফোরক খুব সাবধানে তৈরী করার নিয়ম। তারপর ঐ বিস্ফোরক দিয়ে বোমার লোহার খোলগুলি (Shell) পূর্ণ করা হত। দক্ষিণেশ্বর মামলায় যে বিপ্লবীরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা একজন পাকা ঢালাইকরের সাহায্যে খুবই চমৎকার লোহার খোল তৈরী করেন। ১৯২৯ সালে কয়েক দফায় বেশ কিছু ঐ লোহার তৈরী খোল চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কলিকাতা থেকে এখানে নিয়ে আসেন। এই ব্যাপারে কলিকাতায় অধ্যয়নরতা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, কল্পনা দত্ত ও অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের ছাত্রীর সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের বাক্সে করেই ঐ বোমার খোল-গুলি নিরাপদে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের হাতে এসে পৌঁছে।

বিস্ফোরক প্রস্তুতের কাজে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের ছাত্রদেরই নিয়োগ করা হত। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তখন চট্টগ্রাম বি. এস.সি, এর ছাত্র। শহরের এক গোপন কেন্দ্রে বিস্ফোরক তৈরী করার সময় দুর্ঘটনায় রামকৃষ্ণ ভীষণভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীনেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি আহত রামকৃষ্ণকে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রামের যে বিশিষ্ট ডাক্তারকে ডাকা হয়, তাঁর সম্পর্কে আপাততঃ এইটুকু বলা যায় যে, তিনি নিজেও কটক মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের যে বিশিষ্ট শহীদ ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চে উঠেছিলেন; নাম-না-জানা যেই কবির গানের মধ্য দিয়ে তিনি আজও বাঙ্গালী দেশ-প্রেমিকদের কাছে অমর হয়ে আছেন, এই ডাক্তার তাঁর ছাত্রজীবনে ঐ ক্ষুদিরামের সঙ্গে একই দলে ছিলেন, তাঁর পরিবারের তিন চারিটি ছাত্র যে তখন বিপ্লবীদলের সভ্য (তাঁর নিজের ছেলেও) তাও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণকে দেখেই বুঝতে পারেন কিসে তার ঐ অবস্থা—তাই তিনি খুব যত্ন করে তার চিকিৎসা করেন।

পুলিশ এই ঘটনার বিষয় জানতে পারে এবং কয়েক জায়গায় এই ব্যাপারে খানাতল্লাসীও হয়। এক যায়গায় পুলিশ আসার কয়েক

মিনিট পূর্বেই অগ্নিদগ্ধ রামকৃষ্ণকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। পুলিশ গিয়ে তুলা ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পেয়ে ঘটনা বুঝতে পারলেও রামকৃষ্ণের কোন সন্ধান পায় না।

এর কিছুদিন পরে আসকর খাঁর দিঘীর পাড়ে এক বাসায় বিস্ফোরক তৈরীর সময় চট্টগ্রাম কলেজের বি. এস. সি. ক্লাসের আর একজন ছাত্র তারকেশ্বর দস্তিদার ও তরুণ বিপ্লবী অর্ধেন্দু দস্তিদার ভীষণভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। দু'জনেরই সারা শরীর পুড়ে যায় এবং তাদের জীবনের আশাই নষ্ট হয়। বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দে সারা পাড়া কেঁপে ওঠে। অনন্ত সিংহের নিজের বেবী অষ্টিন গাড়ী করে খুব তাড়াতাড়ি তাদের ওখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়। তার কিছু পরে সেখানে পুলিশ এসে হাজির হয়। তখন কংগ্রেস অপিস ঐ বাড়ীতেই চলছিল। কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্য সেন ও বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন ওখানে ছিলেন। পুলিশ আসার পূর্বেই তাঁরা ওখানে উপস্থিত আরও কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে সন্দেহজনক সব জিনিষ দূর করে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘর পরিষ্কার করে বসে আছেন। পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা করে, এত বড় আওয়াজ কিসে হল। নির্বিকারভাবে তাঁরা জবাব দেন, কৈ, কিসের আওয়াজ আমরা ত জানি না। পুলিশ কংগ্রেস অপিসে ঢুকে সব দেখে শুনে চলে যায়।

বিস্ফোরণের পরে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ এঁরা যখন খবর পেয়ে কংগ্রেস অপিসে এসেছিলেন তখনকার একটি ঘটনা স্মরণীয়। বিস্ফোরণে নিদারুণভাবে দগ্ধ হয়ে তারকেশ্বর আর অর্ধেন্দু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র নরেশ রায় তখন প্রাথমিক চিকিৎসা দ্বারা আহতদের যথাসম্ভব সেবা করার চেষ্টা করছে। যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তারকেশ্বর চীৎকার করে বলছে, আর পারিনা, আপনারা আমায় শেষ করে দিন, মেরে ফেলুন আমাকে, আর ত সহ্য হয় না, আমায় গুলী করুন।

বিপ্লবী নেতারা সবাই নীরব, তখনও রামকৃষ্ণের জন্যে পুলিশ সারা শহর তোলপাড় করছে। অনন্ত সিংহ ভাবছিলেন, এমন আহতদের কি বাঁচানো যাবে? প্রিয়তম সহযাত্রী এই তরুণকে তার শান্তির জন্যই,

বিপ্লবীদলের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যই পরম অপ্রিয় কর্তব্য পালন করাই শ্রেয়। তাই তিনি কোমর থেকে তাঁর রিভলভারটি বের করেন। সঙ্গে সঙ্গে গণেশ ঘোষ তাঁর হাত চেপে ধরেন। সূর্য সেন বলেন, অনন্ত তাকে বাঁচাও। প্রধান নেতার এই আদেশের মধ্য দিয়ে যে দরদ, সাথীকে ফিরে পাওয়ার যে কামনা প্রকাশিত হয় তার ফলে অবিলম্বে জীবন্মৃত এই দু'টি বিপ্লবীকে নিজের গাড়ীতে পুলিশ আসার আগেই তুলে নিয়ে গণেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ চলে যান।

দিনের বেলা তাদের কোথাও নামানো সম্ভব হবে না বলে সারাদিন এই মুমূর্ষু বিপ্লবীদের নিয়ে "বেবী অষ্টিন" ঘোরে। সন্ধ্যার পর ডাক্তারের ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। শহর তখন রামকৃষ্ণের ব্যাপারেই নিরাপদ নয়, তাই বেশী টাকা দিয়ে নৌকা ভাড়া করে অর্ধেন্দু ও তারকেশ্বরকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে ডাক্তার রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করছিলেন, তিনিই এদের চিকিৎসার ভার নেন। তখন এমন সব রোগীর চিকিৎসা করার যে সমূহ বিপদ তা জেনে শুনে যেই ডাক্তার এই গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁর দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তিনি আজ ইহলোকে নেই। সেদিনকার বিপ্লবীরা তাঁর মত আরও কয়েকজন ডাক্তারের সাহায্য পেয়েছিলেন কিন্তু এই ডাক্তার তখন ছিলেন জিলা কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং চিকিৎসক হিসাবেও স্বনামধন্য। ভাল চিকিৎসক বলে বড় বড় পুলিশ কর্মচারীদের গৃহ-চিকিৎসকও তিনি ছিলেন এবং তাঁর সেইসব রোগীদের কাছ থেকে তিনি এমন কথা শুনতেন যা দিয়ে তিনি বিপ্লবীদের অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁর নাম ডাক্তার অক্ষয় দস্তিদার।

পর পর দু'টি দুর্ঘটনার ফলে শহরে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে যায়। বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের উপর গোয়েন্দা পুলিশের পাহারা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। তখন বিপ্লবীদলও নিজেদের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ তৈরী করে। এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই বেতনধারী পুলিশের গোয়েন্দার চেয়ে দেশহিতব্রতী বিপ্লবীদের অবৈতনিক গোয়েন্দারা বেশী সফল হতে লাগল। এবং পুলিশের কঠোর পাহারা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের কাজ সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগল।

বিপ্লবীরা সারা ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের কথা অনেকবার চিন্তা করেছিল। শেষ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের মধ্যে আলাপ আলোচনার মারফত যদি কোন কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা অন্ততঃ একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেশের পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সূর্য সেন যখন রাজবন্দী হিসাবে রত্নগিরি (বোম্বাই) জেলে আটক ছিলেন, তখন থেকে এই চিন্তাধারা তাঁর ছিল। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সূর্য সেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ নেতারা বহুবার চেষ্টা করেছিলেন। এককভাবে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদল সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যে আয়োজন করছিল, তার মধ্যেও শেষবারের মত আরেকবার বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সঙ্গে উপরোক্ত তিন প্রধান নেতা এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। অবশ্য সব আলোচনাই "যুগান্তর" দলের নেতাদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং চট্টগ্রাম দলের আয়োজনের অগ্রগতির সকল সংবাদ তাঁদের কাছেও গোপন রাখা হয়।

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে "স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে প্রতিপালন করা হয়। সারা ভারতের বিভিন্নস্থানে এই দিন কংগ্রেস রচিত "স্বাধীনতা দিবসের" সঙ্কল্প পাঠ করা হয় এবং বৃটিশ শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে অগণিত ভারতবাসী গ্রহণ করে। চট্টগ্রামেও কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্য সেন "স্বাধীনতা দিবসে" কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য কর্মসূচী পালনের ব্যবস্থা করেন। এই তারিখে বৃটিশ সরকার সারা ভারতে স্বাধীনতা সঙ্কল্প পাঠরত অগণিত নিরস্ত্র মানুষের উপর বহু নির্যাতন নিপীড়ন চালায়।

বৃটিশ সরকারকে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হুমকি দিয়েছেন, যদি কংগ্রেসের দাবী অনুসারে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী তারা মেনে না নেয়, তাহলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। নয় বৎসর পূর্বে যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ও নির্দেশে শুরু হয়েছিল, ভারতের অন্যতম প্রধান জাতীয় গণ-আন্দোলন হিসাবে তার ঐতিহাসিক মূল্য বিচার এখন করা যায়। কিন্তু

সে আন্দোলন যখন বিহারের চৌরিচোরায় কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত বহন করে আনে, তখন গান্ধীজী নিজেই সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী নয় বৎসরে সারা ভারতে মজুর ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন আন্দোলন এবং ছাত্র ও জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির ফলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অহিংস অসহযোগের নেতিবাচক আন্দোলনের পরিবর্তে আরও অগ্রসর এবং সেইজন্যই প্রত্যক্ষ "আইন অমান্য আন্দোলনের" আওয়াজ ওঠে। ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতির লক্ষণ হিসাবে এই ১৯৩০-এর সরকারী আইন অমান্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব স্বীকার্য।

তবে সব আইন নয়, কেবল লবণ আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্তই গান্ধীজী করেন। যদিও ভারতবর্ষ তিন দিক থেকে লবণ-সমুদ্র বেষ্টিত তবু বৃটিশ লবণ ব্যবসায়ীদের লবণ আমাদের বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা করার জন্য ইংরেজরা লবণ তৈরী নিষিদ্ধ করে আইন করেছিল। লবণ ছাড়া একটি রুটি, 'এক মুঠো ভাত' আমরা খেতে পারব না। আর আমাদের উপকূলে অনন্ত বিস্তার লবণাক্ত সমুদ্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা ইচ্ছামত লবণ তৈরী করতে পারব না, এই আইন আমাদের ভাঙ্গতে হবে—এই ধ্বনি খুবই জনপ্রিয় হবে গান্ধীজী তা বুঝতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি তাঁর সবরমতী আশ্রমের ৭৮ জন সহকর্মীকে নিয়ে বোম্বাই এর সমুদ্র উপকূলবর্তী দাণ্ডি-র দিকে লবণ আইন অমান্য করার জন্য যাত্রা করেন। ৬ই এপ্রিল তিনি সদলবলে সেখানে পোঁছে সারা দেশের জনসাধারণের কাছে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করেন:—

"ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মধারা স্থির হয়ে গেছে। প্রতি গ্রামে নিষিদ্ধ লবণ তৈরী ও আমদানী শুরু করা হোক। মদের দোকান, আফিমের দোকান ও বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে বোনেরা দল বেঁধে পিকেটিং করবেন। বৃদ্ধ ও অপ্রাপ্তবয়স্করা ঘরে বসে সূতা কাটবেন। বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হিন্দু-মুসলমান-শিখ-

পারসী সকলের হৃদয়ে ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। সংখ্যা লঘুদের সন্তুষ্টি বিধানের পর যা থাকে, তাই নিয়ে সংখ্যাগুরুদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ছাত্রগণ সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন করুন, সরকারী চাকুরেরা চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আমরা শিগগিরই দেখতে পাব পূর্ণ স্বরাজ আমাদের দ্বারে সমাগত।' সারা ভারতে তখন বিরাট চাঞ্চল্য। স্বাধীনতার সংগ্রামে এবার শত্রুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যেতে হবে—আত্মদানের উন্মাদনা তখন ছড়িয়ে গেছে আকাশে বতাসে।

এই অবস্থায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা গোপনে আয়োজন করছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের। তাঁরা যখন বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক সঙ্গে চাঞ্চল্যকর অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বোক্ত নেতাদের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁদের অনেকের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব পড়েছে। কেউ কংগ্রেসের বড় নেতাও হয়েছেন এবং সুভাষ চন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনকে সমর্থন করা, এক পক্ষ অন্য পক্ষের আয়োজিত জনসভা ভাঙ্গা, কোন জেলা কংগ্রেস একে অপরের কাছ থেকে ভোটে বা লাঠির জোরে দখল করা ইত্যাদি ছাড়া আর কোন বৈপ্লবিক কাজ করেন না। কেউ খোলাখুলি বললেন এখন অন্য কিছু করে লাভ নেই, এই আইন অমান্য আন্দোলনেই বিপ্লবীদের কাজ করা উচিত। একজন বড় নেতা বললেন, বিপ্লব আমাদের করতে হবে ঠিকই, কিন্তু গান্ধীজীকে একবার সুযোগ দেওয়া যাক। অন্য একজন বললেন, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময় ও অবস্থা আসেনি, এখন ওসব না করে' আইন অমান্য আমরা করি—কেবল লবণ আইন ভঙ্গ নয়, অন্য আইনও আমরা ভঙ্গ করব, তারপরে ক্রমে ক্রমে বৈপ্লবিক অবস্থার স্থষ্টি হবে, তখনই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময়।

মোট কথা চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব অন্য কোন জেলার বা কলিকাতার বিপ্লবী নেতাদের তাঁদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার নীতিতে সামিল করতে পারলেন না।

নিজেরা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, আর কেউ যদি তাঁদের সঙ্গে যোগ না দেয়, চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই জেলার

সদরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে এবং এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত সময় হ'ল আইন অমান্য আন্দোলনের চাঞ্চল্য, যখন ইংরেজ সরকারও থাকবে খুব বিব্রত আর জনসাধারণও দেশপ্রেমের অভিব্যক্তিতে সঞ্জীবিত।

তা ছাড়া এই কথাও আলোচনায় ওঠে, শুধুমাত্র একটি জেলায় এই অভ্যুত্থান করলে, প্রচুর ক্ষমতাশালী বৃটিশ সরকার অতি সহজেই বিপ্লবীদের দমন করতে পারবে এবং তাতে রাজনৈতিক লাভ বিশেষ কি আর হবে? স্বাধীনতা যদি সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারাই আনতে হয়, তার জন্য সংগঠন, আত্মদানের ইচ্ছা ও সাহস—এ সব দরকার। অন্য জেলায় বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলাপে দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয়তা এসে গেছে যে তাঁদের নিজ নিজ বিপ্লবী দলগুলিকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী করার কাজকেই তাঁরা অবহেলা করছেন, সেদিকে তাঁদের কোন লক্ষ্যই নেই। বিপ্লবী আন্দোলনের উৎপত্তিস্থান বাংলাদেশেরই যখন এই অবস্থা, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিই বা আশা করা যায়?

যদি চট্টগ্রাম জেলায় আগে থেকে সুপরিকল্পিত উপায়ে এমন কোন সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান করা যায়, যার ফলে অল্পদিনের জন্য হলেও এই জেলাকে যদি বৃটিশ শাসনমুক্ত করা সম্ভব হয়, যদি এই কাজ সফল করতে গিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সংগ্রামের মুখে আপন প্রাণ হেলায় বিলিয়ে দিতে পারে--তাহলে একটি বিরাট প্রেরণা ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে, লুপ্ত শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, বেদনাদায়ক নিষ্ক্রিয়তা দূর হবে। ভারতে মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে, নিজেদের প্রাণ দিয়ে শত্রুর সঙ্গে সংঘবদ্ধ সংঘর্ষ ও শক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ দ্বারা স্বল্প কালের জন্যও যদি জয়লাভ হয়, তার ফলে শেষ জয়ের পথে, বৃটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মুক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফলতার পথে এগিয়ে যাবার নব প্রেরণায় দেশ উদ্বুদ্ধ হবে, অন্য বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠবে—এই ছিল চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার দখল ও অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন প্রমুখ প্রধান বিপ্লবী নেতারা কখনও ভাবেননি যে, নিজেদের শক্তি বলে চট্টগ্রামকে বৃটিশ কবলমুক্ত করার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা

হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার কঠোর সংগ্রামে বিরাট একধাপ এগিয়ে যাবার জন্যই সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সুপরিকল্পিত এই আয়োজন করেছিল।

সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন তখন শুরু হয়ে গেছে। জিলা কংগ্রেসের নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হ'লেও চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাস ও তাঁদের সহকর্মীরা লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করে,' সমুদ্রতীরে গিয়ে লবণ তৈরী করবেন স্থির হয়েছে। গোপনে যদিও অতি দ্রুতগতিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সব আয়োজন চলছে, তবু প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে সূর্য সেনের পক্ষেও ঐ ব্যাপারে কোন কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর আসন্ন অভ্যুত্থানের ব্যাপারে পুলিশকে বিভ্রান্ত করাও দরকার।

তাই ১৯৩০-এর ১৬ই এপ্রিল যখন মহিমচন্দ্র দাসের সমর্থক কংগ্রেস-কর্মীরা (এদের সঙ্গে এই জেলার "অনুশীলন" দলের সদস্যরাও ছিলেন) কুমিরা সমুদ্রতীরে লবণ তৈরী করতে গেলেন, তখন কংগ্রেস সেক্রেটারী হিসাবে সূর্য সেনও একটি ইস্তাহার প্রচার করলেন:

"দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। সর্বত্র আইন অমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরোভাগে আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে—ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। এই জেলার লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য এক সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি কি করে তাহা দেখিবার জন্য আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিব। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবণ আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমন রাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরাও ২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি। ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই। লোক ও টাকা চাই।

শ্রীসূর্য সেন
সম্পাদক
চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি

এই ইস্তাহার প্রকাশ হওয়ার পরে স্বভাবতঃই পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ কিছুটা আশ্বস্ত হয় যে, এই সব বিপ্লবীরা বিশেষ কোন বড় গোলমাল করবে না। তাই তাদের পক্ষ থেকে আগে থেকে যে নিয়মিত গোপন পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাই মামুলীভাবে চলতে লাগল আর বিপ্লবীরাও দিন দিন তাদের চরম সংঘর্ষের ক্ষণটির জন্যে সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করল।

আট

আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যায় যখন ভারতের মুক্তিকামী জনসাধারণ পুলিশের লাঠি ও জেল জুলুমের সামনে সাহস ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন সীমান্তবর্তী এই জেলার মুষ্টিমেয় কয়েকটি যুবক ও ছাত্র তাদের অদম্য সাহস, অম্লান দেশপ্রেম ও চরম আত্মদানের জন্য অটুট সংকল্প নিয়ে বৃটিশ সরকারকে একটি কঠোর আঘাতের সিদ্ধান্ত করল। প্রধান নেতা সূর্য সেন খুব সাবধানে নির্বাচিত বিপ্লবী তরুণদের নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত করেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত তাঁর প্রিয় সহকর্মী নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ইত্যাদির সঙ্গে গভীর পরামর্শের পরেই গৃহীত হয়।

কার্যক্রম সম্পর্কেও পরে বিস্তারিত আলোচনার পর স্থির হয় যে, শহর, বিভিন্ন গ্রাম এবং দূর কক্সবাজার থেকেও বিপ্লবী সহকর্মীদের নেওয়া হবে। তবে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কোন আভাস নিবাচিত বিপ্লবীদের আগে দেওয়া হয় না। বিভিন্ন ব্যায়ামাগার ও গ্রাম্য-সংগঠনের মধ্যে যারা বিশ্বস্ত, আদর্শনিষ্ঠ ও সাহসী, তাদের নিয়ে বহু আলোচনার পর একটি তালিকা তৈরী করা হয়। এই তালিকাকে তাঁরা সামরিক ভাষায় "মবিলিজেশন লিষ্ট" (সৈন্যদের তালিকা) নাম দেন।

ইতিপূর্বেও দেশীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মচারী এবং দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের তৎপরতাকে উপেক্ষা করে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অংশে যেসব কাজ বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার মধ্যে ডাকাতি, ইংরেজ কর্মচারী হত্যা, সরকারী কর্মচারীদের রিভলভার বা পিস্তল চুরি ইত্যাদি ছিল প্রধান। বে-আইনী বই বিক্রয়, প্রচার ও ক্রয়, গোপন ইস্তাহার প্রচার ইত্যাদিও তাদের কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত থাকত। ১৭৫৭-তে পলাশীর প্রাঙ্গনে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর ওহাবী আন্দোলনের নেতারা, বিশেষ করে তীতুমীর (১৭৮০—১৮১৩)

বাঁশের কেল্লা তৈরী করে বৃটিশের হাত থেকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে গিয়ে নিজের অমর-প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন, কিন্তু তখনও বৃটিশ সরকারই জয়ী হয়। তারপর ১৮৫৭-এর সিপাহীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানও শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্যদের কাছে পরাহত হয়। বিপ্লবী আন্দোলনে ১৯৩০-এর পূর্বে দুইটি সম্মুখযুদ্ধ হয়। একটি হয় বালেশ্বরের বালুচরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে। বালির মধ্যে পরিখা খনন করে বিপ্লবী বীর যতীন মুখার্জী সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেন কিন্তু বৃটিশ সৈন্য পরাজিত হয় না। তারপর ১৯২৩শে রেলওয়ে ডাকাতির পরে নাগরখানা পাহাড়ে যে খণ্ডযুদ্ধ বিপ্লবী নেতারা করেন তার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। তাতেও বিপ্লবীদের পরাজয় বরণ করতে হয়।

১৯৩০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও তার কয়েকদিনের মধ্যে জালালাবাদ পাহাড়ে কয়েকশত নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের যে সম্মুখযুদ্ধ হয়, তাতেই বৃটিশ শাসনের প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে সাময়িকভাবে হলেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তারা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই দেশের মানুষের কাছে পরাজয় বরণ করে এবং পলায়ন করে। এই দিক থেকে চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা সূর্যসেনের নেতৃত্বে যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। চট্টগ্রাম স্বাধীন করার পর ইংরেজের পদাতিক, গোলন্দাজ বা বিমান বাহিনী এসে বিপ্লবী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করবে তা বিপ্লবী নেতারা ঠিকই জানতেন। কিন্তু ঐ সাময়িক জয় দ্বারা বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে গণ অভ্যুত্থানের দ্বারা মুক্ত হবার জন্য শেষ আঘাত হানার যে প্রেরণা জাগাবে, স্থায়ী জয়লাভের দিকে যে সবল পদক্ষেপ হবে, এই সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই বিপ্লবী নেতৃত্ব সমস্ত পরিকল্পনা করেছিল। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস এই সব শহীদের নাম বুকে নিয়ে ধন্য হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বহু আলোচনা ও চিন্তার পর যে কার্যক্রম স্থির করলেন, তা ইতিপূর্বে কেউ কল্পনাও করেনি। এই বিষয়ে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির নেতা মাইকেল কলিন্স, ডি-ভ্যালেরা ইত্যাদির সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনা তাঁদের রচিত পুস্তকাদিতে এই জেলার বিপ্লবী নেতারা পড়তেন এবং বিশিষ্ট সহকর্মীদের পড়াতেন। তাঁরা আয়ারল্যাণ্ডের ঐ পার্টির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে, নিজেদের

দলের নাম এই অভ্যুত্থানের পূর্বে পরিবর্তন করে রাখেন, "ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি—চট্টগ্রাম শাখা"। আর আইরিশ বিপ্লবীরা যেমন "ইষ্টার রাইজিং" (ইষ্টার-কালীন অভ্যুত্থান) শুরু করেছিলেন "গুড ফ্রাইডের" দিন, এই চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলও ঠিক "গুড ফ্রাইডে" দিনই তাঁদের অভ্যুত্থানের তারিখ স্থির করেছিলেন।

আলোচনায় স্থির হয়েছিল, অভ্যুত্থানের আগে জনসাধারণের কাছে প্রচুর ইস্তাহার ছাড়া হবে। শাসকরা ইংরেজ বলেই সম্ভবতঃ ইংরেজীতেই ইস্তাহার ছাপা হয়েছিল। কলিকাতায় চট্টগ্রাম দলের এক গোপন ঘাঁটি ছিল কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে তখনকার দিনের কলিকাতা হোটেলের নীচের তলায়। অবশ্য বাইরে থেকে এই ঘাঁটির রূপ ছিল, কাপড় কাচার দোকান, "আমেরিকান লণ্ড্রী"। অন্যান্য দোকানের মত এই দোকানেও স্বাভাবিক ব্যবসা চলত। যতদূর মনে হয়, চট্টগ্রামের নিতান্ত স্বল্পভাষী অন্যতম প্রধান নেতা নির্মল সেনই ঐ দোকান তথা আস্তানা করার জন্য প্রধানতঃ নিজ পরিবার থেকে টাকা এনে দিয়েছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এই দোকান বিক্রী করে দিয়ে, সেই টাকা দিয়ে নির্মল সেন কলিকাতা থেকে দলের জন্য একখানা "হ্যাণ্ড-প্রেস" (হস্তচালিত ছাপাখানা) কিনে নিয়ে আসেন। এই ছাপাখানা থেকেই বিপ্লবীদলের ইস্তাহার ছাপা হয়।

বিপ্লবীদলের কার্যসূচী স্থির হয়:

(১) টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করতে হবে সবার আগে। কারণ সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ধ্বংস না করলে চলবে না। তার পরবর্তী কাজগুলির কোন খবর কোথাও যখন শত্রুরা দিতে পারবে না, তখন সহজেই তাদের কাবু করা যাবে।

(২) তারপর পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখল। এখানে সরকারী ও রেলওয়ের রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল, মেশিনগান, লুইস-গান ও সমস্ত অস্ত্রের উপযোগী বহু গুলী জমা ছিল।

(৩) ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। এই ক্লাবের নাম বর্তমানে "চট্টগ্রাম ক্লাব"। এখানে তখন শুধু ইউরোপীয় নরনারীরাই

যেতে পারত। এই ক্লাব আক্রমণ দ্বারা অনেক ইংরেজকে এক সঙ্গে হত্যা করা সম্ভব হবে বলে এটা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করা হয়।

(৪) উপরোক্ত কাজগুলি সফলভাবে করার পর সংগৃহীত অস্ত্র ও পূর্বে সংগৃহীত অস্ত্রের সাহায্যে জেলার রিজার্ভ পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ—প্রয়োজন হলে সম্মুখ সমর, এবং ওদের পরাজিত করে সেখানকার ছোট অস্ত্রাগার থেকে রাইফেল, রিভলভার ইত্যাদি সংগ্রহ।

(৫) এই কাজ সফলভাবে করতে পারলে পরে চট্টগ্রাম শহরকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা এবং প্রধান নেতা সূর্য সেনকে এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি পদে বরণ করা।

(৬) চট্টগ্রাম থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে রেললাইন তুলে দেওয়া—যাতে সামরিক বাহিনী সহজে এসে না পৌঁছতে পারে।

(৭) এই কাজগুলি সফল হলে, এই সাফল্যকে স্মরণীয় ও জনপ্রিয় করার জন্য চট্টগ্রাম জেলের সব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া, শহরের বন্দুকের দোকানগুলি লুট করা, সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লুট করা এবং ঐ অর্থ বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করা।

(৮) চট্টগ্রাম শহর দখল করে, কাছারী পাহাড়ে বিপ্লবীদের (ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি—চট্টগ্রাম শাখা) পতাকা উত্তোলন করা ও জেলায় প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, এবং ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য বড় সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে সভাপতি সূর্য সেনের কাছে কোর্ট পাহাড়ে প্রকাশ্য বিচার করা।

এই সব কাজের পরে প্রধান নেতা সূর্য সেনকে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক চট্টগ্রামের সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত করারও এক অলিখিত পরিকল্পনা তাঁর অনুবর্তীদের ছিল।

এই কার্যসূচী গ্রহণের পরে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে সব কাজ দরকার তা অতি দ্রুততা ও সতর্কতার সঙ্গে করার ব্যবস্থা হয়। কিছু খাকী পোষাক, বিশেষতঃ নেতাদের জন্য, গুর্খা ভোজালী, জলের বোতল (ওয়াটার কেরিয়ার) ইত্যাদি অনেক যোগাড় করা হয়। জেলের সব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নানা কৌশলে জেলের প্রধান ফটকের তালার বিকল্প চাবি তৈরী করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ও নিজ নিজ পরিবার থেকে চুরি করা বন্দুক ও সংগৃহীত অন্য সব জিনিস শহরের বিভিন্ন গোপন ঘাঁটিতে ভাগ ভাগ করে রাখা হয়, যাতে পুলিশের তরফ থেকে কোন বিপদ যদি আসে সব যেন একসঙ্গে ধরা না পড়ে। এইভাবে আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চরম ক্ষণটির জন্য এই মুক্তিকামী সাহসী বীরদের মানসিক প্রস্তুতিও চলতে থাকে। দেশের মুক্তির জন্য নিজের অমূল্য প্রাণ আর অল্পদিনের মধ্যেই উৎসর্গ করতে হবে, নিজের পিতা মাতা ভাই বোন, পরম প্রিয়জনকে চিরতরে ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দ্য ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন, সব কিছু ফেলে রেখে, সমষ্টির জন্য, গোটা দেশের মানুষের সুখ, শান্তি ও মুক্তির জন্য নিজকে বিলিয়ে দেব, এই উন্মাদনা তখন বিপ্লবীদের মনকে চঞ্চল করে রেখেছে।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০—এই দিন চট্টগ্রামের বুকে যে আগুন জ্বলছিল তার আভা ছড়িয়ে গিয়েছিল সারা ভারতের মুক্তিকামীদের মনে, সেই দেশপ্রেমের রঙ্গীন আভা আজও দেশপ্রেমিকদের মনকে প্রেরণার আলোকে উদ্ভাসিত করে। এই দিন রাত সাড়ে দশটায় বিপ্লবীদের পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু হবে স্থির হয়। অভ্যুত্থানের পূর্বে নীচের তিনটি ইস্তাহার জনসাধারণের কাছে বিলি করার সিদ্ধান্ত হয়:

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী
(ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি)

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, যুগ যুগ ধরিয়া যে বৃটিশ এবং তাহার সরকার ভারতের ত্রিশ কোটি জনসাধারণকে তাদের হিংস্র শোষণ নীতি দ্বারা নিপীড়িত করিয়াছে, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সামান্যতম উন্মেষকেও নির্মূল করিতে ও জাতি হিসাবে তাহাদের বৈশিষ্ট্য যাহাতে স্বীকৃত না হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ঘোষিত হইল।

ভারতবর্ষের জনসাধারণই ভারতের প্রকৃত অধিকারী। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের মূল দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের উপর। একটি বিদেশী সরকার ও বিদেশীয়দের দ্বারা জনসাধারণের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। অ.জ ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী অস্ত্রের মুখে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিতেছে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে, তাহাকে বাস্তবে এইরূপেই রূপায়িত করা হইবে। এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, কল্যাণের জন্য এবং উহার সঙ্গে অন্যান্য জাতির জন্য নিজকে উৎসর্গ করিবে। বৃটিশ সরকার যেভাবে ভারতের জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছে, বন্দুকের গুলীর মুখে নারীজাতিকে পর্যন্ত উড়াইয়া দিয়াছে, বহু দেশবাসীকে ফাঁসীতে ও অন্যান্যভাবে খুন করিয়াছে, নিষ্ঠুর বৃটিশ বুটের তলায় শিশুদেরও পিষ্ট করিয়াছে, ভারতের ব্যবসা ও শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতেছে—তীব্র ঘৃণার সহিত তাহা আজ আমরা স্মরণ করি এবং দেশবাসীর রক্ত শোষণের চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ ঘোষণা করিতেছি।

জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর এই শাখা জনসাধারণের নিকট পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করিতেছে এবং এই আশা প্রকাশ করিতেছে যে, কর্তব্যে অবহেলা, কাপুরুষতা বা অমানুষিকতা

দ্বারা কখনও জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানের অবমাননা কেহ করিবেন না। আজিকার এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামের জনসাধারণকে তাঁহাদের সাহস ও দেশপ্রেম লইয়া পরম আত্মদানের জন্য এমনভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে যাহাতে এই পবিত্র দায়িত্বের জন্য তাঁহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারেন।

আদেশক্রমে

প্রেসিডেণ্ট

সপারিষদ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

চট্টগ্রাম শাখা।

চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ঃ

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

বৃটিশের জনসাধারণ ও তাহাদের সরকারের নিষ্ঠুর জোয়াল ও অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী এক প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বিগত দুইশত বৎসরের অত্যাচারের রাজত্বে ভারতীয়রা-যখনই স্বাধীনতার যে কোন প্রচেষ্টা করিয়াছে, তখনই বৃটিশরা তাহা নির্মম হস্তে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এইবারও তাহারা তাহাদের রক্তক্ষয়ী নিপীড়ন ও নির্যাতনে অন্যায় শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না।

আসুন ভাইসব, এই অবস্থার অবসানের জন্য আগাইয়া আসুন, পরাধীনতার বেদনা অন্তরে অনুভব করুন। দেশকে শোষণের ফলে কি রকম অধঃপতনের পর্যায়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করুন—জার্মেনী, রাশিয়া আর চীনের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় কেমন ভাবে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখুন। আপনাদের অন্তরে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালান। দলে দলে আপনারা ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সদস্যভুক্ত হউন। আমাদের মাতৃভূমিকে ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করুন--স্বাধীনতার সৈনিকদলে আসুন।

আদেশক্রমে

প্রেসিডেণ্ট

সপারিষদ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

এই ইস্তাহারের বক্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বিপ্লবীরা প্রাথমিক জয়ের পরে অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহরের সরকারী সকল ক্ষমতাকে অস্ত্রের জোরে পর্যুদস্ত করার পরে, যখন অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করে সরকারী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে লড়তে আসবে, সেই সময়ে ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী যাতে সাহসী ও শক্তিশালী যুবক ও ছাত্রদের সক্রিয় সাহায্য পায়, সে জন্যই উপরোক্ত ইস্তাহার তাদের জন্য ছাড়া হবে।

চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতিও একটি ইস্তাহার দেওয়া হয়:

চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতি

এতদ্বারা ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুকে এই আদেশ ও নির্দেশ দিতেছে যে, আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার বিরোধী সমস্ত ইংরেজ ও শ্বেতচর্ম ইঙ্গ-ভারতীয়কে অবিলম্বে জীবিত ও মৃত অবস্থায় ধৃত করিয়া প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সদর দফতরে হাজির করিতে হইবে। ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী ঘোষণা করিতেছে, ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে যাহারা ধরিয়া আনিবে তাহাদের যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেণ্ট
সপারিষদ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

আসন্ন অভ্যুত্থানের আভাসে বিপ্লবী কিশোর আর তরুণদের প্রাণে লেগেছে মরণের দোলা। প্রধান নেতৃত্ব কি কি কার্যক্রম স্থির করেছেন, তার জন্য কার কার নাম নির্বাচিত তালিকায় আছে, অভ্যুত্থানের আগে তা কেউ জানত না। নামগুলি ঐদিন সকালে ও তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা নির্বাচিত বিপ্লবীদের একে একে জানিয়ে দেওয়া হয়। তখন আসে জীবনের এক চরমক্ষণ। নিজ নিজ প্রিয়জন, পিতামাতা, ভাইবোন ইত্যাদির স্নেহ-মমতার পরম বন্ধন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছিঁড়ে যেতে হবে। এই অভ্যুত্থানের পরে এই সুন্দর ধরণীর আলো, বাতাস, প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য আর তাদের সামনে প্রতিভাত হবে না। জীবনকোরক অনেকের প্রস্ফুটিত হয়নি, তবু কত রঙ্গীন আশা তাদের—কাল রাত্রে সব শেষ

হয়ে যাবে, আর আমি আমার মায়ের স্নেহ, বোনের দরদ পাব না, জীবনের ভবিষ্যৎ সব সুখের কল্পনাকে কাল নিঃশেষ করে দেব। আমাদের দেশের মানুষের জন্য, তাদের মুক্তির জন্য, বৃটিশকে এদেশ থেকে দূর করে দেবার জন্য ক্ষুদিরাম, কানাইলালের মত মরব। মরতে আমাকে হবে। নির্বাচিত বিপ্লবীরা নিজ নিজ বাড়ীতে মায়ের কাছে অযথা আব্দার করে, বিভিন্ন প্রিয় জিনিষ খাওয়ার কথা বলে। ছেলের, ভাইয়ের এ চাঞ্চল্য অনেক মা বোনের কাছে ধরা পড়ে যায়, কিন্তু কোন আভাসে, কেউ বুঝতে পারে না যে নিজেদের প্রিয় এই মানুষটি আর কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরতে চলছে—স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চলেছে। যে ছেলে, যে যুবক ছিল অগণিত জন-সমুদ্রে অজানা-অচেনা সামান্য একটি মাত্র তরঙ্গ, ঐ রাত্রির সংঘর্ষে আর তার পরবর্তী কর্মপ্রবাহে, সে কুলপ্লাবী যে বিরাট মহাতরঙ্গে পরিণতি লাভ করতে চলেছে, বিস্মৃতি থেকে ইতিহাসের পাতায় যে চিরস্মরণীয় হতে চলেছে, অমরত্ব লাভ করতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা প্রিয়জনদের কেউ তখন বুঝতে পারেনি।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ ইং। ঐদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের বুকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পূর্ব নির্ধারিত কৌশল অনুসারে একে একে বিপ্লবীরা সমবেত হতে থাকে। গৃহত্যাগের পূর্বে বিপ্লবীরা অনেকে নিজের মার কাছ থেকেই বিদায় নেয়। হঠাৎ হেসে হেসে ছেলে মায়ের পদধূলি নেয়—মা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, হঠাৎ এমন করে বিদায় নেবার মত ভাব কেন? ছেলে জবাব দেয়, কিছু না, হঠাৎ তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করল। তারপর আস্তে আস্তে বিপ্লবী কিশোর বা যুবক গৃহত্যাগ করে। তাতেও মা-বোনের কোন সন্দেহ হয় না, কারণ, প্রায় রোজই তারা এমন করে বেরিয়ে যায়। এ যাওয়া অনেকেরই যে চিরবিদায় তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

বিভিন্ন কাজের জন্য আগে থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের তৈরী করা হয়েছিল; তার মধ্যে শহরের বিপ্লবীদের মধ্যে অনন্ত লাল সিংহ আগে থেকেই মোটর চালাতে শিখেছিলেন কারণ তাঁদের নিজেদের একখানা "বেবী অষ্টিন" গাড়ী ছিল। ঐ গাড়ী দিয়ে দলের অনেকেই মোটর চালানো শিখেছিল। অস্ত্রাগার দখল ও অন্যান্য কাজে

যেতে হলে আরও গাড়ী দরকার। তাই নির্ধারিত দিনের কয়েকদিন পূর্বে সদরঘাটের মটর ব্যবসায়ী রায় চৌধুরীদের কাছ থেকে দলের টাকা দিয়ে অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর নামে একখানা "শেভ্রোলেট" গাড়ী কেনা হয়।

আগের দিন থেকে শহরের উত্তরাংশে প্যারেড গ্রাউণ্ডে মুসলিম কনফারেন্স আরম্ভ হয়েছে। বিশিষ্ট মুসলিম নেতা মরহুম এ, কে, ফজলুল হক, মৌলানা আক্রাম খাঁ, আসাদ উল্লা সিরাজী প্রমুখ সেই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। ১৮ই এপ্রিলের সন্ধ্যায় পাক-ভারতের অন্যতম কুস্তিগীর গামার সঙ্গে ঐ সম্মেলন মণ্ডপে অন্য এক বিখ্যাত পালোয়ানের প্রতিযোগিতা। শহরের কিছু দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ। অন্যদিকে লবণ সত্যাগ্রহের কাজ চলছে কুমিরায় সমুদ্রতটে।

নির্বাচিত বিপ্লবী যোদ্ধারা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন অংশে সমবেত হয়। প্রধান ঘাঁটি ছিল বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষের পিতার* (বিপিন ঘোষ) দোকানে। দ্বিতীয় দল আসকার খাঁর দিঘীর পশ্চিমপাড়ে কংগ্রেস অফিসে, তৃতীয় দল বিপ্লবী রজত সেনের পিতার (জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুত রঞ্জন সেন) ফিরিঙ্গিবাজার বাসায় এবং চতুর্থ দলটি প্যারেড মাঠের (বর্তমানে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের খেলার মাঠ) দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় ব্রাহ্ম মন্দিরের পিছনে টিলার উপর বিপ্লবী ছাত্র দেবপ্রসাদ ও আনন্দ গুপ্তের পিতা শ্রীযুত যোগেন্দ্র গুপ্তের বাসায়।

যেই আরও একখানা মোটরকার পাওয়া যাবে এক রকম স্থির ছিল, শেষ মুহূর্তে ঐখানা মেরামত শেষ না হওয়ায় তা পাওয়া গেল না। তখন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন বহু কষ্টে অত্যন্ত দ্রুত বিশ্বস্ত সংবাদদাতাদের দিয়ে সব কেন্দ্রে জানিয়ে দেন যে, সংঘাত আর কিছু পরে শুরু হবে। মৃত্যুপাগল বীর তরুণ বিপ্লবীদের পক্ষে, সামান্য অপেক্ষাও

---

* ইনি ১৯২১-এর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের অন্যতম নেতা ছিলেন। ধর্মঘট শেষ হলে অন্যান্য রেল কর্মচারীরা কাজে যোগ দিলেও, যে কয়েকজন রেল কর্মচারী আর কাজে যোগ না দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি সদরঘাটে "স্বদেশী বস্ত্রালয়" নামে একটি স্বদেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। এঁদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল যশোর জেলায়।

অসহ্য। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মৃত্যুহীণ প্রাণ দুইহাতে অঞ্জলী ভরে তুলে নিয়ে উৎসর্গ করার জন্য তারা উন্মুখ। তবুও নেতার নির্দেশ পেয়ে তারা সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেছিলেন, অভ্যুত্থান শুরু হবে ঠিক রাত সাড়ে আটটায়। বিভিন্ন দলের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য আগে থেকে খাকি হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট, জলের টিন (ওয়াটার ক্যারিয়ার) ইত্যাদি তিন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবীরা এসে পোষাক পরিবর্তন শুরু করে। গণেশ ঘোষের বাসায় এসময় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। প্রায় তিন মাস আগে আসকার খাঁর দিঘীর পাড়ে কংগ্রেস অফিসে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু দস্তিদার ভীষণভাবে পুড়ে যায় বলে তাদের নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছিল না। তারা গ্রামে গোপন আশ্রয়-কেন্দ্রে ছিল এবং তখনও তারা দুইজনই বেশ অসুস্থ ছিল বলেই নেতারা জানতেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে গণেশ ঘোষের বাসায় গোপন আশ্রয় স্থল থেকে অর্ধেন্দু গিয়ে হাজির হয়। তখনও পোড়া ঘায়ের লাল চামড়া প্রায় কাঁচা, মাত্র ঘা শুকিয়েছে। তার গায়ের রং কালো, মুখে পোড়া ঘায়ের লাল লাল দাগ। তাই প্রথমটা তাকে উপস্থিত বিপ্লবীদের অনেকেই চিনতে পারে নি। সে সোজা গিয়ে নেতা গণেশ ঘোষকে বলে, সে তাঁদের সঙ্গে যাবে। কয়েক মাস পূর্বে তার পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে গৃহত্যাগ করার পর থেকে অর্ধেন্দু দস্তিদার যে ভাবে কংগ্রেস অফিসে নেতা সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিল এবং এক-রকম "সর্বক্ষণের' কর্মীর মত নীরবে কাজ করত, তার মুখের উপর তাকে নেওয়া হবে না বলা নেতার পক্ষেও সম্ভব হল না। অর্ধ-সুস্থ অর্ধেন্দুকে জানিয়ে দেওয়া হল, সেও যেতে পারবে। শুনে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল উৎসাহ ও দেশপ্রেমের আলো। সেদিন যে কয়টি বিপ্লবী কিশোর ও তরুণ স্বাধীনতার জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরী হয়েছিল তাদের মধ্যে এই একজনই ছিল শারীরিক দিক থেকে অযোগ্য অথচ মনের শক্তিতে সে অন্য সব সাথীর সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে গিয়েছিল।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োজন মাফিক ছিল না। তাই স্থির হয়, যে কোন উপায়ে অভ্যুত্থানের বিভিন্ন দলের জন্য মোটর যোগাড় করে নিতে হবে। শহরের মাঝখানে লালদিঘীর পাড়ে ট্যাক্সির আড্ডা। ওখান থেকে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে আনবার জন্য হিমাংশু সেনকে পাঠানো হয়। সে একখানা ট্যাক্সি সদরঘাটের কেন্দ্র গণেশ ঘোষের বাসায় এনে ড্রাইভারকে ভিতরে ডেকে নেয়। বাড়ীর কর্তা তার সঙ্গে দর নিয়ে আলাপ করতে চায় এই অজুহাতে ড্রাইভারকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিতরে যেতেই অনন্ত লাল সিংহ তার বুকের সামনে রিভলভার তুলে ধরেন। ড্রাইভার ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়, কিন্তু ক্লোরোফরম দিয়ে তাকে অজ্ঞান না করা পর্যন্ত তাকে বিপ্লবী নেতারা বলেন যে, তার কোন ভয় নেই। তাকে কেবলই হাত পা বেঁধে রাখা হবে, তাকে প্রাণে মারা হবে না, এটা অবশ্য আগে থেকে স্থির ছিল। এভাবে বদ্ধ অবস্থায় ভিতরের কামরায় একটি ড্রাইভার পড়ে রইল।

যে সব পরিকল্পনা, তার সাফল্যের জন্য সর্বপ্রথম দরকার সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল করা। তাই ১৮ই এপ্রিলে চট্টগ্রাম "ষ্টার" অভ্যুত্থানের প্রথম দল বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একখানা মোটরে করে যাত্রা করল টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে। নন্দনকাননের উঁচু পাহাড়ের উপরে এই অফিসগুলির সে সিঁড়ি দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে খাড়া উঠে গেছে তাদের গায়ে আজও বুঝি সেই দিনের অগ্রগামী দলের পায়ের চিহ্ন রঙ্গীন হয়ে আছে। বিপ্লবী কিশোর আনন্দ গুপ্ত শহরের মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেও মোটর চালনা শিখেছে, কিন্তু গাড়ীর ষ্টীয়ারিং তার পক্ষে বেশী উঁচুতে, তাই দু'টি বালিশ দিয়ে তার বসবার যায়গাকে উঁচু করা হয়েছে। সে তার উপর বসে মোটর চালিয়ে এসে গাড়ী থামায় টেলিগ্রাফ অফিসের পাহাড়ের গায়ে।

অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দগুপ্ত ও অন্য তিন জন বিপ্লবী যখন দ্রুত পদক্ষেপে অফিসে প্রবেশ করে তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। পাহারারত সশস্ত্র রক্ষী কিছু বুঝতে পারার পূর্বেই রিভলভারের গুলীতে ধরাশায়ী হল। বিপ্লবীরা ঘরের

মধ্যে তড়িৎগতিতে ঢুকেই অপারেটারদের দিকে অগ্নিনালিকা এগিয়ে ধরতেই তারা তাদের আসন ছেড়ে সভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘন কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত একটি মানুষের হাতে ধরা রিভলভার আর কণ্ঠ থেকে কঠিন আদেশ ঘোষিত হল, কেউ যেন একটুও না নড়ে। নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর সেই রুদ্র মূর্তির সামনে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে আর অন্য বিপ্লবীরা সঙ্গে যেসব বড় বড় হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়েছিল তা দিয়ে টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের যন্ত্রপাতি সব আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে তাতে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রথম সাফল্যের অগ্নিশিখা। বিনা রক্তপাতে চট্টগ্রামকে সংবাদের দিক থেকে সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল।

আগেই কথা ছিল, এই প্রথম দল তাদের নির্দিষ্ট কাজে বেরিয়ে যাবার পর যাবে অন্যান্য দল। সরকারী সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেলে ঐ পরিকল্পনাগুলি সফল করা সহজ হবে।

তার কয়েক মিনিট পরে বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে রজত সেন* সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী ও মাখন ঘোষালকে নিয়ে পাহাড়তলী সরকারী অস্ত্রাগার দখলের দলটি যাত্রা করল। ইউরোপীয়ান ক্লাব (বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্লাব) আক্রমণের দল তৈরী হল বিপ্লবী নরেশ রায়ের নেতৃত্বে। দামপাড়া পুলিশ লাইনের কাছে অন্যান্য সব দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা দখল করার জন্য দলে গেলেন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, বিধু ভট্টাচার্য, শান্তি নাগ, নিতাই ঘোষ, প্রভাস বল, হরিপদ মহাজন, ক্ষীরোদ, সরোজ গুহ ও হিমাংশু সেন। শহরের বিভিন্ন গোপন কেন্দ্র থেকে একই সময়ে বিপ্লবীরা প্রচণ্ড আঘাতের সংকল্প নিয়ে সেদিনকার রাতে বেরিয়েছিল। সারা শহর তখন করছে কর্মক্লান্ত দিবসের পরে বিশ্রামের

---

* রজত সেন—শহরের উকিল শ্রীরঞ্জন সেনের ছেলে কালারপোল সংঘর্ষে শহীদ।
মাখন ঘোষাল—চন্দননগর সংঘর্ষে শহীদ।
ফনীন্দ্র নন্দী—পটিয়া দক্ষিণ ভূর্ষির যুবক, আন্দামানে মৃত।
সুবোধ চৌধুরী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ২৫ বছর সাজা হয়, ১৯৪৬শে মুক্তি পেয়ে নিজ জেলা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে চলে যায়।

আয়োজন—আর মরণকে তুচ্ছ করে এই বিপ্লবীরা মুক্তি সংগ্রামের জন্য পরাধীন দেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গার জন্য, সারা দেশে সংগ্রামের প্রেরণা জাগাবার প্রয়াসে এগিয়ে চলে।

সুপুরুষ গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠদেহী লোকনাথ বলকে সামরিক পোষাকে ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীর মতই মনে হচ্ছিল। একখানা ট্যাক্সী ভাড়া করে আনা হল, তাতে সকলে এসে উঠবার পরে গাড়ী বেগে ছুটে চলে পাহাড়তলীর দিকে। কেমন করে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখল করা হয়েছিল তার বিবরণ বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বলের নিজের ভাষায়ই বলি :—

*চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল নির্মলদা (শ্রীযুক্ত নির্মল সেন) এবং আমার উপর। মাষ্টারদা (শ্রীযুক্ত সূর্য সেন) ছিলেন আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, আমাদের কার্যের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাঁরই নির্দেশে। নির্মলদা এবং আমার মধ্যে সাব্যস্ত হল, রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করব আমি। ১৮ই এপ্রিল বেলা তিনটার সময় আমি স্থানীয় ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে একজন ড্রাইভারকে বললাম, ঐদিন রাত আটটার সময় গাড়ী নিয়ে আমার বাসায় যেতে, আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু বেরুব বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় নির্মলদা, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল, (মাখন) ফনী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী ও আমি সামরিক পোষাকে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। আমার গায়ে ছিল উচ্চ ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর পোষাক এবং অন্যেরা সৈন্যের পোষাক পরিহিত ছিল। আটটার সময় ট্যাক্সি এলে আমরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে পাহাড়-তলীর দিকে গাড়ী চালাবার জন্য নির্দেশ দিলাম। (পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম শহরের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখ পথ দিয়ে যাবার সময় আমরা দেখে গেলাম অস্ত্রাগারের অবস্থা। অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিক। আমাদের গাড়ী যখন পাহাড়তলী ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছল তখন আমি ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। গাড়ী থামাতেই আমি এবং রজত গাড়ী থেকে নেমে

* "যুগান্তর" (২৯শে শ্রাবন, ১৩৫৪ বাং) স্বাধীনতা সংখ্যায় শ্রীলোকনাথ বল লিখিত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

ড্রাইভারের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে তাকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। ড্রাইভার আমাদের নির্দেশ পালন করল, আমরা ড্রাইভারকে রাস্তার পাশের ধানক্ষেতে নিয়ে যাই এবং তার হাত পা বেঁধে ক্লোরো-ফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে দিই। প্রায় দশটার সময় আমাদের গাড়ী রেলওয়ে অস্ত্রাগারের পাশের গেটে গিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়-তলীর দিকে ফিরে আসবার সময় গাড়ী চালাবার ভার নিয়েছিল জীবন ঘোষাল। অস্ত্রাগারের সম্মুখে আমাদের ছয়জন সাথী পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী অপেক্ষা করছিল। তাদের একজন এসে ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে দিলে আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। অস্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের পরিচয় জানার জন্য চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—"থাম, কে আসছ?" (হল্‌ট, হু কামস্‌ দেয়ার?)।

তার জবাবে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম "বন্ধু" (ফ্রেণ্ড)। তারপর আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামল। আমি একা গাড়ী থেকে নেমে এসে অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আমার কাছ থেকে তখন রক্ষীর দূরত্ব ছিল অনুমান সাত আট হাত।

রক্ষীকে আমি ডাকলাম, "সেন্‌ট্রি, ইধার আও।"

রক্ষী আমার সামনে এসে সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করল। তার ডানহাত রাইফেলের "বাট' স্পর্শ করা মাত্রই আমি বাঁ হাত দিয়ে তার রাইফেল চেপে ধরি এবং ডান হাতে তার বুকের সামনে রিভলভার লক্ষ্য করে বলি—আমরা স্বদেশী, আমরা অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও। আমি তাকে রাইফেল ছেড়ে দিতে বলার পর সে হঠাৎ আমার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। আমি তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলী করি। সে আহত হয়ে পড়ে গেল, অন্য তিনজন রক্ষী তাদের রাইফেল ধরার চেষ্টা করলে আমার সাথীরা ও আমি ক্রমাগত গুলী বর্ষণ করে তাদের প্রতিহত করলাম।

আমাদের প্রথম গুলীর আওয়াজ শুনেই অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারেল তার ঘরের বারান্দায় এসে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল। আমি তাঁকে হুঁশিয়ার করে বল্‌লাম আমরা

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সভ্য। আমাদের নেতার হুকুমে আমরা অস্ত্রাগার দখল করেছি। তুমি যদি আমাদের কোন অনিষ্ট করার চেষ্টা কর তাহলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

আমাদের কথা শোনার পর সে ঘরে গিয়ে ঢুকল, এবং অনতি-বিলম্বে আমাদের আক্রমণ করার জন্য তার রিভলভার নিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলীতে আহত হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে এসে তাঁর এবং তাঁর শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের মায়ের মত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা তাঁকে হুঁশিয়ার করেছিলাম। আপনি নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে যান কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না।

গুলীর আওয়াজ শুনে পাহাড়তলীর দিক থেকে ক্যাপটেইন টেইট, আর কিছু ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রেল কর্মচারী রিভলভার নিয়ে ছুটে আসতে দেখে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় স্থান নিয়ে দাঁড়ায়। তখনও অস্ত্রাগার দখল করা হয়নি এবং পাহাড়তলীর ঐ রাজভক্তরা সংখ্যায় কত, দূর থেকে তা ঠিক বোঝাও যাচ্ছিল না। তাই বিপ্লবীদের দিক থেকে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজীতে আদেশ দেওয়া হল "বোমা রিভলভার নিয়ে সব তৈরী থাক—আদেশ পাওয়া মাত্র সবাই এক সঙ্গে আমাদের দুষমনদের উপর তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে! তাদের দিকে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গুলীও ছুটে যায়। পলায়নই শ্রেয় মনে করে ঐ সব ইংরেজ আর তাদের সাথীরা আর দেরী না করেই চলে যায় এবং উর্ধশ্বাসে দৌড়ানোই নিরাপদ মনে করে।"

অস্ত্রাগারটিতে কেবল রেলওয়ের অস্ত্রাদিই থাকত না—রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এটি তৈরী করেছিল তাদের অস্ত্রাদি নিরাপদে রাখার জন্য। তবু চট্টগ্রামে এত সুরক্ষিত অস্ত্রাগার তখন আর ছিল না বলে, সরকারী রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার, মেশিনগান, লুইসগান এবং প্রচুর গোলা-গুলী এখানে রাখা হত। এই ঘরটির নিরাপত্তার জন্য তাই নিযুক্ত ছিল দায়িত্বশীল ইংরেজ সামরিক কর্মচারী, যাকে বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তার অধীনে সশস্ত্র প্রহরীর প্রায় বিশ জনের

একটি দল, এই অস্ত্রাগার পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত ছিল। এই পাকা ঘরের চারটি দেওয়ালের সঙ্গে ভিতর দিকে শক্ত লোহার পাত মেজে থেকে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত আটকানো ছিল। আর একটি মাত্র দরজায় খুব মোটা ডাণ্ডা দিয়ে তৈরী লোহার ভারী গেট ছিল।

অস্ত্রাগার দখল পরিকল্পনার সময়েই বিপ্লবীরা এই ঘর যে অতি সুরক্ষিত এবং দরজা যে অত্যন্ত কঠিন তার খবর নিয়েছিল। তাই তারা আক্রমণ করতে আসার সময় সঙ্গে শাবল, গাঁইতি ও জাহাজ বাঁধার দড়ি (ম্যানিলা রোপ) অনেকটা নিয়ে এসেছিল।

সংস্কৃত প্রবাদ 'য পলায়তি স জীবতি' (যে পলায়ন করে সেই বাঁচিতে পারে) অনুসরণ করে যখন ইংরেজ কর্মচারীরা চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব যন্ত্রপাতি দিয়ে অস্ত্রাগারের লোহার গেট ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এত শক্ত গেট ভাঙ্গা সম্ভব হল না। তখন বিপ্লবী-নেতা নির্মল সেন বললেন, সঙ্গে যে 'ম্যানিলা রোপ' আছে, তা অস্ত্রগারের লোহার ডাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হোক্। তারপর তা মোটরের পিছনের চাকার ডাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে খুব জোরে মটর চালাতে থাকলে দরজা ভেঙ্গে আসতে পারে।

তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাব কাজে পরিণত হল। জাহাজের ঐ দড়ি বাঁধা মোটর গাড়ী মিনিট কয়েক পূর্ণ শক্তিতে চালাবার পর অস্ত্রাগারের বিরাট লোহার গেট দেওয়াল থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে আর উল্লসিত বিপ্লবীদের গগনবিদারী, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ও "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে চট্টগ্রামের নৈশ-আকাশ কম্পিত হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের দিনে ব্যাসটিল দুর্গ ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবী প্রেরণা ইউরোপের শোষিত নিপীড়িতদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল আজ চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় মুক্তি-পাগল বিপ্লবী তরুণ এশিয়ার বুকেও তারই পরশ পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষক ইংরেজের এই অস্ত্রাগারকে ভেঙ্গে ফেলল। তাদের এই আনন্দ আর উল্লাস সেদিনকার পাহাড়তলীর ঝোপে-ঝাড়ে ঢাকা সবুজ পাহাড়-গুলির গায়ে যে প্রতিধ্বনি তুলছিল, তা তখন ঘুমন্ত দেশবাসীকে শুধু দৈহিক দিক থেকে নয় চেতনার দিক থেকেও জাগিয়ে তুলতে যে সাহায্য করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জয়োদ্ধত বিপ্লবীরা তখন অস্ত্রাগারের ভিতরে। কত কষ্ট ও বিপদ মাথায় করে পূর্বে পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি যোগাড় করতে হয়েছে। কলিকাতায় বিপ্লবী অনুকুল মুখার্জির সাহায্যে "স্মাগলার" (গোপন বিক্রেতা) দের কাছ থেকে অথবা কলিকাতার বিখ্যাত "গুণ্ডা" মীনা পেশোয়ারীর দল ও অন্যান্য গোপন সূত্র থেকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা পিস্তল, রিভলভার দেড় শ' দু'শ টাকা দামে কিনেছে। আর রাইফেল ত দেখা গেছে কেবল সরকারী পুলিশ বা সৈন্যের হাতে।

অস্ত্রাগারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ বিপ্লবীরা দেখল খুব ভাল শ্রেণীর ওয়েবলী ও কোলট্ রিভলভার, রাইফেল ও গুলীর বড় বড় বাক্স সাজানো রয়েছে। আগে থেকে নিজ নিজ পরিবার থেকে চুরি করা বন্দুক যে দু'একটা এই দলের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল তার প্রতি আর আকর্ষণ কারও রইল না। অনেক বেশী শক্তিশালী রাইফেল তাদের করায়ত্ত। তারা রাইফেল এক একটি কাঁধে নিয়ে নিল। কেউ একটি কেউ দু'টি ভাল চক্‌চকে ওয়েবলী কোমরে চামড়ার বন্ধনীতে নিল। তাদের উৎসাহের সীমা নেই। অস্ত্রশালায় দু'টি মেশিনগান ও লুইসগান ছিল। এই দু'টির ব্যবহার তারা জানত না। যদি এই দু'টি শক্তিশালী অস্ত্রের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ বিপ্লবীরা সেদিন পেত, তা'হলে চারদিন পরে যে সম্মুখ যুদ্ধে তারা কেবল রাইফেলের জোরেই সরকারী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিল, সেই যুদ্ধে তাদের আরও পর্যুদস্ত করা বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব হত।

বিপ্লবীদের সঙ্গে বড় বড় হাতুড়ী নেওয়া হয়েছিল। সেই বিরাট হাতুড়ী দিয়ে ঐ মেশিনগান আর লুইসগানকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাখা হল ভবিষ্যতে যেন শত্রুপক্ষ এগুলি ব্যবহার করতে না পারে। অন্যদিকে অস্ত্র ও গোলাগুলী দ্রুত মোটরে বোঝাই করা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা যায় 'টাইগার পাসের' মোড়ে একখানা মোটরের বড় আলো। বিপ্লবীরা সামরিক কায়দায় অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। মোটর আরও এগিয়ে আসতে থাকলে বিপ্লবীদের আদেশ ঘোষিত হয়, "হল্ট" (থাম)।

জবাব আসে, "আমি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট"।

ঐ মোটরে তখনকার ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইলকিন্‌সন্‌ ও তার দেহরক্ষী ছিল। রাতের নির্জনতায় গোলাগুলীর শব্দ শুনতে পেয়ে সে বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এদিকে এসেছে। তখনও তার ধারণাই হয়নি যে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের পক্ষে অস্ত্রাগার দখল ও অধিকার করা সম্ভব। দূর থেকে খাকী পোষাকে বিপ্লবীদের দেখে নিজেদেরই লোক মনে করে বেশ সাহস ও ভরসা নিয়েই সে জবাব দিয়েছিল এবং গাড়ীকে বিপ্লবী সান্ত্রীদের আদেশ অনুসারে থামাবার কোন প্রয়োজন সেই ম্যাজিষ্ট্রেট বোধ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের গুলী ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীর দিকে বর্ষিত হয়। মোটর টায়ারেও গুলী লাগে ও তার হাওয়া বেরিয়ে যায়, তাই গাড়ী থেমে যায়। বিপ্লবী সৈনিকরা তখন অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যায়। টর্চ ফেলে দেখে মোটরখানার ড্রাইভার নিহত হয়েছে আর ম্যাজিষ্ট্রেট গাড়ীতে নেই। উইলকিন্‌সন্‌ সাহেব নাকি অত্যন্ত দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার পাশে গভীর নালার মধ্যে কতক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়েছিল, যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। তারপর বিপ্লবীরা যখন অস্ত্র বোঝাই করার জন্য ব্যস্ত, এই ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট বেদনা ভারাক্রান্ত মনে নিজের ঝাউতলার নিকটবর্তী উচ্চ পাহাড়ী বাংলোয় ফিরে আসে এবং কোথাও খবরাখবর করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকারী দলের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত যে সময় নির্দিষ্ট ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী সময় যাওয়াতে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ ও অন্য কিছু বিপ্লবীকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজন বোধে সাহায্যের জন্য পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে মোটর যোগে পাঠিয়ে দেন। তারা এসে দেখে বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নির্দেশে কেবল অস্ত্র বোঝাই হচ্ছে মোটরে। কিন্তু নিজেদের কোনমতে বসবার যায়গা চাই, তাই বহু অস্ত্র বোঝাই সম্ভব হচ্ছে না। অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে যে বিপ্লবীরা আসে, তারা উন্মুক্তদ্বার অস্ত্রাগার দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে ছুটে গিয়ে তাদের মোটরেও অস্ত্র বোঝাই আরম্ভ করে। তারপর অস্ত্রাগার পেট্রল দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মোটর দু'খানা এগিয়ে চলে সর্বাধিনায়কের হেড কোয়ার্টারে।

পূর্ব-নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসারে সিদ্ধান্ত ছিল সর্বপ্রথম দল যখন সংবাদ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করতে যাবে, তার কয়েক মিনিট পরে যাবে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকারী দল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দল যাবে চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাবে (বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব) আক্রমণ করার জন্য। আর অবশিষ্ট বিপ্লবীরা সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ও নেতা অনন্ত সিংহের পরিচালনায় শহর দখল পরিকল্পনার সর্বশেষ ঘাঁটি দামপাড়া রিজার্ভ পুলিশ ব্যারাকের পাহাড়ের সানুদেশে অন্য দলগুলির নিজ নিজ দায়িত্ব সাফল্যের সহিত পালন করে এসে মিলিত হবে। তারপর মোট ৬৩ জন বিপ্লবী নূতন সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, চট্টগ্রামে সেই তারিখে ইংরেজ সরকারের সর্বশেষ অবলম্বন ঐ রিজার্ভ পুলিশদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম শহর দখল করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে দামপাড়ার ঐ পাহাড়ের গোড়াতেই সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের সদর দফতর স্থাপিত হয়েছিল।

তখনকার রাজনৈতিক চেতনার যে স্তর বাংলার বিপ্লবীদের ছিল, তাতে পরাধীনতার সকল বেদনা ও গ্লানির জন্য ইংরেজ জাতিকেই তারা দায়ী মনে করত। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ মাত্রকেই তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল ধরে নিয়ে, ব্যক্তিগত ভাবে তাদের হত্যা করার ভিতর দিয়েই তারা দেশপ্রেমের আগুনে সঞ্জীবিত পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকে রূপ দেওয়ার কথা ভাবত। এই চিন্তাধারা থেকেই প্রথম বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম হাত বোমা নিয়ে ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিহারের মুজাফফরপুরের ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ী আক্রমণ করেছিল।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের কর্মসূচীর মধ্যে তাই ইউরোপীয়ান ক্লাব (বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব) আক্রমণ ও ক্লাবে ক্রীড়ারত ইংরেজ নর-নারীকে নির্বিচারে হত্যা করা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তখন সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য কাজে যে সব ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নর-নারী চট্টগ্রামে ছিল, তাদের সান্ধ্য আসরে সমবেত হওয়ার স্থান ছিল ঐ ইউরোপীয়ান ক্লাব। স্থির হয়েছিল হাত বোমা, পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করা হবে এবং পলায়নরত ইংরেজ নর-নারীকে পিঁপড়ার মত পিষে ফেলতে পারবে। বিপ্লবীদের অন্যান্য সব কর্মসূচীই সেই কালরাত্রিতে যদিও সাফল্য-

মণ্ডিত হয়েছিল, ইংরেজদের নৃশংসভাবে হত্যালীলার এই ব্যবস্থা সেদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঐদিন ছিল "গুডফ্রাইডে", খৃষ্টানদের পবিত্র দিন। তাই তাদের নিয়মিত নাচগানও সেদিনকার মত স্থগিত ছিল। এই খবর বিপ্লবীরা জানত না। তাই দলের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য নরেশ রায়ের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবীকে ঐ তারিখে অন্যান্য দলের মত একই সময়ে রাত সাড়ে দশটায় চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করতে পাঠানো হয়। তারা গিয়ে দেখে জনশূন্য ক্লাবগৃহের দরজায় বড় তালা ঝুলছে। তখন খুবই মনঃক্ষুন্ন হয়ে তারা ফিরে আসে এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে দামপাড়া রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য সর্বাধিনায়কের কাছে অন্যান্য দলের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়।

এই সময় বিপ্লবীরা দেখতে পায় অন্ধকারে কে যেন জোরে হেঁটে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ আদেশ আসে, "হল্ট, হ্যাণ্ডস্ আপ্" (থাম—হাত তোল) জবাব দিতে দিতে সে এগিয়ে এস বলে, "আমি স্বদেশ, আমি স্বদেশ, আমিও যাব।"

প্রিয় দর্শন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায় এই তরুণ ছাত্রটিকে বিপ্লবীদের অনেকেই জানত। কিন্তু সে গোপন দলের সদস্য হবার যোগ্যতা ভালভাবে অর্জন না করায় তাকে সেদিনকার অভ্যুত্থানে অন্তর্ভুক্ত করার কোন কারণ ছিল না। তাদের বাসা ছিল এনায়েত বাজার "লাভ লেনের" শেষ যেখানে হয়ে রাস্তাটি সার্কিট হাউসের দিকে এগিয়ে গেছে, সেই জায়গায় রাস্তার দক্ষিণ পাশে মিউনিসিপ্যাল নালার ধারে। কিছুদিন আগে থেকে স্বদেশ রায় যখন সদরঘাট ক্লাবে ব্যায়াম করতে গেছে, সে লক্ষ্য করেছে যে, কোন বড় কিছু ঘটনার জন্য যেন সবাই তৈরী হচ্ছে। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে গোলাগুলীর শব্দ বাসা থেকে শুনে সে দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পর পর তিনখানা মোটরকার তার বাসার পাশ দিয়ে দামপাড়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ায় সে আন্দাজে রিজার্ভ ফোর্সের পাহাড়ের দিকে গিয়ে বিপ্লবীদের সামনে পড়ে।

আদেশ পেয়ে হাত তোলা অবস্থায় দেশপ্রেমিক এই তরুণ এগিয়ে গেলে, বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে তাকে চিনতে পারে। স্বদেশ তাদের

সামনে এসেই বলতে থাকে, "আমিও পারব, দেশের জন্য লড়তে আর মরতে আমিও পারব, আমাকে আপনারা নিন আপনাদের সঙ্গে।"

প্রথম বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে তাকে তখন দলে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ হলেও পরে দুই কারণে তাকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমতঃ তার সুতীব্র দেশপ্রেম ও আত্মদানের আগ্রহ দেখে তাঁরা তাকে কাজের সুযোগ দিতে চান। দ্বিতীয়তঃ স্থির হয়, সে যখন তাঁদের এভাবে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দেখেই ফেলেছে তখন হয় তাকে হত্যা করতে হয়, না হয় ছেড়ে দিলে এই বিষয় শত্রুপক্ষের কাছে তার মারফত যে প্রকাশ হয়ে পড়বে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই।

তাই যেই কিছু বাড়তি খাকী উর্দী দলের সঙ্গে ছিল, তার একটি তাকে দেওয়া হল। স্বদেশকে অস্ত্রও দেওয়া হল, একজন এসে তাকে ফুলের বদলে কাগজের মালা দিয়ে অভিনন্দিত করল।

তারপর শুরু হ'ল চট্টগ্রাম রিজার্ভ ফোর্স আক্রমণ। বিপ্লবী নেতারা তাঁদের নিজ নিজ দল নিয়ে সমবেত। পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের রাইফেল, রিভলভার ইত্যাদি নিয়ে গাড়ী বোঝাই করে এসেছেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল আর অনন্ত সিংহ। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা অপেক্ষা করে রয়েছেন শহরের অন্যান্য দলের বিজয়ীদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। তারপর একযোগে চট্টগ্রাম শহরে সেই রাত্রির মত ইংরেজ সরকারের শেষ ভরসা, এই পুলিশ রিজার্ভ ফোর্সকে পরাজিত করার জন্য চলে অধীর প্রতীক্ষা।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে সারা দেশ মেতে উঠেছে, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রিজার্ভ ফোর্সের পুলিশরাও এদেশেরই সন্তান। তাই আইন অমান্য আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব এদের মনেও পড়েছে। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন একথা জেনেই, সিদ্ধান্ত করলেন, অস্ত্র নিয়ে লড়াই করার পূর্বে রিজার্ভ ফোর্সের এই দেশের মানুষগুলিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তাই বিপ্লবীরা যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উপর দিকে উঠছেন, তখন তাঁরা ধ্বনি দিতে থাকেন, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" (বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক) আর

"গান্ধীরাজ হো গিয়া, ভাগো" (গান্ধীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, পালাও)। বলা দরকার যে, তখনকার রিজার্ভ ফোর্সে হিন্দী—উর্দুভাষী লোকই বেশী ছিল। বার বার এই ধ্বনি শোনার ফলে সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে আকাঙ্খিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং কিছু কিছু রিজার্ভ ফোর্স-এর সিপাহী ব্যারাকের বিপরীত দিক থেকে পলায়ন করতে থাকে। কারণ বিপ্লবীরা যখন দ্রুত পাহাড়ে উঠছিল তখন কেবল ধ্বনিই তারা দেয়নি, তাদের বক্তব্যকে আকাশের দিকে গুলীর আওয়াজ দিয়ে তারা সঠিক-ভাবে বোঝাবারও চেষ্টা করছিল।

উপরে উঠবার পর প্রহরারত সান্ত্রী ও হাবিলদার প্রথমে সামরিক পোষাকে সজ্জিত গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহকে দেখতে পেয়ে নিজেদের কোন উর্ধতন কর্মচারী মনে করে সেলাম দেয়। রাইফেলধারী ঐ সান্ত্রী ঐ দুই বিপ্লবী নেতার গুলীতে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন আর কোন লড়াইয়ের দরকার হয় না। রাইফেল, গুলী ও অস্ত্রাগার ফেলে ইংরেজ সরকারের বেতনভুক এই সব দরিদ্র দেশবাসী ব্যারাক ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

একরকম বিনা আয়াসেই জিলায় বিদেশী শক্তির শেষ প্রধান সশস্ত্র ঘাঁটি বিপ্রবীদের দখলে এসে গেল। আবার জোর গলায় ধ্বনি উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ," "বন্দেমাতরম," "স্বাধীন ভারত কী জয়"। পাহাড় বন ঘেরা এই চট্টগ্রামের রাতের আঁধারের বুক চিরে এই বিপ্লবীদল দেশের মানুষের মনে সেই রাত্রে ছড়িয়ে দিল আলোর রেখা। সে আলো ছড়িয়ে পড়ে মুক্তিকামী ভারতবাসীর মনে প্রাণে, দূর হয়ে যায় নৈরাশ্য হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকার কিছুকালের জন্য, কিছু মানুষের মন থেকে।

দামপাড়ার ঐ পুলিশ রিজার্ভ ব্যারাকে তখন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের প্রধান দফতর স্থাপন করা হল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি নেতারা সেখানেই বিপ্লবীদের রাইফেল শিক্ষা দিতে থাকেন। এর পূর্বে বিপ্লবীদের কোন রাইফেল ছিল না। তারা কেবল রিভলভার, পিস্তল আর সাধারণ বন্দুকের ব্যবহার শিখতে পেরেছিল। পাহাড়তলী অস্ত্রাগার ও রিজার্ভফোর্স থেকে সংগৃহীত রাইফেল আর গুলী প্রচুর

পেয়ে আগের কার্টিজগান, পুরানো রিভালভার, পিস্তল সব ফেলে দিয়ে, ওয়াব্‌লি ও কোলট্‌ রিভলভার সবার হাতে আর কোমরে উঠেছে। সাফল্যের আনন্দে সবাই চঞ্চল। তাই নূতন ভাবে রাইফেল শিক্ষাও দ্রুত এগিয়ে চলেছে আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে নেতারা তখন জরুরী আলোচনা করছেন।

ঠিক এমন সময় হঠাৎ মেশিনগানের গুলী বিপ্লবীদের উপর বর্ষিত হতে আরম্ভ করল। আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হলেও, নেতারা একটুও বিচলিত না হয়ে বিপ্লবী যোদ্ধাদের বুকের উপর শোয়া অবস্থায় রাইফেল চালাবার নির্দেশ দিলেন। সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র এই ভাবে উভয়পক্ষে গুলী বিনিময়ের পর শত্রুপক্ষের মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেল।

নয়

বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থান পরিকল্পনার সময় প্রধান দু'টি অস্ত্রাগার দখল করার কথাই চিন্তা করেছিলেন। কারণ পাহাড়তলী অস্ত্রাগারই চট্টগ্রাম অক্জিলিয়ারী ফোর্স আর রেলওয়ের অস্ত্রাদি নিয়ে ইংরেজ সরকারের প্রধান অস্ত্রের ঘাঁটি ছিল। দ্বিতীয় অস্ত্রাগার ছিল রিজার্ভ ফোর্সের ব্যারাকে। জেটিতে সরকারী বন্দর কর্তৃপক্ষের আট দশটা রাইফেল আর একটি মেশিনগান ছিল। শহরের ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্র থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা ও সেই আন্দোলনে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান যোগদানের খবর জানতে পেরে নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই তারা যখন পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকালীন গোলা-গুলীর শব্দ শুনল, তখন তারা টেলিফোন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে, তারপর পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকারী বিপ্লবীদের গুলীর ঘায়ে বিতাড়িত ইংরেজ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইলকিন্সন্ ফিরে গিয়ে ইংরেজদের খবর দেন যে, চট্টগ্রাম সম্ভবতঃ তাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে।

তখন সাহসী কয়েকটি ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী জেটির ছোট অস্ত্রাগারটি থেকে সেখানকার একমাত্র মেশিনগানটি নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়বার জন্য স্থির করে। দামপাড়ায় রিজার্ভ পুলিশ ব্যারাকে যে বিপ্লবীরা আছে, তা আবার রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর এক দারোগা ও সিপাহীরা পালিয়ে এসে খবর দেয়। তখন ইংরেজরা কষ্ট করে মেশিন-গানটি দামপাড়ায় যে মিউনিসিপ্যালিটির জলসরবরাহের দমকল আছে তার উচ্চ জলাধারের উপর উঠিয়ে তা থেকে গুলী চালাতে শুরু করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গুলীর লক্ষ্য সীমার যে দূরত্ব, তার চেয়ে অনেক নিকটে যখন বিপ্লবীরা তাদের নূতন শেখা রাইফেল নিয়ে বুকের উপর শুয়ে শুয়ে গুলী চালাচ্ছিল, মেশিনগান থেকে গুলী গিয়ে তাদের পিছন দিকে বেশ দূরে পড়ছিল। একটি গুলীও বিপ্লবীদের কাছা-কাছি পড়েনি, অথচ তাদের রাইফেলের গুলী গিয়ে জলকলের কাছে

মাষ্টার দা

স্বাধীনতা
সংগ্রামে
চট্টগ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী

দেশপ্রিয়

মহিম চন্দ্র দাস

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

দিল্লীর কারাগার থেকে মুক্তির পর দেশপ্রিয়
যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সহধর্মিনী
মিসেস নেলী সেনগুপ্তা

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

আবদুল হক দোভাষ

শেখ রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী

সাবিত্রী দেবী

বিপ্লবী কল্পনা দত্ত

পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমনের নায়িকা
বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দার

সুহাসিনী গাঙ্গুলী

ইন্দুমতী সিংহ

চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান বিপ্লবী নেতা

অম্বিকা চক্রবর্তী

গণেশ ঘোষ

অনন্ত সিংহ

লোকনাথ বল

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

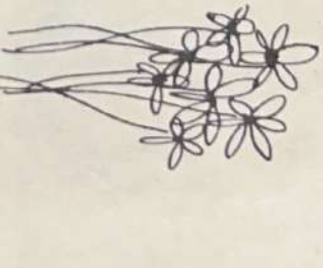

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদার

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

অর্ধেন্দু দস্তিদার

অমরেন্দ্র নন্দী

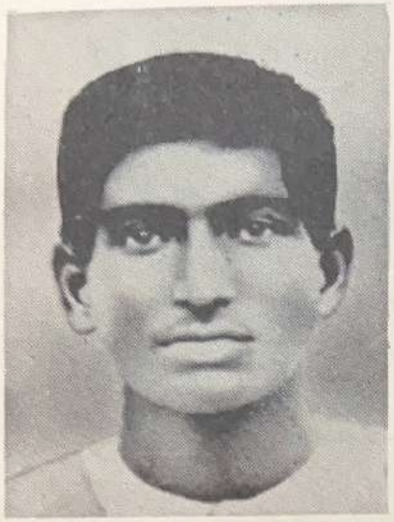

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী
কৃষ্ণ চৌধুরী (কিশোর বয়সে)
দেবপ্রসাদ গুপ্ত
আনন্দ গুপ্ত
মাখন ঘোষাল

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

মনোরঞ্জন সেন

রজত সেন

প্রভাস বল

অপূর্ব সেন

নরেশ রায়

(১) হরি গোপাল বল (টেগরা) (২) মতি কানুনগো

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

(১) নির্মল লালা (২) মধু দত্ত (৩) পুলিন ঘোষ

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

(১) নরেশ রায় (২) ত্রিপুরা সেন (৩) বিধু ভট্টাচার্য

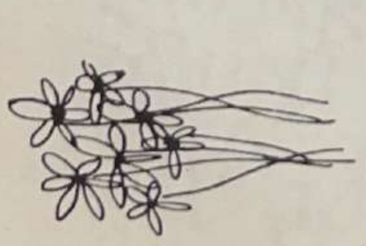

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

(১) প্রভাস বল (২) শশাঙ্ক (৩) জিতেন দাশগুপ্ত

স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম

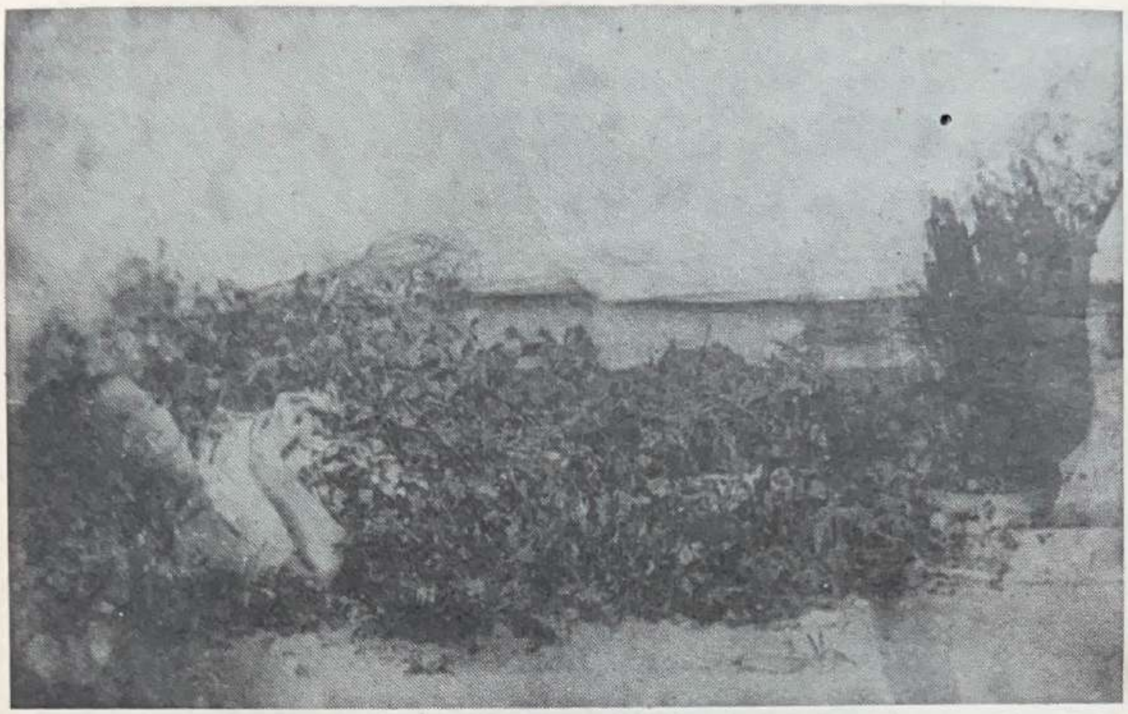

চট্টগ্রাম অভয়মিত্র শ্মশানে দাহের পূর্বে শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের মৃতদেহ

স্বাধীনতা
সংগ্রামে
চট্টগ্রাম

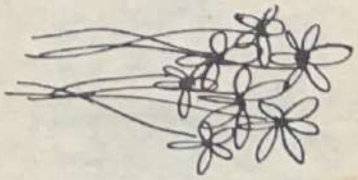

গিয়ে পড়ছিল। তাই ইংরেজরা কিছুক্ষণ ঐ মেশিনগান দিয়ে বিপ্লবীদের ঘায়েল করার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে বিদায় নেয়।

চট্টগ্রাম জলকল থেকে বৃটিশদের পলায়নের পরে মাষ্টারদা সূর্য সেন একটি সামরিক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন করে নীচের ঘোষণাটি দিলেন ঃ

'প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ!

ভারতীয় বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চাকাঙক্ষা পরিপূর্ণ করবার জন্য আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেছি।

আজ বিশেষ গৌরবের কথা, আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলি অধিকার করেছে। শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত; শহরের কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত; বহির্জগতের সঙ্গে তারবার্তা বিচ্ছিন্ন; রেললাইন উৎপাটিত ও মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত। বাহিরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শত্রুর সেনাবাহিনী পরাস্ত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত। জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উড্ডীয়মান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে ইহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

বিশ্বের গোচরার্থে ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনী চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর কবল হতে অচিরে ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্য ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।

ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি—সূর্য সেন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি, চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রী বাহিনীর বর্তমান পরিষদই সাময়িক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিম্নলিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিচ্ছে:—

(১) আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে;

(২) ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে হবে;

(৩) আভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করতে হবে; এবং

(৪) এই সাময়িক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীর কাছে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার আশা ও দাবী রাখে এবং দেশসেবকদের ও যাদের অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত আছে, তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য আশা করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনিশ্চিত জয়ের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে চল আমরা সমস্বরে বলি:

"বৃটিশ দস্যুর প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা নয়!'

"বিশ্বাসঘাতক ও লুণ্ঠনকারী দল সমূলে নিশ্চিহ্ন হোক!!"

"সাময়িক বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হোক!!!"

(চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ—১ম খণ্ড
অনন্ত সিংহ—১৩৭ পৃ:)

এই ঘটনার পর স্থানীয় ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, আর তাদের পক্ষে চট্টগ্রামে থাকা সম্ভব হবে না। তাদের নারী ও শিশুদের শহর ও পাহাড়তলীর তাদের বাসস্থান থেকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত তারা করে। এক বিদেশী জাহাজে শিশু ও নারীদের তাড়াতাড়ি মোটরে করে উঠান হয়। এবং ঐ জাহাজখানা কর্ণফুলী নদীর মোহনার বাইরে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে নোঙ্গর করে রাখা হয়।

তখনও রেডিওগ্রাম আমাদের এই উপমহাদেশে চালু হয় নি। দূরে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের প্রধান ব্যবস্থা ছিল টেলিগ্রাফ করা, কিন্তু বিপ্লবীদের দূরদর্শী পরিকল্পনার প্রথম কাজও ছিল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস দখল ও ধ্বংস করে সারা দুনিয়ার সঙ্গে চট্টগ্রামের সংবাদ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করে দেওয়া। তাই ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের এতবড় বিপদের খবর রাজধানী কলিকাতায় প্রাদেশিক লাট সাহেব ও অন্যান্যদের কাছে জানাবার জন্য পোর্ট কর্তৃপক্ষের শরণ নেয়। সেখানে ছিল বিনাতারের টেলিগ্রাফ। তার সাহায্যে তদানীন্তন লাট সাহেবকে চট্টগ্রামের ঘটনা জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাংলা দেশের যে কোন দেশভক্তকে বিনা বিচারে আটকের জন্যে অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর এক জরুরী আইন জারী করে।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০ ইং সারা বাংলায় শুরু হল পুলিশের তাণ্ডবলীলা। আগে যে প্রধান দু'টি বিপ্লবীদলের কথা বলা হয়েছে, সেই যুগান্তর ও অনুশীলন এবং ব্যক্তিকে ঘিরে অন্য যে সব ছোট ছোট বিপ্লবীদল অবিভক্ত বাংলায় ছিল, ঐ দিন ভোর থেকে তাদের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হল।

এদিকে রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ব্যারাকে এক ভয়ানক দূর্ঘটনা ঘটে গেল। শহরের চন্দনপুরা এলাকার বিপ্লবী হিমাংশু সেন (আশু) রিজার্ভ বাহিনীর অস্ত্রাগারটি পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে ভয়ানকভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। তার করুণ আর্তনাদে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ইত্যাদি নেতা ছুটে গিয়ে তাকে মাটিতে গড়িয়ে দিয়ে জামাকাপড়ের আগুন নিভাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার কাপড়-চোপড় আগে থেকেই পেট্রোলে কিছুটা ভিজা থাকায়, কোন মতেই তাকে আগুনের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তার মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে বিমূঢ়ের মত অন্যান্য বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে থাকে তাকে ঘিরে। নেতারা আদেশ দেন ঐ আগুনের আলোর কাছে কেউ যেন না থাকে, তাহলে শত্রুরা তাদের দেখে ফেলতে পারে।

বিপ্লবায়োজনের শুরুতেই একটি সিদ্ধান্ত ছিল যে, গুরুতরভাবে আহতদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে কম ক্ষতি হিসাবে গুরুতরভাবে আহত সহযাত্রীকে

গুলী করে হত্যা করতে হবে। আর কোন নারীকে কোন কারণে হত্যা করা হবে না।

হিমাংশু ছিল অত্যন্ত চমৎকার স্বাস্থ্যের। সাহসী এই কিশোরকে নেতারা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের চোখের সামনে যন্ত্রণায় তাঁদেরই দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্দীপিত সাথীটি ছটফট করছে, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে গুলী করলে সব যন্ত্রণার অবসান এই মুহূর্তেই হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল ও হিমাংশুর অন্তরঙ্গ সহপাঠী আনন্দ গুপ্ত একখানা মোটরে করে তাকে নিয়ে প্রথমে আনন্দ গুপ্ত-দের বাসায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে আনন্দ গুপ্তের মহানুভব পিতা বহু কষ্টে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে তাদের চন্দনপুরা বাসায় রেখে আসেন। সেই সময় হিমাংশুর পিতা আইনজীবী চন্দ্রনাথ সেন পরিবারের সকলকে নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়ী সাতকানিয়ায় গিয়েছিলেন এবং বাসা সম্পূর্ণ খালি ছিল। কাছেই ছিল শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের বাসা। হিমাংশুর অবস্থার কথা সেখানে এরা জানিয়ে দেয় এবং অর্ধেন্দুর ছোট ভাই সুখেন্দু গোপনে হিমাংশুর চিকিৎসা ও সেবার ভার নেয়। সুখেন্দু তার মায়ের কাছ থেকে দুধ গরম করে বোতলে ভরে গায়ের চাদরের তলায় করে নিয়ে তাকে খাওয়াতে থাকে। কিন্তু খালি বাসার এই যাতায়াত গোপন থাকে না। দু'তিন দিন পর মুমূর্ষু বিপ্লবী হিমাংশুকে তার বাসা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তার কয়েক দিন পর পর্যন্ত পোড়াঘা'র অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে হিমাংশু মৃত্যুবরণ করে।

হিমাংশুকে রেখে ভোর রাত্রে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও মাখন ঘোষাল কলেজ রোডে প্যারেড ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় ব্রাহ্ম-মন্দিরের পিছনে আনন্দ গুপ্তের বাসায় যায়। কারণ সবাই তখন বিশেষভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। অভ্যুত্থানে যাওয়ার আগে বিপ্লবীরা স্থানীয় চায়ের দোকানদার আব্বি মিঞাকে তাদের জন্য ৬৩ প্লেট মুরগীর মাংস ও পরোটার অর্ডার দিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল অভ্যুত্থানের বিজয়কে আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে ঐ দোকানে খাওয়ার মাধ্যমে অভিনন্দিত করা হবে। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ঘটনা এবং তার পূর্বে

জলকলের উপর থেকে মেশিনগানের গুলী চলার ফলে, ঐ রাত্রে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হয়েও বিপ্লবীরা শহর দখল করতেও আসেনি এবং উপরোক্ত দোকানে ভোজের ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়।

ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গোপনে আনন্দ গুপ্তদের বাসায় এই চারজন বিপ্লবী যেতেই আনন্দের মা তাড়াতাড়ি তাদের জন্য খিচুড়ী রান্না করেন। চারজনকেই কোনমতে খেয়ে আবার গিয়ে বিপ্লবীদের সদর দপ্তরে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ও অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। এদিকে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ না করায় কোতোয়ালীর দারোগা তার হাতে যে কয়েকজন পুলিশ ছিল তাদের নিয়ে পরিচিত বিপ্লবীদের শহরের বাসায় হানা দিতে শুরু করে। এক বড় থালায় যখন গোল হয়ে এই চারজন বিপ্লবী খিচুড়ী খেতে বসেছে, দারোগা পুলিশ তখন আনন্দদের পাহাড়ী টিলার উপর উঠে পড়েছে। তার বড় বোন ছিল পাহারায়। সে ছুটে এসে খবর দিতেই খিচুড়ী ফেলে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে বিপ্লবীরা দেবপাহাড়ের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পালাতে সমর্থ হয়। এই চারজন বিপ্লবীর পরবর্তী অবস্থা পরে বলছি। এখন মূল দলের কাহিনীতে আবার আমরা ফিরে যাই।

প্রধান বিপ্লবী নেতা দুইজন অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে রেখেই ভোর হবার পূর্বে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন, এই আশা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু উষার আভাস দেখা গেলেও তাঁরা যখন ফিরে এলেন না, তখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার জন্য রাত শেষ হবার আগেই অন্য পাহাড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। সূর্য সেন, নির্মল সেন ও লোকনাথ বল সহ দলের অবশিষ্ট ৫৮ জন সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় পুলিশ ব্যারেকের পাহাড় ত্যাগ করল। তার উত্তরে সবুজ যে পাহাড়ের সারি, তার দিকে চলে যেতে হবে, শহরের অবস্থার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে ও যে চারজন বিপ্লবী শহরে গেছে, তাদের সঙ্গেও মিলিত হতে হবে। পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ পথে চারজন ছাড়া অন্য সকলে যাত্রা করল। তখন উষা আসন্ন, পূর্ব আকাশে লালিমার আভা। তার রং এসে লাগে মুক্তিপাগল এই সব কিশোর আর তরুণদের মনে। ভারী রাইফেল, গুলীর বস্তা ও অন্যান্য জিনিস কাঁধে নিয়ে হাসতে হাসতে দেশের বন্ধন মুক্তির শপথ স্মরণ রেখে বিপ্লবীরা এগিয়ে চলে।

প্রতিদিনের মত আকাশে সূর্য জেগে ওঠে। লতাগুল্মশোভিত সবুজ পাহাড়ের ঘন বনের ছায়ায় সোনালী আলোর টুক্‌রো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯শে এপ্রিল সকালে বায়েজিদ বোস্তামীর আস্তানার পাশে নাগরখানা পাহাড়ে বসে সূর্য সেন, নির্মল সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী এক জরুরী বৈঠক করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অবিলম্বে স্থির করা উচিত কিন্তু শহরের অবস্থা জানার পূর্বে তার জন্য কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তাই বিপ্লবীদের মধ্যে একজনকে শহরে পাঠান হল। তার খাকী পোষাক পরিবর্তন করে তাকে ধুতি শার্ট পরে যেতে বলা হল। এই যুবকটি ছিল সেই বছরের বি, এ, পরীক্ষার্থী। সে শহরে এসে দেখল, কোনো পুলিশ মিলিটারীর বিশেষ বাড়াবাড়ি তখনও নেই—প্রায় শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন চলছে শহরে। কিন্তু গতকাল রাত্রের ঘটনার আলোচনা করছে মানুষ চায়ের দোকানে ও অন্যান্য জায়গায়। অনেকে খুব খুশী হয়েছে যে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সরকারকে এমন জব্দ করেছে। সংবাদ সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এই তরুণ বিপ্লবী শহরে আসবার পর, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখের মায়া তার মনে দুর্বলতা সৃষ্টি করল। সে ভাবল গতকাল রাত্রে ত ছিলাম। সব কিছুতেই যখন জয় লাভ ঘটেছে, তার মধ্যে সেও কিছুটা সাহায্য করেছে। কিন্তু সেদিন যদি সে চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে বি-এ পরীক্ষা না দেয়, তাহলে আর কোনদিন ভবিষ্যতে তার হয়ত গ্র্যাজুয়েট হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই আদর্শের প্রতি ও নিজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই যুবকটি আর খবর নিয়ে পাহাড়ে সাথীদের কাছে ফিরে গেল না। যখন গভীর উৎকণ্ঠায় নাগরখানা পাহাড়ে বিপ্লবীরা সময় কাটাচ্ছে তখন নিশ্চিন্তে ছেলেটি চট্টগ্রাম কলেজে বি-এ পরীক্ষা দিতে বসল।

সূর্য সেন স্বভাবতই ধীর প্রকৃতির তবু বার বার তিনি পথের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁদের প্রেরিত যুবকটি আসছে কিনা। এদিকে দলের কিশোর ও যুবকদের কিছু খাদ্যেরও প্রয়োজন। অথচ জঙ্গলের বাইরে গিয়ে দিনের বেলায় কোন খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই এই উৎসাহী বিপ্লবীরা জঙ্গলের ভিতরেই খাদ্য সংগ্রহে লেগে গেল। তখন ছিল গাছে গাছে কচি আম। জঙ্গলের পাশে এক আম গাছ থেকে প্রায় সব আম পাড়া হল। তেঁতুল গাছ থেকে কচি তেঁতুল পাতাও অনেক সংগ্রহ করা হল। কচি আম আর তেঁতুল পাতা দিয়ে ১৯শে এপ্রিল দিনের বেলায় মহা উৎসাহে বিপ্লবীদের ভোজনপর্ব সমাধা হল।

রাতের আঁধার জঙ্গলে পাহাড়ে কিছুটা আগেই ঘনিয়ে আসে। নেতারা স্থির করলেন আবার একজনকে পাঠাতে হবে শহরে খবরের জন্য। কিন্তু এবার একা নয়, দু'জনকে পাঠাতে হবে।

প্রথমবার একা পাঠাবার ফলেই হয়ত সে বিপদে পড়েছে এই কথা ভেবে বিপ্লবী নেতারা বেশ চিন্তিত হয়েছেন। শহরের অবস্থা জানবার জন্য এবার পাঠানো হল কিশোর বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী এবং অন্য একটি বিপ্লবীকে।

শহরে একটি ছাত্রের উপর ১৯শে এপ্রিল তারিখে ইস্তাহার বিলির ভার ছিল। অমরেন্দ্র গোপনে তার কাছে এসে জানতে পারে শহরে মিলিটারী আর পুলিশের অত্যাচার শুরু হয়েছে। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ইত্যাদি চারজন বিপ্লবীর কোন সংবাদ তার কাছে পাওয়া গেল না। তবে অনন্ত সিংহের পিতা গোলাপ সিংহ, রজত সেনের পিতা স্থানীয় জর্জকোর্টের উকীল রঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ ও আনন্দ গুপ্তের পিতা যোগেন্দ্র গুপ্ত (মনাগুপ্ত) ইত্যাদিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং পরিচিত যে সব বিপ্লবীদের শহরে বাসা আছে, সেখানে বার বার পুলিশের খানাতল্লাসী চলছে। সেই সময় ঘরে অনুপস্থিত সন্দেহভাজন বিপ্লবীপুত্র বা আত্মীয়ের সংবাদ দিতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক পিতামাতা ভাই-বোন কতজন যে ইংরেজ সরকারের গোলাম ঐ সব পুলিশ মিলিটারী দ্বারা জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে অমরেন্দ্র তাদের ফিরিঙ্গি বাজার বাসায় গোপনে ওঠে। তার অভিভাবকদের সে বলে, কিছু খেয়ে সে চলে যাবে ঐ রাত্রেই। তাঁরা তাকে আর যেতে দিতে চান না। অনেক যুক্তি তাঁরা অমরেন্দ্রকে দিলেন, কিন্তু সে তার সঙ্কল্পে অটল, অবিচল তার আদর্শনিষ্ঠা। তাই তাঁরা স্থির করলেন কাছেই যখন কোতোয়ালী থানা, অমরেন্দ্র বাসায় যখন খেতে থাকবে, তার মধ্যে যদি খবর ওখানে দেওয়া হয়, তাহলে পুলিশ তাড়াতাড়ি এসে তাকে ধরে ফেলবে এবং পুলিশের হাতে পড়ে গেলে, বিপ্লবীদলের অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্যক্রমে তার যোগদানকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলে প্রথম কিছুদিন যদি তাকে জেলেও আটক রাখে ক্ষতি কি, পরে চেষ্টা করে ছাড়িয়ে আনা যাবে। কিন্তু অমরেন্দ্র ছিল অন্য

ধাতুতে গড়া। সে খেতে বসার একটু পরই টের পায় যে রাস্তায় ভারী বুটের দৌড়াবার শব্দ। তৎক্ষণাৎ সে তার গুলীভরা রিভলভারটি নিয়ে বাসার ভিতরদিক থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। একটু পরে সে পুলিশের সামনেই পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার এক পোলের তলায় আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের দিকে গুলী চালাতে থাকে। কয়েকটা মাত্র বাড়তি বুলেট তার কাছে ছিল—রিভলভারের শেষ বুলেট যতক্ষণ পর্যন্ত অমরেন্দ্রের কাছে ছিল, ততক্ষণ সে আত্মসমর্পণ করেনি। মহাভারতের সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত চট্টগ্রামের বীরবিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী লড়তে থাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত পুলিশবাহিনীর সঙ্গে। প্রাণের বিনিময়ে অমরেন্দ্র তার দেশপ্রেমের আদর্শকে অমর করে রাখে। ১৮ই এপ্রিলের পর থেকে চট্টগ্রাম বিপ্লবী-দলে অমরেন্দ্রই প্রথম শহীদ হল।

আরও একটি রাত্রি বিপ্লবী নেতাদের অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাটল। শহর থেকে কোন খবর দ্বিতীয় দফায় প্রেরিত সাথীরাও নিয়ে কেন ফিরল না, তা তাঁদের কাছে তখনও অজ্ঞাত। তাঁরা আরও কিছুটা উত্তরে ফতেয়াবাদের কাছে এক পাহাড়ে রাত্রের অন্ধকারে সকলকে নিয়ে চলে গেলেন। ২০শে এপ্রিল আর ২১শে এপ্রিল ঐ ভাবে কেবল সংবাদ পাওয়ার আশায় বিপ্লবীদের দিন কাটে পাহাড়ে পাহাড়ে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে।

এই তিনদিন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা নানা উপায় গ্রহণ করে। কাঁচা আম আর তেঁতুল পাতার কথা ত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড়ের পাশে সমতল ভূমিতে এক তরমুজ ক্ষেত ছিল। ছোট বড় মাঝারি বেশীর ভাগ কাঁচা ও সামান্য কিছু পাকা তরমুজ ছিল ঐ ক্ষেতে। ক্ষুধায় কাতর বিপ্লবীরা ১৯শে রাত্রে ঐ তরমুজ ক্ষেতের প্রায় সব তরমুজই খেয়ে ফেলে।

পরের রাত্রে ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবীরা আগের রাত্রের পরিত্যক্ত তরমুজের খোসাগুলি আবার খেতে বসে। এর ভিতরে এই দলের অন্যতম বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী একদিন চাকরের ছদ্মবেশে বিবির হাটে গিয়ে এক ঝাঁকা বিস্কুট কিনে নিয়ে আসে। অন্যতম

নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ফতেয়াবাদের এক পরিচিত বাড়ী থেকে বড় এক হাঁড়ি খিচুড়ী নিয়ে আসেন, পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে সরু জলের ধারা বয়ে আসে। তার জল দিয়ে বিপ্লবীরা পিপাসা নিবৃত্তি করে। এভাবে এই বিপ্লবীরা এক আসন্ন সংঘর্ষের জন্য তৈরী হয়।

২২শে এপ্রিল ১৯৩০। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল মোচনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার দাবী করতে পারে। ১৯৫৭ সালে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা, মোহনলাল, মীরমদনের সাহায্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বিফল হয়েছিলেন,—১৮৫৭ সালে তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসীর রাণী, চাঁদবিবি প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ শেষ মোগল সম্রাট কবি বাহাদুর শাহ্‌কে সামনে রেখে, ব্যারাকপুরের সিপাহী নায়ক মঙ্গল পাণ্ডে দ্বারা প্রথম প্রজ্জ্বলিত যে বিদ্রোহের আগুনকে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন, তাও শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ব্যর্থ করে দেয়। ১৯১৫ সালে বালেশ্বরের বালুচরে বাঘা যতীন সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেন, কিন্তু ইংরেজরা পরাজিত হয় না। ২২শে এপ্রিলের এই সংগ্রামে সম্মুখ যুদ্ধে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৩ বৎসর পরে ইংরেজ শাসনে এই প্রথমবার চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবী যোদ্ধারা, ইংরেজ সরকারের সৈনিকরা সংখ্যায়, বয়সে, অস্ত্রে এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও শোচনীয়ভাবে তাদের পরাজিত করে। চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জালালাবাদ পাহাড়ে সেই দিন শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের যে বিরাট মর্যাদাহানি ঘটেছিল, তার ফলে সারা দেশের মানুষ নতুন সাহস ও ভরসা নিয়ে, গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। তাই স্বাধীনতার জন্য পলাশী থেকে শুরু করে বহু বিফল সংগ্রামের পরে সর্বপ্রথম এই যোগ্য সফল প্রতিশোধ গ্রহণ করে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা অমর হয়ে আছে।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে নেতাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, অন্যতম দুই প্রধান নেতা নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী এবং অন্যতম নেতা লোকনাথ বল। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ অন্য দুইজন বিপ্লবী সাথীকে নিয়ে তখনও ফিরে আসতে পারেন নি। অথচ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের এই অমর

মুহূর্তে বার বার এই দুইজন তরুণ নেতার অভাব এঁদের মনকে পীড়িত করছিল।

কিশোর ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণার প্রতীক এই দুই নেতার অবর্তমানে জালালাবাদ সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন দিলেন বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বলের উপর। ক্ষুদ্র এই জালালাবাদ পাহাড় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবী যোদ্ধাদের বিজয় ও আত্মদানের স্মৃতি নিয়ে সমুন্নত হয়ে আছে। সেই সংগ্রামের কথা বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বলের নিজের ভাষায়ই দেওয়া হল:

*২২শে এপ্রিল ভোরবেলা আমরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হয়। তারপর তিনদিন বিভিন্ন পাহাড়ে আমাদের দিন কাটে। এ কয়দিন এক রকম অনাহারেই আমাদের থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের কাঁচা আম, তেতুলপাতা, দু'একখানা চুরি করে কিনে আনা বিস্কুট আর একবেলা সামান্য খিচুড়ি আর ঘোলা জল এই খেয়েই আমাদের গত চারদিন কাটাতে হয়েছে।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে উঠবার সময় বহু গ্রামবাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল। তখনই আমরা সন্দেহ করেছিলাম যে হয়ত পুলিশ আমাদের সংবাদ পেয়ে যাবে। তাই একটা চরম হিসাব নিকাশের জন্য আগে থেকেই সেদিন আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম। অবশ্য প্রস্তুত হয়েছিলাম বললে কথাটা ঠিক বলা হবে না। তিনদিনের অভুক্ত, দীর্ঘপথ অতিক্রম করার ফলে পরিশ্রান্ত—আমরা তখন একরকম মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম।

বেলা অনুমান পাঁচটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষী বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি করে উঠল। যে যেখানে ছিলাম ছুটে এসে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখলাম, একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে

* স্বাধীনতা সংখ্যা 'যুগান্তর', ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ইং "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

আমাদের পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। সৈন্যবাহিনী যখন আমাদের রাইফেলের গুলীর পাল্লার ভিতর এসে পড়ল, তখন মাষ্টারদার আদেশে আমি গুলী-বর্ষণের নির্দেশ দিলাম। আমাদের গুলীবর্ষণের শুরুতেই সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে তারা পেল ছোট একটি খাল (চট্টগ্রামী কথ্য ভাষায় বলে "ছড়া") সেই খালে তখন জল ছিল না বললেই হয়।

সেই খালের মধ্যে তারা আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলী বর্ষণের পাল্টা জবাব শুরু হল। অনুমান পনর মিনিট গুলী বিনিময়ের পর আমরা হঠাৎ লুইসগানের গুলীবর্ষণের আওয়াজ পেলাম।

প্রথমেই আমার ছোট ভাই টেগরা (হরিগোপাল বল) আহত হয়ে পড়ে গেল। সে রক্তাপ্লুত অবস্থায় আমাকে বলল, 'সোনাভাই' আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর,' লুইসগানের গুলীবর্ষণ ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠল, দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাসগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো আহত হয়ে পড়ে গেল—তাদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি—জাতির পরাধীন-তার, জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হ'ল স্বাধীনতাকামী তরুণ শিশুদের রক্তে।

তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সরকারী সেনাবাহিনীর দিক থেকে তিনবার হুইসেলের আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গুলীবর্ষণের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সবাই লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদের গুলীবর্ষণ আরম্ভ হ'ল। আমাদের "বন্দেমাতরম" ও "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে তখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। একদিকে তিন দিনের অভুক্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত জন পঞ্চাশেক বিপ্লবী (আমাদের অধিকাংশই ছিল পনের ষোল বছরের বালক) অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ রণবিদ্যায় পারদর্শী গভর্ণমেণ্টের বাছাই করা সৈন্যবাহিনী।

পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের সেদিনকার জয়লাভ কম গৌরবের কথা নয়। জালালাবাদের শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে, তাদের প্রাণ দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে সেদিন প্রমাণ করেছিল—"ভারতবর্ষের তরুণরা কাপুরুষ নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতির কলঙ্ক-কালিমা মুছে ফেলার জন্য হাসিমুখে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে।"

২২শে এপ্রিল বিকাল ৪টা থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে চট্টগ্রাম নাজিরহাট শাখা রেল লাইনের 'ঝরঝরিয়া বটতল' মসজিদের পাশে এসে যখন একখানা সশস্ত্র রেলগাড়ী এসে থামল, তখন বিপ্লবীরা বুঝতে পারল, বিরক্তিকর এই ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিনের পর দিন পাহাড় পরিক্রমণ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রতীক্ষা করার অবসান এইবার ঘটল। এই সশস্ত্র রেলগাড়ী থেকে 'ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস' আর সুর্মা ভ্যালী 'লাইট ইনফেন্ট্রি' এই দুইটি সেনাবাহিনীর প্রায় ৭৫০ জন সৈনিক রাইফেল নিয়ে নামে।

এখানে বলা দরকার ধুম ষ্টেশনের কাছে লাঙ্গলকোটে ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবী পরিকল্পনার অন্যতম কাজ হিসাবে রেললাইনের 'ফিসপ্লেট (দুইটি রেল-এর যোগাযোগকারী লৌহার টুকরা) তুলে দেওয়া হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামে স্থানীয় পুলিশবাহিনী বা স্বেচ্ছাসৈনিকদের হাত থেকে বিপ্লবীদের ক্ষমতা দখলের পরে যেন তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে কোন সশস্ত্র সেনাবাহিনী না আসতে পারে। রেললাইন তুলে ফেলার জন্য দুই দলে যেই বিপ্লবীদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা হলেন:

উপেন ভট্টাচার্য, লালমোহন সেন, সুকুমার ভৌমিক, হারাণ দত্ত চৌধুরী, সুবোধ মিত্র, শংকর, সুশীল দে ও বিজয় আইচ। কিন্তু যেদিন রাত্রে (১৮ই এপ্রিল) রেললাইন বিপ্লবীরা তুলে দেয়, তার কয়েক ঘণ্টা পরই একটি মালগাড়ী ঐখানে লাইনচ্যুত হয় এবং রেল কর্তৃপক্ষ পরদিনই লাইন মেরামত করে ফেলে এবং বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯শে এপ্রিল ভোরের দিকে বিনাতারে চট্টগ্রামে বৃটিশ শাসনের চরম বিপর্যয়ের সংবাদ পাবার পরই ঢাকা থেকে দ্রুত প্রেরিত হয়—"ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস"-এর কয়েক শত সৈন্য এবং আগরতলা থেকে আনা হয় 'সুর্মা ভ্যালী লাইট্ ইনফেন্ট্রি' সেনাদল।

চট্টগ্রামের শাসন কর্তৃপক্ষ এই দুই বাহিনীর প্রায় আট নয়শত পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য এনে হাজির করার পরই তারা বেশী সাহসী হয়ে ওঠে এবং এদের সাহায্যে বিপ্লবীদের সঙ্গে সামনাসামনি মোকাবেলা করার মত সাহস অর্জন করে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন থেকে সারা অবিভক্ত বাংলায় যেমন সরকার খ্যাতনামা ও অখ্যাত দেশপ্রেমিকদের বিনাবিচারে আটক, খানাতল্লাসী করা ইত্যাদি শুরু করে, অন্যদিকে বিদেশী কুশাসনে দরিদ্রকৃত দেশবাসীকে প্রলুব্ধ করার জন্য খুব বেশী টাকার পুরস্কার থেকে শুরু করে অল্প টাকার বিভিন্ন পুরস্কার তারা বড় বড় দেওয়াল বিজ্ঞপ্তি মারফত সারা শহরে প্রচার করে। সূর্য সেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বল—এই ছয়জনের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এদের পরবর্তী স্তরের যারা নেতা ও অন্যান্য বিপ্লবীদের জন্য হাজার টাকা থেকে সর্বনিম্ন আড়াই শত টাকা পর্যন্ত পুরস্কার সরকার বিপ্লবীদের ধরে দেবার জন্য ঘোষণা করে। সূর্য সেন ও অন্যান্য যেসব বিপ্লবীর ফটো পুলিশের কাছে ছিল, তাদের ফটো দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে এবং পুলিশ গেজেটে প্রতি সপ্তাহে সেই সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। তবে দেশের মানুষ কেমন করে অন্তরের সমস্ত মমতা ও দরদ দিয়ে এই সব বীর যোদ্ধাদের রক্ষা করেছে তার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হবে।

২২শে এপ্রিল ১৯৩০ তারিখ ভোরে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে এসে পৌঁছায়। তার আগের দিন পর্যন্ত কাছাকাছি গ্রামের কেউ তাদের ঐভাবে পাহাড়ে অবস্থানের বিষয় জানত না। তবে ঐ বিরাট ঘটনা সম্পর্কে সারা জেলায় হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের ভিতরে সব সময় আলোচনা চলছে, নিজেদের জেলার এই সব সাহসী যোদ্ধাদের জন্য সকলে গৌরববোধ করছে এবং গোপনে গোপনে অভিনন্দিতও করছে! আর পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারের খবরও এর মধ্যে কিছু কিছু লোকের জানা হয়ে গেছে!

জালালাবাদ পাহাড়টি একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় নয়! চট্টগ্রাম পাহাড়ী জেলা। শহরেও অনেক পাহাড় আছে। শহরের উত্তর দিকে

ষোলশহর থেকে পাহাড়ের সারি উত্তরে ফতেয়াবাদ পর্যন্ত গিয়ে কুমিরার দিকে সীতাকুণ্ড পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গে যোগ হয়ে গেছে। এসব পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে সমতল জমিতে ধান হয়। কোথাও বিরল বসতিও আছে। এই পাহাড়ের কাছাকাছি গ্রামের হিন্দু-মুসলিম গরীব অধিবাসীদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার যায়গা হল এই সব পাহাড়।

২২শে এপ্রিল সকালে বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে বসে বিশ্রাম করছিল, তখন কয়েকজন কাঠুরিয়া ঐ পাহাড়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার জন্য ওঠে। কাছাকাছি সব পাহাড়ের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উঁচু। সরল এই সব গ্রামের লোক দেখল খাকী পোশাকের রাইফেলধারী সব বালক-যুবক কেউ বসে, কেউ বা শুয়ে গল্প করছে। তারা তাড়াতাড়ি নীচে ফিরে গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশনের আনন্দে বলে যে, স্বদেশীরা ঐ পাহাড়ে আছে। কোন পুরস্কারের লোভে যে তারা ঐ খবর বলেনি, তা বলাই বাহুল্য। নিছক বিস্ময়, গৌরববোধ ও কিছুটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকেই তারা নিজ প্রতিবেশীর কাছে খবর দিয়েছিল। পরে ঐ খবর পুলিশের কাছে গেলেই, ঠিক জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে এসে মিলিটারী সশস্ত্র রেলগাড়ী (আর্মড ট্রেন) থামে। ঝরঝরিয়া বটতলী চট্টগ্রাম-হাটহাজারী মোটর রাস্তার উপর কয়েকটি দোকান ও একটি মসজিদ নিয়ে বেশ পরিচিত একটি বসতি। বড় রাস্তার উপর যে মসজিদ, তা অনেক দিনের প্রাচীন। বড় রাস্তা থেকে ঐ মসজিদের পাশ দিয়ে একটি পায়ে চলা পথ পাশের চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রেলওয়ে লাইন পার হয়ে এগিয়ে গেছে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে। এখান থেকে পঁচিশ গজের মত ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে সব চেয়ে যে উঁচু পাহাড়টি দেখা যাবে, সেটাই শহীদ স্মৃতিপূত জালালাবাদ পাহাড়। বর্তমানে জালালাবাদ পাহাড়টি সামরিক ছাউনি এলাকায় (মিলিটারী ক্যাণ্টনম্যাণ্ট এরিয়া) পড়েছে।

---

* এই কারণেই লেখকের ২৩-৯-৫৬ ইং তারিখের পূর্ব পাক পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১২ জন জালালাবাদ শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ ঐ জালালাবাদ পাহাড়ের উপরে করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যায় নাই। সরকার বিকল্পস্থানে ঐ স্মৃতিস্তম্ভ করার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু তার পূর্বেই সরকার পরিবর্তন হওয়ায় তা এখনও কার্যকরী হয়নি।

জালালাবাদ পাহাড়ে যখন এই বিপ্লবীরা কেউ রাইফেল পরিষ্কার করছে, তিন প্রধান ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, তখন উঁচু গাছের ডালে দু'তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর নিয়মিত পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বিপ্লবীরা ভোলেনি। গাছের ডালে অপেক্ষমান ঐ বিপ্লবী-শান্ত্রী সবার আগে দেখতে পায় যে, সামরিক রেলগাড়ীখানা কোন ষ্টেশন না থাকা সত্ত্বেও অদূরে রেললাইনের উপর থেমে গেল। তখনই সে সাবধানসূচক ধ্বনি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিগত তিন চার দিনের ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট সব ভুলে গিয়ে বিপ্লবীরা তৈরী হয়ে গেল তাদের জীবনের সাধ মিটাবার জন্য। তারা ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীনের কথা পড়েছে, তীতুমীরের কাহিনী, ডি-ভ্যালেরা, মাইকেল কলিনস, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডীর কথা জেনেছে—দেশের জন্য তাদের আত্মত্যাগের কথা জেনে প্রেরণা পেয়েছে। আজ সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে নতুন এক উন্মাদনা, সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার এই স্বর্ণ সুযোগ। নিজের মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য হেলায় মরণকে বরণ করার জন্য তারা শিক্ষা পেয়েছে, মনকে তৈরী করে নিজ নিজ মা-বাবা ও অন্যান্য প্রিয়জনদের কাছ থেকে চারদিন আগে তারা হাসি মুখে বিদায় নিয়ে এসেছে। আজ বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মহান মুহূর্ত সমাগত। তাই নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই তৈরী হয়ে গেল।

দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক গাড়ী থেকে নেমে আসছে দলে দলে সৈন্য। জালালাবাদ পাহাড়ের নীচে পূর্বদিকে খালি ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসতেই পাহাড়ের নীচে ঝোপের আড়াল থেকে এক ঝাঁক গুলী দিয়ে বিপ্লবীরা তাদের অভিনন্দন জানায়। বিপ্লবীরা পাহাড়ের উপরে থাকায় তাদের অনেক সুবিধা হয় কারণ তার ফলে সৈন্যরা তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন আন্দাজই করতে পারে না। যারা চারদিন আগে সারা শহর থেকে বৃটিশ শাসনকে লুপ্ত করে দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা যে এত কম, তার সংবাদ অনেকদিন পরে ইংরেজ শাসকরা জানতে পারে। ঝোপের আড়াল থেকে ঐ ভাবে অকস্মাৎ গুলীর আঘাতে সৈন্যদল বিভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। আবার অধিনায়ক তাদের নিয়ে এগিয়ে আসে এবং পাহাড়ের

দিকে গুলী ছুঁড়তে থাকে। এভাবে উভয়পক্ষের গুলী বিনিময় চলে কিছুক্ষণ। সৈন্যরা তারপর জালালাবাদ পাহাড়ের পূর্বদিকে যেই ছোট একটি পাহাড় আছে, তার উপরে লুইসগান বসিয়ে বিপ্লবীদের দিকে গুলীবর্ষণ করে। প্রতি মিনিটে ৩৫০টি গুলী নিক্ষিপ্ত হতে লাগল জালালাবাদ পাহাড় লক্ষ্য করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সৈন্যরা এই পাহাড়ে আসেনি, ততক্ষণ বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ হতাহত হয়নি। তবে গাড়ী থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে যখন সৈন্যরা এগিয়ে আসছিল, তখন বিপ্লবীদের প্রথম আকস্মিক আক্রমণে কয়েকজন সৈন্য আহত হয়। পাহাড়ের দুই চূড়ায় বসে এবার দুইদল পরস্পরকে পরাভূত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম শুরু করে।

এই সংগ্রামে বিরোধী দুই দলের মধ্যে বিপ্লবীরা বয়সে তরুণ। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স চৌদ্দ থেকে পনের। রাইফেল শিক্ষা তাদের ১৮ই এপ্রিলের পূর্বে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ বেসরকারী কোন ব্যক্তিকে তখন রাইফেলের লাইসেন্স দেওয়া হত না। বিপ্লবীদের অস্ত্রশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল পিস্তল, রিভলভার, কার্টুজ বা গাদাবন্দুক আর বোমানিক্ষেপ শিক্ষার মধ্যে। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে পাহাড়তলী ও পুলিশ ব্যারাক অস্ত্রাগার দু'টি দখল করার পরই এই ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে গঠিত বিপ্লবী বাহিনীর রাইফেলে হাতেখড়ি হয়। তারপর থেকে গত চারদিন পাহাড়ে পাহাড়ে লুক্কায়িত থাকার সময় তাদের আর রাইফেল দিয়ে গুলী চালনার কোন অভ্যাস করা সম্ভব হয় নি। তবু তীব্র দেশপ্রেম আর আত্মদানের গভীর আগ্রহের ফলে এই তরুণ বিপ্লবীরা বুকের উপর শুয়ে সৈন্যদের লুইসগানের গুলীবর্ষণের জবাব দিচ্ছিল। তিন প্রধান নেতা, সূর্য সেন, নির্মল সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী, সঙ্গে থেকে ঘন ঘন তাদের উৎসাহিত করছেন, গুলী এগিয়ে দিচ্ছেন। নির্মল সেন রাইফেল কোনটা আটকে গেলে তাতে তেল দিচ্ছেন, গুলীর বাক্স টেনে নিয়ে আসছেন। কারণ লুইসগানের অবিরাম গুলী বর্ষণের সঙ্গে তাল মিলাতে হবে।

এই সময় টেগরা (হরিগোপাল বল) সর্বপ্রথম গুরুতরভাবে আহত হয়। জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম বলী এই ছাত্রটির বয়স তখন মাত্র

ষোল-সতর। কিন্তু মৃত্যুবরণ করার সময়ও সে আদর্শভ্রষ্ট হয়নি, একটুও বিচলিত হয়নি। তার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিপ্লবীনেতা লোকনাথ বল অদূরে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। উপরে তাঁর নিজস্ব বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, মৃত্যু টেগরাকে যেমন দুর্বল করতে পারেনি তেমনি তার সহোদরকেও কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। বরং টেগরার গুলীবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা আরও বেশী তীব্রভাবে গুলী চালাতে থাকে, ক্রমে বিপ্লবীদের মধ্যে আরও আহত হতে থাকে।

এই সময় একটি বড় সমস্যা উপস্থিত হয়। লুইসগানের অবিরাম গুলীবর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না বিপ্লবীরা, কারণ রাইফেলের ম্যাগজিনে গুলী ফুরিয়ে গেলে তা খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ের বিভিন্ন যায়গায় ছড়ানো বিপ্লবীদের কাছে পোঁছে দেওয়া দরকার হয়। তখন অধিনায়ক লোকনাথ বল আহ্বান করেন, গুলীবর্ষণের ভিতরে গুঁড়ি মেরে নিজেকে সাবধান রেখে কে সকলকে গুলী সরবরাহ করতে পারবে। নিজের রাইফেলটি পাশে রেখে অর্ধেন্দু দস্তিদার বলে, সে সকলকে গুলী দিয়ে আসবে। এই কাজ করতে গিয়ে কিছুক্ষণ পর সেও আহত হয়। এ ঘটনাটি সম্পর্কে বিপ্লবীনেতা লোকনাথ বল লেখককে বলেছেন।

যতই বিপ্লবীরা আহত বা নিহত হচ্ছে, ততই তাদের প্রতিশোধের ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে উঠছে। মাষ্টারদা গুঁড়ি মেরে বিভিন্ন বিপ্লবী যোদ্ধাকে সাবধান করছেন কিছু আড়াল যেন তারা নেয়। অম্বিকা চক্রবর্তী এ সময় গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়লেন। তিন প্রধান নেতার মধ্যে জালালাবাদে ইনিই আহত হয়েছিলেন। এইভাবে মৃত ও আহত সাথীদের পাশে রেখে বিপ্লবীরা সন্ধ্যার পর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটায় ওদের লুইসগান হঠাৎ থেমে গেল এবং সরকারী সৈন্যদের দিকে পর পর কয়েকটি হুইশেল শোনা গেল। বিপ্লবীরা লক্ষ্য করল, ঐ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সুশিক্ষিত সেনাদল প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন শুরু করেছে। ভাড়াটিয়া এই সৈন্যরা আমাদের দেশেরই গরীব কৃষক মধ্যবিত্তের সন্তান; পেটের দায়ে ফৌজে যোগ দিয়েছে। ইংরেজ শাসন রক্ষার জন্য তাদের আদেশে বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে এরা লড়তে এসেছিল। এরা জানত না যে,

তাদেরই দেশের মুক্তি যোদ্ধারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছে, তার ফলে যে আজাদী আসবে তার সুফল তারাও পাবে—তাই নিজের দেশের মুক্তিকামী ভাইদের কাছে পরাজিত হয়ে তারা প্রাণভয়ে পলায়ন করতে থাকে। এই সময় বিপ্লবীরা তাদের উপর আরও গুলী চালায় এবং জয় নিশ্চিত জানবার পর "বন্দে মাতরম" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। অদূরে প্রতীক্ষারত সামরিক রেলগাড়ীখানা যখন চলে গেল তখন বিপ্লবীরা নিজেদের নিষ্প্রাণ সাথীদের সব এক যায়গায় নিয়ে এল। সবাইকে পাশাপাশি রাখা হল। তখন যাদের মৃত মনে করা হয় তারা হচ্ছেন:

(১) অম্বিকা চক্রবর্তী
(২) নির্মল লালা
(৩) হরি গোপাল বল (ডাকনাম, 'টেগরা')
(৪) নরেশ রায়
(৫) বিধু ভট্টাচার্য
(৬) প্রভাস বল
(৭) জিতেন দাসগুপ্ত
(৮) অর্ধেন্দু দস্তিদার
(৯) ত্রিপুরা সেন
(১০) পুলিন ঘোষ
(১১) শশাঙ্ক দত্ত
(১২) মধু দত্ত
(১৩) মতি কানুনগো

রণক্লান্ত বিপ্লবী যোদ্ধারা তারপর বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই নীরব, নিষ্প্রাণ সহযাত্রীদের কাছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় তাদের শেষ অভিবাদন জানায়। শহীদদের আত্মদান ও চরম ত্যাগের কথা এরা আগে বইতে পড়েছিল, গল্প শুনেছিল, কিন্তু আজ চোখের সামনে সকলে একসঙ্গে লড়তে গিয়ে তারা প্রত্যক্ষ করল নিজেদের

সহযাত্রীর এই মহান মরণ। অশ্রুহীন চোখে তারা শেষবার বীর সাথীদের দেখে জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করল। এই যুদ্ধের প্রথম শহীদদের শেষ বাণী, অন্তিম অনুরোধ, তাদের কানে আর মনে বাজে—তোমরা লড়ে চল শত্রুর সঙ্গে।

যাবার সময় গুলিতে আহত, বিনোদ চৌধুরী* ও বিনোদ দত্তকে তাদের কাঁধে নিয়ে পাহাড় থেকে নামানো হয়। উপরোক্ত ১৩ জন ছাড়া আর সব বিপ্লবী রাতের আঁধারে আহত সহযাত্রীদের নিয়ে অন্য পাহাড়ের দিকে ধীরমন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। জালালাবাদের এই স্মরণীয় ও সফল-সংগ্রামে যেই সব বিপ্লবী যোদ্ধা ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারী সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল, তাদের পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

১। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন	বয়স ৩৫—জন্মস্থান নয়াপাড়া, থানা—রাউজান, চট্টগ্রামের অধুনালুপ্ত উমাতারা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
২। নির্মল সেন	বয়স ৩৩—কোয়েপাড়া, থানা—রাউজান, প্রধান তিনজন নেতার অন্যতম।
৩। অম্বিকা চক্রবর্তী	বয়স ৩৪—দেওয়ানপুর, থানা—রাউজান, প্রধান তিনজন নেতার অন্যতম।
৪। গণেশ ঘোষ	বয়স ২৫—যশোহরে পৈত্রিক বাড়ী, কিন্তু চট্টগ্রামেই বড় হয়েছিলেন। পিতা প্রথমে রেলে চাকুরী করতেন। ১৯২২-এর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে যোগ দেন, পরে আর সেই কাজে যোগ না দিয়ে সদরঘাটে "স্বদেশী বস্ত্রালয়" নামে কাপড়ের দোকান খোলেন—ঐ বাড়ীতেই পুলিশ পরে 'মবিলিজেশন লিষ্ট' পায়।

* শ্রীবিনোদ চৌধুরী—বৃটিশ শাসনামলে হিজলী ও দেউলী আটকখানায় বহু বৎসর আটক ছিলেন। ১৯৪৮—৫৪ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

৫। অনন্তলাল সিংহ	বয়স ২৪—কয়েক পুরুষ আগে উত্তর ভারত থেকে এঁদের পরিবার বাংলায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে থাকেন। বাসা শহরে ছিল তামাকুমণ্ডী—বর্তমানে তাঁর পিতার নামে ঐ গলির নাম গোলাপ সিংহ লেন।
৬। লোকনাথ বল	বয়স ২৩—ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
৭। উপেন ভট্টাচার্য	বয়স ৩৪—বেতাগী, রাঙ্গুনীয়া থানা, চট্টগ্রাম।
৮। মধু দত্ত	বয়স ২৬—বিদগ্রাম, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
৯। নরেশ রায়	বয়স ২০—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।
১০। বিধু ভট্টাচার্য	বয়স ২০—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।
১১। লালমোহন সেন	বয়স ২১—সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।
১২। অর্ধেন্দু দস্তিদার	বয়স ১৯—ধলঘাট, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
১৩। হেমেন্দু দস্তিদার	বয়স ১৫—ধলঘাট, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
১৪। হিমাংশু সেন	বয়স ১৫—সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, শহরেই চন্দনপুরায় থাকত।
১৫। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী	বয়স ২০—বাড়ী কোয়েপাড়া হলেও কক্সবাজারে আইনজীবি পিতার কাছেই বড় হয়ে উঠেছিল এবং কক্সবাজারেই বিপ্লবী দলে যোগ দেয়।
১৬। নির্মল লালা	বয়স ১৪—সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী, বাড়ী যদিও হাওলা গ্রামে বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম,

	তার আত্মীয়ের সঙ্গে সে কক্সবাজার থাকত এবং সেই সময় কক্সবাজার স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ত। সে খুব বেশী জোর করে যে সেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে, তাই এত ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও সূর্য সেন তাকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেন।
১৭। দেবপ্রসাদ গুপ্ত	বয়স ১৮—প্যারেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা রাজেশ্বর গুপ্তের পৌত্র, বর্তমানেও যে ব্রাহ্মমন্দিরটি আছে। তার পিছনে টিলার উপর তাঁদের সুন্দর বাড়ী, এঁরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসেন এবং দেব প্রসাদের পিতার জন্মও চট্টগ্রামে।
১৮। আনন্দ গুপ্ত	বয়স ১৬—দেবপ্রসাদের ছোট সহোদর ভাই।
১৯। মণীন্দ্র গুহ	বয়স ২০—ভাটিখাইন, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
২০। সহায়রাম দাস	বয়স ১৭—রাণাঘাট, রহমতগঞ্জে তার কাকা কো-অপারেটিভ রেজিষ্ট্রারের বাসায় থাকত।
২১। প্রভাস বল	বয়স ১৮—ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
২২। ফণীন্দ্র নন্দী	বয়স ১৭--দক্ষিণ ভূষি, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
২৩। রজত সেন	বয়স ১৬-কোয়েপাড়া, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।
২৪। ত্রিপুরা সেন	বয়স ১৬—ঢাকা, চট্টগ্রামে পিতা চাকুরী করতেন, বাসা ছিল সদরঘাট।
২৫। দ্বিজেন্দ্র দস্তিদার (শঙ্কু)	বয়স ১৮—পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা, চট্টগ্রাম।
২৬। বিধু সেন	বয়স ১৯—পৈতৃক বাড়ী বোয়ালখালী থানার শাকপুরা, তবে জন্ম ও কর্মস্থল কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।

২৭।	মনোরঞ্জন সেন	বয়স ১৮।
২৮।	কালিপদ চক্রবর্তী	বয়স ২০—সারোয়াতলী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
২৯।	শশাঙ্ক দত্ত	বয়স ১৮—সারোয়াতলী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
৩০।	নারায়ণ সেন	বয়স ১৮—ঢাকা, চাকুরে পিতার সঙ্গে দেওয়ান বাজার যোগেশ বাবুর পুকুর পাড়ে (বর্তমান ঈশ্বর নন্দী লেন) থাকত। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে পলাতক, পুরস্কার ঘোষণা সত্বেও ধরা পড়ে নাই এবং সেই সময়ের কিছু পর থেকে অন্য নাম গ্রহণ করে স্কুলে শিক্ষকতা করছিল বলে জানা যায়।
৩১।	স্বদেশ রায়	বয়স ২০—ঢাকা, পল্টনের (সার্কিট হাউস যেখানে আছে) দক্ষিণে যে বড় রাস্তা তার পাশে তার চাকুরে আত্মীয়ের সঙ্গে শৈশব থেকে থাকত, ১৯২৫ ইং চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়ছিল।
৩২।	সৌরিন্দ্র দত্ত চৌধুরী	বয়স ২০--দুর্গাপুর, মীরেশ্বরী থানা, চট্টগ্রাম।
৩৩।	সুকুমার ভৌমিক	বয়স ২০—মীরেশ্বরী থানা, চট্টগ্রাম।
৩৪।	সুরেশ দেব	বয়স ১৭—ঢাকা, বক্সীরহাটে মুদীর দোকানে পিতার সঙ্গে থাকত।
৩৫।	সুবোধ চৌধুরী	বয়স ১৮—পৈতৃক বাড়ী বর্ধমান, চট্টগ্রাম রেলের চাকুরে পিতার সঙ্গে পাহাড়তলী রেল কোয়ার্টারে থাকত।
৩৬।	অমরেন্দ্র নন্দী	বয়স ১৭--দক্ষিণ ভূর্ষী, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
৩৭।	বিনোদ চৌধুরী	বয়স ১৯—উত্তর ভূর্ষী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৩৮। মহেন্দ্র চৌধুরী — বয়স ১৯--মোহরা, পাঁচলাইশ থানা, চট্টগ্রাম।

৩৯। নিতাই ঘোষ — বয়স ১৭--যশোহর জেলায় পৈতৃক বাড়ী, রেলওয়ে চাকুরে পিতার সঙ্গে পাহাড়তলী রেলকোয়ার্টারে থেকে পড়ত।

৪০। সুধাংশু বোস — বয়স ১৭--পরৈকোড়া, চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা "বোস ব্রাদার্সের" অন্যতম মালিকের পুত্র, অস্ত্রাগার দখলের ১৬ বৎসর পর, ব্রহ্মদেশে পলাতক থাকার পর স্বেচ্ছায় বাড়ীতে আসায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে, কিন্তু পরে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়।

৪১। মতি কানুনগোয় — বয়স ১৯—শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৪২। জিতেন দাশগুপ্ত — বয়স ২০—গৈরলা, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৪৩। পুলিন ঘোষ — বয়স ১৯—গোঁসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা, চট্টগ্রাম।

৪৪। রণধীর দাশগুপ্ত — বয়স ১৬—পরৈকোড়া, তবে শহরেই পিতা প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত জয়ন্ত কবিরাজের বাসা আন্দরকিল্লায় থেকে পড়ত।

৪৫। দীপ্তি মেধা চৌধুরী — বয়স ১৮—শাকপুরা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৪৬। বিনোদ দত্ত — বয়স ১৮—মঠপাড়া, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৪৭। হরিপদ মহাজন — বয়স ১৭—জন্মস্থান বীণাজুরী, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।

৪৮। সুবোধ রায় — বয়স ১৭—নয়াপাড়া, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।

৪৯। বনবিহারী দত্ত	বয়স ১৮—খরন্দ্বীপ, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
৫০। ফকীর সেন	বয়স ১৭—ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম।
৫১। শান্তি নাগ	বয়স ১৬—ত্রিপুরা জেলা, তবে বক্সীর-হাটে নিজের পিতার মুদীর দোকানে থেকে পড়ত।
৫২। সরোজ গুহ	বয়স ১৯—শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
৫৩। ভবতোষ ভট্টাচার্য	বয়স ১৮—আনোয়ারা, সদরঘাট কালী-বাড়ীর সেবায়েতের পুত্র, ঐখানে থেকে পড়ত।
৫৪। হরি গোপাল বল (টেগরা)	বয়স ১৬—ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।
৫৫। কালীকিংকর দে	বয়স ২০—গোঁসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা, চট্টগ্রাম।
৫৬। ক্ষীরোদ বানার্জী	বয়স ১৭—ঢাকা, পাহাড়তলী রেলওয়ে কোয়ার্টারের ছাত্র।
৫৭। সীতারাম বিশ্বাস	বয়স ১৮—সারোয়াতলী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম (তারিণী মুখার্জী হত্যা মামলায় যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ১৯৩১-এ আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসী হয়, তার ছোটভাই)।
৫৮। বীরেন দে	বয়স ১৭—গুয়াতলী, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
৫৯। অশ্বিনী চৌধুরী	বয়স ১৮—কানুনগোয়পাড়া, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৬০। নিরঞ্জন রায়	বয়স ২০—পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা, চট্টগ্রাম।
৬১। শঙ্কর	বয়স ১৬—দুর্গাপুর, মীরেশ্বরী থানা, চট্টগ্রাম।
৬২। ননী দেব	বয়স ১৮—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম বক্সীরহাটে পরিবারের দোকানে থাকত।
৬৩। কৃষ্ণ চৌধুরী	বয়স ১৭—কেলীশহর, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

দশ

নিজেদের পরমপ্রিয় তেরজন সাথীকে জালালাবাদ পাহাড়ে চিরকালের জন্য রেখে অবশিষ্ট বিজয়ী বিপ্লবীরা ভবিষ্যতে আরও সংগ্রাম এবং বিজয়লাভের আশায় সেইদিন রাত প্রায় ৯টায় জালালাবাদ পাহাড় থেকে বিদায় নিল। এই সময় যে কয়জন সাথী আহত হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের রণশ্রান্ত দেহে বিপ্লবীদের বহন করতে হল। ক্লান্তি অসহ্য হওয়া সত্বেও আহতদের আনন্দের সঙ্গেই ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিপ্লবীরা। যদিও এতক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে সব কাজ চলেছে, জালালাবাদ পাহাড়ের খণ্ড সংগ্রামে বিজয়লাভের গৌরব অর্জন করার পর, রাত্রে সেই সংগ্রামেরই পরবর্তী রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে যে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত...তা সঠিক ভাবে পালিত হয়নি। এমন গৌরবজনক বিজয়ের পরে জালালাবাদ পাহাড় থেকে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে চলে আসবার সময় সমগ্র দলটি একসঙ্গে থাকতে পারেনি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা ঘটনা ও কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এর পরে অবশিষ্ট ৫০ জন বিপ্লবীর কারও কারও মধ্যে দুর্বলতা এসে যায়। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন বা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের কাছে কোন অনুমতি না নিয়ে, নিজের মৃত্যুপথযাত্রী সাথীদের কাছে পর্যন্ত নিজের দুর্বলতা গোপন রেখে, জালালাবাদ পাহাড় থেকে ২২শে এপ্রিলের গৌরবোজ্জ্বল রাত্রিতে অনেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ পরিবারের মায়ায় অথবা ভবিষ্যতের কঠোরতর সংগ্রামে নিজেদের অক্ষমতা বা ভয়ে কিছু বিপ্লবী দল ছেড়ে চলে যায়। তাদের কেউ কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, কারও অভিভাবক নিজেই নিয়ে তাদের থানায় দিয়ে আসে সরকারী অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়।

জালালাবাদ থেকে যারা সেদিন বিদায় নিয়েছিল, তাদের পরবর্তী কাহিনী আপাততঃ স্থগিত রেখে যে তেরজনকে জালালাবাদের চূড়ায়

মুক্ত আকাশের তলায় বিপ্লবীরা পাশাপাশি শুইয়ে রেখে গেল, এখন তাদের কথা বলি।

ঐ তেরজনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তিনজন ছিল গুরুতর আহত এবং আঘাতে ও রক্তক্ষয়ের ফলে সংজ্ঞাহীন। তাই বিপ্লবী নেতারা তাদের পরীক্ষা করে মৃত বলেই সাব্যস্ত করেন এবং অন্য মৃতদের সঙ্গে রেখে যান। কয়েক ঘণ্টা পরে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে তাদের সংজ্ঞা ফিরে আসে। তাদের নাম অম্বিকা চক্রবর্তী, মতি কানুনগোয় আর অর্ধেন্দু দস্তিদার। এর মধ্যে অল্প বয়সের শেষোক্ত দুইজন পরস্পর থেকে কিছুটা দূরে ছিল এবং অম্বিকা চক্রবর্তী ছিলেন একটু বেশী দূরে পাহাড়ের ঢালুর শেষ প্রান্তে। সংজ্ঞা লাভ করার পর তিনি শুনতে পেলেন তাঁর ঐ দুই তরুণ সহযাত্রী তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে "জল", "জল" বলে চলেছে। তিনি শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেও আহত অবস্থায় তাঁর ঐ প্রিয় দু'টি সাথীর কাছে উঠে যাওয়া বা তাদের মুখে জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না।

ক্রমে ভোর হয়ে এল। ২৩শে এপ্রিলের রঙীন সূর্য জালালাবাদ শহীদদের মুখে ও বুকে তার আলোর চুম্বন দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করল। আর ঐ তিনটি গুরুতর আহত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বিপ্লবী বিভিন্ন স্থান থেকে একটুখানি সেবা, সামান্য একটু জল আর চিকিৎসার আশায় শহীদদের সাক্ষী করে পাহাড়ের হরিৎ তৃণ-শয্যায় শুয়ে রইল।

পূর্ব রাত্রিতে বৃটিশ সরকারী সেনাবাহিনীর যে শোচনীয় পরাজয়, তাতে হতাহতের সংখ্যা সঠিক বলা কঠিন। তবে তাদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা যতটা জানা যায়, তা ৭০ থেকে ১০০ মধ্যে হবে। সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অস্ত্র সজ্জিত পূর্ণ বয়স্ক এই শত শত সৈনিক দলকে পরাজিত করেছিল, মাত্র ৬৩ জন মুক্তিপাগল কিশোর ছাত্র ও তরুণ বিপ্লবী। সেই লজ্জাকে গোপন করার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেছে। তখন স্থানীয় লোকদের কাছে পলাতক বিপ্লবীরা শুনেছেন যে, বেশী রাত্রিতে একখানা রেলগাড়ী এসে, কয়েকটি গাড়ীতে করে সব হতাহতদের জালালাবাদ রণক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে—তারপরের অবস্থা সরকার বিশেষভাবে গোপন রেখেছিল।

২৩শে এপ্রিল বেলা প্রায় ৯টায় বহু সংখ্যক সৈন্য, পুলিশ, পাকা গোয়েন্দা ও ইংরেজ কর্মচারীকে নিয়ে আবার সামরিক সশস্ত্র রেলগাড়ী এসে জালালাবাদ পাহাড় থেকে অদূরে থামল। বিগত রাত্রির লজ্জাজনক পলায়নকে স্মরণ রেখে সৈন্যরা রাইফেলে সঙ্গীন লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আসে। তারা দেখতে পায় যে জীবিত বিপ্লবীরা কেউ সেখানে নেই এবং দু'টি আহত তরুণ জল জল বলে ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ তুলছে। পাশ থেকে পাতার খস্ খস্ শব্দ শুনে গত রাত্রির কথা ভেবে তারা আঁতকে ওঠে। প্রতিশোধের জন্য সামনে আর কাউকে না পেয়ে ঐ তৃষ্ণার্ত দুইজন বিপ্লবীকে আবার গুলী করা হল—জলের বদলে গুলী দিয়ে তাদের জীবনতৃষ্ণা নিবারিত করার এই হীন চেষ্টায়, আহত মতি কানুনগোয় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

অম্বিকা চক্রবর্তী পাহাড়ের একপ্রান্তে ছিলেন। দূর থেকে সৈন্যদের আসতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়াতে বা হামাগুড়ি দিতে না পেরে একটু একটু করে পাহাড়ের ঢালুর কাছে গিয়ে নিজেকে গড়িয়ে দেন এবং কিছু নীচে এসে এক ঘন ঝোপের ভিতরে পড়ে যান। সৈন্যরা সেইদিন জালালাবাদ ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত তিনি ঐ ঝোপের মধ্যেই আহত অবস্থায় লুক্কায়িত ছিলেন।

শেষবার গুলীবিদ্ধ হওয়ার পরও অর্ধেন্দু দস্তিদারের মৃত্যু হয়নি। হয়ত যে অমূল্য জীবন দেশের মুক্তির জন্য সেদিন সে দিয়েছিল, সেই মুক্তির রূপ দেখবার আকুল কামনায় তার জীবনীশক্তি সেদিন কিছু বৃদ্ধিও পেয়ে ছিল। তার অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্ধেন্দুও এই ধরা থেকে চির বিদায় নেয়।*

জীবিত বিপ্লবীদের না পেয়ে প্রতিশোধের আর এক জঘন্য পরিচয় সেদিনকার ঐ বৃটিশ কর্মচারীরা দেয়। তারা যখন ঐ জালালাবাদ পাহাড়ে আসে, তখন শহর থেকে একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে আসে। অর্ধেন্দুকে চিকিৎসার জন্য শহরে পুলিশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে, অবশিষ্ট ১১ জনকে নিয়ে চারটি ফটো তোলা হয়। ফটো তোলার পর শহীদদের সব মৃতদেহকে টেনে টেনে এনে এক জায়গায়

---

* বিপ্লবীনেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর বক্তব্য দ্রষ্টব্য (পৃঃ – ১৫৯)

জড়ো করা হয় এবং তাদের উপর পেট্রল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সৈন্যদের সঙ্গেই পেট্রল নেওয়া হয়েছিল। তারপর জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে চিতার আগুন। আগুনে শহীদদের নশ্বর দেহগুলো ভস্মীভূত হয়েছিল। কিন্তু ঐ মুক্তিকামী বীর যোদ্ধাদের স্মৃতি দেশের মানুষের বুকে বুকে অমর হয়ে থাকবে।

সেদিন যে সব গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল তারা ঐ শহীদদের অনেককেই চিনত। তাদের শহরবাসী পিতা বা অন্য অভিভাবকের বাসাও তারা জানত। মৃতের সঙ্গে মানুষ বিবাদ করে না। তবু তারা হীন প্রতিশোধ লালসায় অন্ধ হয়ে, পিতা-মাতা ও অন্য অভিভাবকদের তাদের প্রিয়তম পুত্র বা আত্মীয়কে অন্ততঃ শেষবার দেখবার কোন সুযোগ না দিয়ে তাদের মৃতদেহগুলি পেট্রলের আগুনে ঐ ভাবে ভস্মীভূত করেছিল।

গুরুতর আহত ও সংজ্ঞাহীন অর্ধেন্দু দস্তিদারকে পুলিশ হাসপাতালে আনার পর নানা জরুরী চিকিৎসা দিয়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। কারণ ১৮ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ ইংরেজী পর্যন্ত সরকারী মর্যাদা চরমভাবে যাদের বীরত্বের জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের সর্বপ্রথম জীবিত সাথী এই শান্ত সমাহিত আহত বিপ্লবী। তাই একে যদি সামান্য কিছুক্ষণের জন্যও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় তবে তার কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। এই জন্য প্রয়োজনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ দিয়ে অর্ধেন্দুর চিকিৎসা চলতে থাকে।

জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অর্ধেন্দু হেলায় ত্যাগ করে এসেছিল জীবনের সকল স্নেহের বন্ধন। বোমা বিস্ফোরণের ঘা সম্পূর্ণ না শুকাতেই মরণ পাগল এই বিপ্লবী নির্দিষ্ট দিনে ঐ অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য গোপন আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ছুটে আসে। তাই পরম আদর্শনিষ্ঠ এই বিপ্লবীর কাছ থেকে বিদেশী শাসকদের গোলামদের তথ্য সংগ্রহ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়।

তাকে হাসপাতালে আনার ঘণ্টা কয়েক পরে ডাক্তারদের অনেক চিকিৎসার পর অর্ধেন্দুর সংজ্ঞা ফিরে আসে। অদূরে গোয়েন্দা বিভাগের

বড় কর্মচারী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা বসে আছে বড় আশা নিয়ে যে, এই গুরুতর আহত বিপ্লবীর কাছ থেকে কিছু খবর সর্বপ্রথম তারা পাবেই। সকালে তার উপর হিংস্র নতুন আঘাত থেকে তখনও রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি।

তখন সরকারী কর্মচারী তাকে বলে, কে তোমাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল ? ক্ষীণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে অর্ধেন্দুর জবাব আসে, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিলাম। আবার তাকে বলা হয় সঙ্গে আর কে কে ছিল নাম বল।

জবাবে সে বলে, অনেক ছিলাম কারও নাম বলব না। তখন তাকে লোভ দেখানো হয়, তাকে বিমানে করে কলিকাতা চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে (তখনও সাধারণ যাত্রী বিমান চালু হয়নি ; কেবল সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য দুই একটি ছিল) তাকে বাঁচানো হবে, তাকে বহু হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়ার প্রলোভনও দেখানো হয়।

অর্ধেন্দু বলে, তার কিছুর দরকার নেই, সে কিছুই বলবে না।

তারপর পুলিশের পক্ষ থেকে গরম দুধ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে সে বলে শত্রুর হাত থেকে সে কোন মতে দুধ বা কিছু খাবে না। বহুবার অনুরোধের পর সে বলে, তার ডাক্তার কাকা* এসে যদি কিছু খেতে দেন, তবেই সে খাবে। তখন পুলিশের লোক ঐ ডাক্তারকে নিয়ে আসে এবং তাঁর হাতের শেষ দুধের পাত্রটি অর্ধেন্দু নেওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই তার শেষনিঃশ্বাস পড়ে।

মৃত্যুর পরে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। শহরে সাধারণ হিন্দু শ্মশানে (অভয়মিত্র শ্মশান) অর্ধেন্দুকে হিন্দুশাস্ত্র মতে দাহ করার অনুমতি

---

* অর্ধেন্দুর পিতৃব্য স্বর্গীয় ডাঃ অক্ষয় কুমার দস্তিদার তখন শহরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠা জনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন। তিনি জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ও অনেক জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লেখক ১৯৩১শে মেদিনীপুর জেলার হিজলী আটকখানায় যখন বন্দী ছিল, তখন এই পিতৃব্য তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিজে অর্ধেন্দুর মৃতদেহ নিয়ে যখন শ্মশানে যান, তাঁর নিজ এই অভিজ্ঞতা লেখককে বলেন।

বহু কষ্টে সংগ্রহ হয়। কেবল মাত্র চারজন নিকট আত্মীয় ছাড়া আর কেহ মৃতদেহ বহন করতে বা সঙ্গে যেতে পারবে না। সারা শহরে মিলিটারী আর পুলিশের কড়া শাসনে সন্ধ্যার আগে থেকে মৃত্যুর নিথরতা বিরাজ করছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে মুক্তি পাগল মানুষকে নীরব রাখা হয়েছে। তার মধ্যে চারজন নিকট আত্মীয় নিয়ে চলেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য জালালাবাদের দ্বাদশ শহীদকে। অন্য ১১ জন শহীদকে তাদের আত্মীয় বা দেশবাসীকে দেখবার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। সবার অগোচরে তাদের পেট্রল দিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ খণ্ড সংগ্রামের যেই শহীদের মৃতদেহ শহরের বিভিন্ন নির্জন নীরব রাস্তা ও গলি দিয়ে চারজন মাত্র আত্মীয় বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তার দু'পাশের ঘর ও দোকানের যারাই তা জানতে পেরেছে, সেই সব হিন্দু-মুসলিম দেশবাসী তখন বন্ধ দরজা জানালার আড়াল থেকে পাঠিয়েছিল তাদের শ্রদ্ধার নীরব অর্ঘ্য।

মৃতদেহ শ্মশানে রেখে যখন অর্ধেন্দুর উপরোক্ত ডাক্তার কাকা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাদি করছেন, তখন তিনি দেখলেন, শ্মশানের গেটে একটি ঘোড়ার গাড়ী থামল এবং তা থেকে নামল চারজন নারী। তারা কাছে এগিয়ে এলে দেখা গেল তারা শহরের বারাঙ্গনা। ডাক্তার বাবু বুঝতে পারলেন কেন এমন সান্ধ্য আইন জারী থাকা সত্ত্বেও ঐ নারীরা আসতে পারল। তিনি তাদের ওখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

তাদের মধ্যে একজন বলল, তারা দেবতা দেখতে এসেছে। তাদের শাড়ীর মধ্যে লুকানো দুধের বোতলগুলি আর ফুলের তোড়া বের করে তারা বলে, 'এই দুধ দিয়ে ঐ দেবতার মৃতদেহ আমরা স্নান করাতে চাই, তারপর ফুলগুলি দিয়ে আমরা ফিরে যাব'।

অর্ধেন্দুর দেশভক্ত পিতৃব্য বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ঐ সব সমাজের চোখে ঘৃণ্য, অবনমিতা পতিতা নারী কয়টির দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি তাদের অনুমতি দেন এবং তারা তাদের কথামত মৃতদেহ দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে শ্মশান থেকে চলে যায়। তারা চলে যাবার একটু পরই দেখা গেল শ্মশানের বিপরীত দিক থেকে সরু চাক্তাই খাল পার হয়ে তরুণ এক বিপ্লবী

গোপনে এগিয়ে এসে হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকে ঐ ফুল দিয়ে সাজানো অর্ধেন্দুর মৃতদেহের এক ফটো তুলে, যেমন গোপনে এসেছিল তেমনি অন্ধকারের বুকে মিশে গেল। তার কয়েকদিন পরে রাত্রে ঐ ফটো পুত্রশোকে আচ্ছন্ন অর্ধেন্দুর মাতাকে গোপনে বিপ্লবী একজন তরুণ দিয়ে আসে।*

এখন জালালাবাদ পাহাড়ের ঝোপের আড়ালে গুরুতর ভাবে আহত অন্যতম প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর কথায় ফিরে আসা যাক। সূর্য সেন, নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা তাঁকে ২২শে এপ্রিল রাতে মৃত মনে করে ফেলে যাওয়ার বহুদিন পর তাঁরা জানতে পারেন যে, তিনি জীবিত আছেন। জালালাবাদ সংগ্রামের পরদিন বা দুই তিন দিন পর সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন এক ইস্তাহার রচনা করেন। তা গোপনে চট্টগ্রাম ও কলকাতায় বিলি করা হয়। তখন কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের (লবণ আইন ভঙ্গ) খুব জোর। কংগ্রেসের বুলেটিন ছাপানো হত এক গোপন কেন্দ্রে সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে। তার এক যন্ত্রে মাষ্টারদার ঐ ইস্তাহার কয়েক হাজার কলকাতায় ছাপানো ও গোপনে বিলি করা হয়েছিল। তার শিরোনামা ছিল :—

"চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়"।

তাতে শহীদদের যে তালিকা তার প্রথম নামই ছিল অম্বিকা চক্রবর্তীর। 'মৃত' অম্বিকা চক্রবর্তীর 'জীবন' লাভ করার ঘটনা তাঁর নিজের কথায়ই নীচে দেওয়া হল :—

> "জালালাবাদ সংগ্রামে আমাদের জয়লাভের পরদিন ভোরে আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমার প্রাণের সাথীরা কিছু দূরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার আহত স্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না— দূর থেকে দেখলাম আরও বেশী সংখ্যায় সৈন্যরা পাহাড়ে উঠে আসছে।

---

* অর্ধেন্দু মার কাছে দেওয়া সেই ফটোখানাই এই বইতে দেওয়া হয়েছে।
* মতি কানুনগো ও অর্ধেন্দু দস্তিদার।

তখন প্রাণপণ শক্তি নিয়ে আমি নিজেকে পাহাড়ের ঢালু কাছে থাকায় গড়িয়ে দিই এবং এক ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ি। সৈন্যরা এসে কিছুক্ষণ পরই আবার আহত দু'জনকে* গুলী করল। তারপর শহীদদের মৃতদেহ পেট্রোল দিয়ে যে জ্বালিয়ে দিল তা আমি ঐ ঝোপের আড়ালে পড়ে থেকে টের পেলাম। তারা যে চলে গেল তাও বুঝলাম। বিকালের দিকে এক মুসলিম গ্রামবাসী একটু নীচে দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে বহু কষ্টে আমি ডাকি আর আমাকে একটু জল দিতে বলি। গত বিকাল বেলা আর আজ সকাল বেলার ঘটনা সে জানে, তবু সে আমাকে ধরে কাছেই তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। পনর দিন ধরে সে নানাভাবে আমার সেবা শুশ্রূষা করে এবং পরে আমাকে কালুরঘাটের কাছে নিয়ে গোপনে সাম্পানে তুলে দেয়। তখনও আমার গুলীবিদ্ধ অবস্থা। সাম্পানের মাঝির সাহায্যে আমি গ্রাম্য কৃষক আমজাদ আলীর বাড়ীতে গিয়ে উঠি। তার সঙ্গে পূর্বেই আমার পরিচয় ছিল। সে নিজেও তার এগার বছরের ছেলে হোসেন আলীর নিকট আমি যে স্নেহ, ভালবাসা, দরদ ও আশ্রয় পেয়েছি, তা আমার আমরণ স্মরণ থাকবে। বিশেষতঃ ঐ দিনের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার তাণ্ডবলীলার মধ্যে, আমার গ্রেপ্তারের জন্য বৃটিশ সরকার যখন ৫০০০৲ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সেই লোভ আর সব বিপদকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ ২৫ দিন সে আমাকে আশ্রয় দেয়। তার পর্দানশীন স্ত্রী আমার সামনে পর্দা ফেলে দিয়ে নিজের ছেলের মত আমাকে দু'বেলা রেঁধে খাওয়াতেন এবং পরম যত্নে আমার সব কাজ করতেন।

আজ আমরা পাকিস্তানের মুসলিম ভাইদের কাছে আমজাদ আলীর মত দেশপ্রেমিকের কথা তুলে ধরতে চাই। এমন ভাই যত বেশী সংখ্যায় থাকবে ততই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বেড়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তার আশ্বাস দান বা গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

আরও একটি মুসলিম মায়ের কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। ফতেয়াবাদের বড় দিঘির পাড়ে বৃদ্ধা বিধবা ফয়েজুন্নেসার বাড়ীতে আমি দুই দিন দুই রাত্রি ছিলাম। তখন তার ১৭।১৮ বছরের ছেলে ফজল আহমদ জালালাবাদ পাহাড়ে একটি ওয়েবলী রিভলভার

কুড়িয়ে পায় এবং আমাকে তা এনে দেয়। তার জন্য কিছু দাম বা পুরস্কার আমি ঐ ফয়েজুন্নেসা বিবিকে দিতে গেলে, তিনি বলেন, এইটি দিয়ে একটা সাহেব (ইংরেজ) মারলে আমি বেশী খুশী হব।

আমি আমজাদ আলীর বাড়ীতে থেকে সূর্য বাবু ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি। তখনও আমি যে জীবিত তা আমার বিপ্লবী সাথীরা জানেন না। পরে গভীর রাত্রে গ্রামের এক পুকুর পাড়ে বহু সতর্কতা নিয়ে তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমায় জীবিত অবস্থায় ওখানে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

(স্বাক্ষর)
অম্বিকা চক্রবর্তী

এগার

এখন যে চারজন বিপ্লবী ১৯শে এপ্রিল ভোরে ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ বিপ্লবী তরুণ হিমাংশু সেনকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিল সেই গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তের খবর জানা দরকার। ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়ে তারা আনন্দ গুপ্তদের পেরেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলার উপর বাসায় গিয়ে উঠার অল্পক্ষণ পরই কিছু কোতোয়ালী পুলিশ যে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয় তা আগেই বলা হয়েছে।

১৯শে এপ্রিল ভোর রাত্রি থেকে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ঘটনা যখন পুলিশ জানতে পারে, তখন কোতোয়ালী থানা থেকে পুলিশ শহরের পরিচিত বিপ্লবীদের বাসায় খোঁজ করতে আরম্ভ করে এবং কে কে নিজ নিজ বাড়ীতে অনুপস্থিত তাদের তালিকা তৈরী করে। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে যারা এসে ১৮ই এপ্রিলের অভ্যুত্থানে যোগ দেয়, তাদের সম্পর্কে তখনও তারা কোন হদিস করতে পারেনি। কিন্তু পুলিশ যখন সদরঘাটে বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষের পিতার "স্বদেশী বস্ত্রভাণ্ডারে" পরদিন সকালে হানা দেয় তখন তল্লাসীর সময় ওখানে এক মূল্যবান তথ্য "মবিলাইজেশন লিষ্ট" (অভ্যুত্থানে যোগদানকারী বিপ্লবীদের নাম) পাওয়া যায়। পুলিশ এই তালিকা পেয়ে খুব উল্লসিত হয় এবং ঐ তালিকার নাম থেকে আরও কিছু পূর্ব-পরিচিত বিপ্লবীর ঐ কাজে যোগদানের কথা জানতে পারে। কিন্তু তালিকায় কোন কোন বিপ্লবীর ডাকনাম ছিল, কারও কারও বিপ্লবীদল থেকে দেওয়া ছদ্মনামও ছিল। আর যাদের বিরুদ্ধে পুলিশে আগের কোন রিপোর্ট ছিল না তেমন কিছু নামও ওখানে ছিল। যার ফলে নাম-বিভ্রাট করে পুলিশ যারা ঐ অভ্যুত্থানের সঙ্গে মোটেই যুক্ত ছিল না তাদেরও খোঁজ করে, গ্রেপ্তার করে ও আত্মীয়স্বজনকে লাঞ্ছিত করে। কিন্তু তালিকা মত যোগদানকারী অনেকের কোন সন্ধান তারা পায় না।

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ অন্য দুই তরুণ সাথীকে নিয়ে আনন্দ গুপ্তদের বাসা থেকে পিছনদিক দিয়ে পলায়ন করে দেবপাহাড়ের জঙ্গলে

কিছুকাল থাকেন। তারপর তাঁরা শহরের দক্ষিণ দিকে ফিরিঙ্গিবাজারে বিপ্লবী রজত সেনের পিতা উকিল শ্রীযুত রঞ্জন সেনের বাসায় গিয়ে ওঠেন। পুলিশ তার পূর্বেই রজতকে খোঁজ করে গেছে, তবু রজতের মা এদের আদর করে আশ্রয় দেন। অভ্যুত্থানের পর থেকে অন্তত চার পাঁচ বছর যখন এই রকম পলাতক বিপ্লবীরা বিভিন্ন বাড়ীতে গেছেন, তখন সব বিপ্লবীর মায়েরা তাদের নিজের পুত্রের মত যেভাবে নিজের স্নেহের আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, সে ইতিহাস সোনার জলে লিখে রাখার যোগ্য। সেই মায়েদের মধ্যে বহু মুসলমান মাও ছিলেন। গ্রামের সরলা তথাকথিত সভ্যতার আলোকবঞ্চিতা এই সব মায়েদের গভীর স্নেহে তখনকার বিপ্লবীদের দেশপ্রেমকে সর্বদা সঞ্জীবিত রেখেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বেই পুলিশ খানাতল্লাসীর নাম করে সারা বাড়ীতে বর্গীর মত অত্যাচার করে গেছে। আবার যে কোন সময় আসা সম্ভব। তবু এই বিপ্লবীরা তাঁর প্রাণের সন্তান রজতের সাথী, তাই তার মত করেই তাদের রাখতে হবে যে বিপদই আসুক, এই মনোভাব রজতের পিতামাতার। রজত সম্পর্কে খোঁজ নিলে গণেশ ঘোষ এঁরা বলেন, সে মাষ্টারদার সঙ্গে আছে তাই চিন্তিত হবার কোন দরকার নেই। সেখানে তাঁরা খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছেন, তখন দেখা গেল পুলিশের বাহিনী একটি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ এই চারজন বিপ্লবীকে রজতের মা এইটি মই দিয়ে তুলে দিলেন তাঁদের ঘরের ভিতরে যে বাঁশের তৈরী মাচা ছিল তার উপর। মাচাটি দুই কাজে ব্যবহৃত হত। প্রথমতঃ টিনের ছাউনি ঘরের ভিতরে গরম না লাগার জন্য ঘরের মাচা ঐভাবে দেওয়া হয়। আর ঐ মাচায় একটি ফাঁক রাখা হয়েছিল, মই দিয়ে উঠে মাচার উপরের পরিবারের প্রয়োজনীয় মাটির পাত্র ও অন্যান্য জিনিস রাখার জন্য তা ব্যবহার করা হত।

মই দিয়ে ঐ মাচায় চট্‌পট্ তুলে দিয়ে রজতের মা মইখানা ঘরের পিছন দিকে রেখে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেগে পুলিশ এসে দ্বিতীয়বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রজত বা তার অন্য কোন বন্ধু বাসায় ফিরেছে কি না জিজ্ঞাসাবাদ করে। মাচার উপরে বিপ্লবীরা তখন বুকের উপর শুয়ে আছে এবং বাঁশের ফাঁক দিয়ে গুলী ভরা রিভলভার লক্ষ্য করে রেখেছে, যদি উপরে পুলিশ উঠে আসার কোন লক্ষণ দেখায়, তখন চারটি শক্তিশালী রিভলভার থেকে গর্জন করে উঠবে বিপ্লবীদের

অগ্নিনালিকা। কিন্তু পুলিশ ঐ ঝুলধরা ধোঁয়ার কালিমাখা মাচার দিকে মোটেই লক্ষ্য না করে ঘরের সব কামরা আর একবার দেখে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়। বিপ্লবী চারজন তখন মাচা থেকে নেমে আসে এবং ঐ বাসা যে নিরাপদ নয়, তা বুঝতে পেরে সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে।

এই চারজন বিপ্লবী শহরে বিশেষ পরিচিত। তার উপরে তরুণ বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষালের সুঠাম দেহ ও সুন্দর গায়ের রং থাকাতে, তাদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করাও এক সমস্যা হয়ে ওঠে। তবু চারজনেই ময়লা পোষাক ইত্যাদি রজতের মায়ের কাছ থেকে নিয়ে ছদ্মবেশে হেঁটে ফিরিঙ্গি বাজার থেকে দক্ষিণ কাটলীতে পূর্ব-পরিচিত বিপ্লবীদের এক বাড়ীতে গিয়ে সন্ধ্যার পর হাজির হয়। ২০শে ও ২১শে এপ্রিল দুই বিপ্লবীনেতা গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ বহু আলাপ আলোচনা করেন, কি করে মাষ্টার দা ও অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়ে তাঁরা পুনর্মিলিত হবেন। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় যেই ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ সংগ্রামে বিপ্লবীদল জয়লাভ করে, সেই রাত্রিতেই এই চারজন বিপ্লবী চট্টগ্রাম থেকে রেলে জেলার বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।

ঠিক হয় নগণ্য রেল ষ্টেশন ভাটিয়ারী থেকেই টিকিট কাটা হবে। গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণকে ধূলাবালি মেখে ময়লা করে, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে গ্রাম্য গরীব চাষীর মত সাজ নিয়ে চারজনই রেল ষ্টেশনে আসে। পোশাক যেমনই হোক, গুলীভরা রিভলভার প্রত্যেকেরই দুইটি করে সঙ্গে আছে। ষ্টেশনে আনন্দকেই টিকিট কিনতে পাঠান হয়। ষ্টেশন মাষ্টার এই তরুণদের দেখে সন্দেহ করেন এবং টিকিট চারখানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকিটের নম্বরগুলি সীতাকুণ্ড, ফেণী, কুমিল্লা ও লাকসামে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ফেণী ষ্টেশনে এই চারজন যেই গাড়ীতে ছিলেন সেই গাড়ীতে উঠে টিকিট পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ঐ চারখানা টিকিটের মালিককে চিনতে পারে। পুলিশ তাঁদের সামনে গিয়ে বলে যে, ষ্টেশনে একটু নামতে হবে, তাঁদের সঙ্গে দরকারী আলাপ আছে।

গণেশ ঘোষ তখন ফেণী, নোয়াখালী এলাকার কথ্য ভাষা নকল করে বলেন, তাঁরা ধোপার জাত, আত্মীয় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন, হুজুররা গরীব মানুষের উপর এমন জুলুম করেন কেন।

পুলিশ কোন আপত্তি শোনে না এবং গাড়ীতে উঠে তাঁদের সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করে। তারপর এই চারজন বিপ্লবীকে ফেণী ষ্টেশনে নামানো হয়। এখান থেকে কেমন করে তাঁরা পলায়ন করতে পারেন তার কাহিনী বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহের নিজের কথায়ই নীচে দেওয়া গেল :

"২২শে এপ্রিলের (১৯৩০) সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা চারজন সাথী শহরের বুকের উপর ঘুরে বেড়িয়েছি। এই সময় আমরা কোতোয়ালী থানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো, গোয়েন্দা পুলিশের ইন্‌সপেক্টারের বাসা ইত্যাদি জরুরী যায়গার সামনে দিয়ে যাতায়াত নির্বিঘ্নেই করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মূল দলের সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের জন্যও খুব চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এই চারদিনের মধ্যে আমরা অনেকবার অনেক রোমাঞ্চকর উপায়ে ধরা পড়া থেকে বেঁচে গেছি। একদিন আমাদের কাছ থেকে মাত্র ১০ গজ দূর দিয়ে চলে গেল কর্ণেল ডালাস স্মিথ ও আই-জি পুলিশ লোম্যানের* নেতৃত্বে সশস্ত্র সামরিক বাহিনী। আমরা আমাদের রিভলভারগুলি তৈরী করে একটু দাঁড়ালাম - আর ওরা অন্যদিকে চলে গেল।

খোলা রিভলভার হাতে সার্জেণ্ট আর দারোগারা শহরের পরিচিত সন্দেহজনক বাড়ীগুলিতে অতর্কিতে হানা দিচ্ছে। এই রকম পুলিশ হানা দেওয়া কোন কোন বাড়ীতে আমরা ছিলাম। পুলিশের দল সৌভাগ্যবশতঃ আমরা যেখানে লুক্কায়িত আছি তাছাড়া ঘরের অন্যান্য জায়গা তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেছে। এই ভাবে ১৮ই থেকে ২২শে এপ্রিল (১৯৩০) পর্যন্ত বহু উত্তেজনাকর মুহূর্ত আমাদের কেটেছে এবং বাধ্য হয়ে আমাদের প্রধান দলের সঙ্গে কোনোমতে যোগ দিতে না পেরে

* ঢাকার বিপ্লবীদল "শ্রীসঙ্ঘের" সদস্য বিনয় বোস লোম্যানকে গুলী করে হত্যা করে ঢাকা শহরে, ১৯৩০শে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েক মাস পরে।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক চরম মুহূর্তে আমাদের চারজনকে চট্টগ্রাম ত্যাগ করতে হল।

২২শে এপ্রিল (১৯৩০) রাত্রে আমরা চারজন সাথী কলিকাতা যাত্রা করলাম। কোন সূত্রে খবর পেয়ে অথবা সন্দেহ করে পুলিশ আমাদের ফেনী ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করে এবং রাইফেল দিয়ে ঘেরাও করে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে আমাদের নিয়ে যায়। পুলিশের কাছে আমরা সাধারণ যাত্রী বলে বেশ ভাণ করলাম। মনে হল, পুলিশেরও আমাদের সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে এবং আমাদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে তাদের দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছে।

গাড়ী থেকে আমাদের যেভাবে ঘেরাও করে নামানো হল তাতে আমরা আমাদের পলায়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে একেবারেই হতাশ হয়ে গেলাম। আমরা দেখলাম গুর্খাভর্তি একটা রেলগাড়ী ষ্টেশনের পাশেই দাঁড়ানো। তবু পুলিশকে ধোঁকা দেবার কথা আমরা ভাবছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টারের যে ঘর তা থেকে সহজে যে পালানো যাবে না তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত আমাদের দেহতল্লাসী করার দাবী করল। তারা এজন্য প্রথমেই ডাকল মাখনকে। তার গায়ে ওরা হাত আর একটু হলেই দেবে। হঠাৎ আমি আমার রিভলভারটি নিয়ে আমার পিছনে দাঁড়ানো সিপাহীকে গুলী করলাম। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি লাফিয়ে আমার সামনে যে টেবিল ছিল তার উপর উঠলাম। চেঁচিয়ে বললাম "পালাও, পালাও সবাই—না হলে তোমাদের সবাইকে গুলী করে মেরে ফেলব।" সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা গুলী ছুঁড়লাম আমার রিভলভার থেকে। তাতে আর দু'জন সিপাহী আহত হল। চোখের পলকে ঘর খালি হয়ে গেল। তারপর টেবিল থেকে নেমে এত তাড়াতাড়ি আমি বাইরে ছুটে গেলাম যে কেউ আমাকে আঘাত করা বা ধরে ফেলা কোনটাই পারল না। দরজার পাশ দিয়ে যখন আমি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছি তখন দেখলাম ওখানে দারোগাটি দাঁড়িয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তাকেও গুলী করলাম। এসব ঘটনা এমন দ্রুতগতিতে ঘটে গেল যে, প্রকৃত কি ঘটছে তা গুর্খা সৈন্যরা ধারণাই করতে পারল না।

আমি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য তিনজন সাথীও ছুটে দূরে চলে গেল। তার মধ্যে মাখন যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়ানো এক সিপাহী হঠাৎ রাইফেলের কুঁদা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে এবং মাখনের মাথা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তা নিয়ে সবাই ওখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে আমি আগে ছুটে যাওয়াতে অন্য তিনজনের থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তখন আমি একা হয়ে গেলাম। তারপর অনেক কষ্টে বোবা ও কালা সেজে একজন কৃষকের সহায়তায় আমি কুমিল্লা গিয়ে পৌঁছি।

ফেণী ষ্টেশন থেকে ঐভাবে পলায়নের সময় প্রথম অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ পালিয়ে গেলে অল্পবয়স্ক আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল ছুটে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দরজায় দাঁড়ানো এক গুর্খা বন্দুকের কুঁদা দিয়ে হঠাৎ মাখন ঘোষালের মাথায় এক আঘাত করে ফেলে। তবুও এই দুইজন তরুণ বিপ্লবী রাতের অন্ধকারে ঐ অপরিচিত জায়গায় ছুটতে থাকে ফাঁকা রোদে-ফাটা ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে। চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে এই দুই তরুণ বাইরে এর পূর্বে আর কোথাও যায়নি। মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কিছুদূর যাবার পর মাখন বলল, সে আর পারছে না, তার মাথার আঘাতের স্থান থেকে রক্ত পড়ছে। আনন্দ গুপ্ত তাকে ধরে তার কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে মাঠের মাঝখানে এক পুকুর দেখে। সেখানে নিয়ে মাথার ঐ আঘাতে নিজের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দেয় এবং দু'জনে অঞ্জলিভরে জলপান করে। তারপর আস্তে আস্তে তার চেয়ে বয়সে ছোট আনন্দ গুপ্তের কাঁধে হাত দিয়ে মাখন ঘোষাল ঐ অপরিচিত জায়গায় মাঠের ভিতর দিয়ে অনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। সঙ্গে যে দুইজন নির্ভরযোগ্য নেতা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এই দুই তরুণ সহযাত্রী কিছুটা অসহায় বোধ করছিল। কিন্তু কোমরে রিভলভার ও গুলী মজুত থাকায় মনের জোরও ছিল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে রাতের আবছা অন্ধকারে মাঠের মাঝখানে পুকুর পাড়ে তারা দেখে চাদরমুড়ি দিয়ে একটা লোক বসে আছে। তখন বিপ্লবী দলের অনুশাসন অনুসারে আনন্দ আহত মাখনকে বসিয়ে দিয়ে হাঁক দেয়—"থাম্—বন্ধু না শত্রু, হাত তোল্।" দূর থেকে জবাব আসে "বন্ধু"...আর হাতও অবশ্য তোলা হয়। তরুণ বিপ্লবী দু'জনের মনে ভরসা জাগে। সামনে

এগিয়ে গিয়ে তারা দেখে, তাদের গণেশদা (গণেশ ঘোষ) চাদর নাকে মুখে চাপিয়ে বসে আছেন। ১৮ই এপ্রিল রাত্রেই তিনি টের পান যে, তাঁর গায়ে হাম উঠেছে কিন্তু তাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ না করেই সে রাত্রের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে যোগ দেন।

গত চারদিনে তাঁর হাম আরও বেশী উঠেছে এবং যখন রেলে উঠে যাত্রা করলেন, তখন বেশ জ্বর। তা নিয়েই তিনি ফেণী ষ্টেশনের সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে গুলী চালাতে চালাতে পালিয়ে এসে অন্য তিনজন সাথীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্বরে ও দুর্বলতায় ক্লান্ত হয়ে ঐ মাঠের মাঝখানে পুকুর পাড়ে বসেছিলেন।

এবার যাত্রা শুরু হল তিনজনের। চতুর্থ সাথী অনন্ত সিংহের খবর নেই। তিনিও ষ্টেশনে মাষ্টারের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে অন্ধকারে একদিকে চলে গেছেন। গণেশ অসুস্থ হলেও অন্য দুই তরুণ সাথীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি চলেছেন অজানা পথে। কিছুদূরে এক গ্রাম থেকে কীর্তনের সুর ভেসে এল। গণেশ ঘোষ ও অন্য দুইজন বিপ্লবী সেখানে গিয়ে বসলেন। কিন্তু সেখানকার প্রায় সবাই তাদের চেহারা দেখে কিছুটা সন্দেহ করে। একজন এগিয়ে গিয়ে তাঁদের পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁরা যে ধোপা এই জবাব পায়। পরে আর একজন সোজাসুজি সন্দেহ প্রকাশ করেই বলে, ঐ রকম রক্তমাখা মাথায় পট্টিবাঁধা যোয়ান ছেলে আপনার সঙ্গে, নিশ্চয়ই আপনারা কোন চুরি ডাকাতির সঙ্গে সংযুক্ত।

গণেশ ঘোষের ভাষা সেই নকল নোয়াখালীর এবং ব্যবহার অতি বিনয়নম্র। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে তাঁর ভাইটির মাথায় একটু লেগে গেছে, এই জবাব তিনি দিলে, লোকটি ঐ গভীর রাত্রে এক কঠিন প্রশ্ন তাঁকে করে। যদি আপনারা এই এলাকার লোকই হন, তাহলে বলুনত পূর্ব দিক কোনটা ?

খুব রাগের ভাণ করে গণেশ ঘোষ সাথীদের নিয়ে উঠে পড়েন আর বলেন, কৃষ্ণনামকীর্তন শুনতে এসেছি, তার উপর এত জেরা চললাম, আমরা।

এভাবে এঁরা তিনজন আবার রেলে সিলেট যান। তখন আনন্দ গুপ্তের মাসীমা সিলেট সরকারী বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ঐ বিপ্লবীরা আনন্দ গুপ্ত মারফত ঐ মহিয়সী মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য সংগ্রহ করে কলিকাতা যাত্রা করেন। যদিও কলিকাতার পুলিশ ৫০০০ টাকা পুরস্কার পাওয়ার লোভে গণেশ ঘোষকে আর অন্য দুইজন কম পুরস্কার ঘোষিত বিপ্লবীকে সর্বদা খোঁজ করছে, তবু তাঁরা নিরাপদে নৈহাটি ষ্টেশন থেকে গাড়ী বদল করে কলকাতায় বিপ্লবী দল "যুগান্তরের" অন্যতম ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অনন্ত সিংহ যখন দেখেন যে তাঁর অন্য তিনজন সাথীর সঙ্গে দেখা হবার তাঁর আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি নিজের ব্যাপারে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত ভাল দুইটি গুলীভরা রিভলভার ছিল। তিনি তার একটি রেখে অন্যটিকে পথে এক নদীতে ফেলে দেন। তারপর নিজের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে দিয়ে কাপড় ছিঁড়ে তা থেকে নেংটি একখানা তৈরী করে পরেন এবং পাগলের মত করে পথ দিয়ে চলতে শুরু করেন। পথে ক্ষুধার্ত হয়ে গাছ থেকে কাঁচা আম পেড়ে পাগল বলে বিশ্বাস করবার জন্য খোসাশুদ্ধ ঐ কাঁচা আম তিনি খেতে থাকেন। তখন সকাল হয়ে গেছে। পাগল দেখে বেশ কিছু ছোট ছোট গ্রাম্য ছেলেমেয়ে অনন্ত সিংহের পিছন পিছন যেতে থাকে। কেউ ঢিল, কেউ ধূলা তাঁকে ছুঁড়তে থাকে।

এইভাবে মাথার উপর পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা নিয়ে চট্টগ্রামের তখনকার রোমাঞ্চ-জাগানো বিপ্লবীনেতা চৌদ্দ গ্রামের এক কৃষকবাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় পান। সেই কৃষক ভাইয়ের চেষ্টায় কুমিল্লা-গামী একখানা ট্রাকে করে অনন্ত সিংহের যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কুমিল্লার বিশিষ্ট দেশভক্ত ও বিখ্যাত আইনজীবী স্বর্গীয় কামিনী দত্ত*

* শ্রদ্ধেয় কামিনী দত্ত কয়েক বছর পূর্বে পরলোক গমন করেছেন। তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তার বিধবা পত্নী তাঁর বহুমূল্য আইন পুস্তকগুলি ঢাকা আইন কলেজকে এবং কুমিল্লা জেলার তাঁর ভূসম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ কুমিল্লা নারী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেছেন। বিপ্লবীদের অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যদান এবং চট্টগ্রাম "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলা ও অন্যান্য বহু রাজনৈতিক মামলা ইনি বিনা পারিশ্রমিকে করেছেন। ১৯৩১শে কুমিল্লার ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী যখন সেখানকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করে হত্যা করে, তখন পুলিশ কামিনীবাবু ও অনন্ত সিংহের দিদি শ্রীমতী ইন্দুমতী সিংহকেও গ্রেপ্তার করেছিল।

ছিলেন অনন্ত সিংহের পিতার বাল্য সহপাঠী। সেখানে পৌঁছার পরে কামিনী বাবু ও তাঁর ছেলেরা তাঁকে চিনতে পারেন। কামিনী বাবু প্রথম দুই দিন তাঁকে তৎকালীন কুমিল্লা জেলা কংগ্রেস সেক্রেটারী মোঃ মোখলেস্থর রহমানের হেফাজতে কংগ্রেস আপিসেই রাখার ব্যবস্থা করেন। তারপর মুসলমান যাত্রীর বেশে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থাদি দিয়ে কামিনী বাবু উপরোক্ত কংগ্রেস সেক্রেটারী এবং জিলার অন্যতম কংগ্রেস (পরে কৃষক সমিতির) নেতা মোঃ এবাদউল্লাহ্ সাহেবদের সঙ্গে কলিকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সারা বাংলায় তখন পলাতক বিপ্লবী নেতাদের ধরবার জন্য ঘরে ঘরে তল্লাসী চলছে, বড় বড় রেল ষ্টেশনে ও ষ্টীমারঘাটে প্রায় সব যাত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা ও দেহতল্লাসী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। তার মধ্যেও দেশপ্রেমের কতদূর গভীরতা থাকলে, ঐ দুই বিশিষ্ট দেশভক্ত জননেতা বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনন্ত সিংহের মত বিপ্লবী নেতাকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের দুই সপ্তাহের মধ্যেই সফলভাবেই সোজা কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনে নিয়ে আসেন, তা ভাবলে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এই দুইজন দেশপ্রেমিক আজও জীবিত আছেন কি না জানি না। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে এই লেখকও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম জানাচ্ছে।

কলিকাতা গিয়ে পৌঁছার দুই একদিন পরই অনন্ত সিংহ যেই নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌঁছান, তা তৎকালীন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অন্যতম সদস্য ক্যাবলা (মনোরঞ্জন) রায়ের পিসীমার বাসা। তখন সেখানে চট্টগ্রামের আরও একজন তরুণ বিপ্লবী কয়েকদিন ধরে আত্মগোপনে ছিল। মহীয়সী মহিলা ঐ বিধবা পিসীমা ও তাঁর ছেলে মেয়ে সকলেই পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অন্যান্য সাহায্য যথেষ্ট করেছিলেন। এই গোপন কেন্দ্রে বসে বিপ্লবী মেয়ে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, রেণুকা রায়, কমলা চাটার্জি ইত্যাদি বহু গোপন বৈঠক করেছে, মাষ্টারদা প্রেরিত গোপন ইস্তাহার (১৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সাইক্লো-ষ্টাইলে শত শত ছাপাতে ও গোপনে কলিকাতার বিভিন্ন অংশে বিতরণ করতে সাহায্য করেছে। বিস্ফোরক, 'গান-কটন' ইত্যাদি তৈরীর জন্য (চট্টগ্রাম 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে' ব্যবহারের জন্য) সংগৃহীত এসিড ইত্যাদি ঐ বাসায় নিরাপদে রাখা হয়েছে। ঢাকার বিপ্লবী তরুণ দীনেশ

গুপ্ত ঐ পিসীমার আত্মীয় হওয়ায়, তিনিই প্রীতিলতাকে বলেন যে, ফাঁসীতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দুই বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ গুপ্ত আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাশাপাশি 'সেলে' মরণের ক্ষণ গণনা করছে। সহোদরা বলে মিথ্যা পরিচয়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ফাঁসীর পূর্বে বহুবার প্রীতির দেখা করার জন্য বুদ্ধি পরামর্শ স্বর্গীয় সেই শ্রদ্ধেয়া পিসীমাই দিয়েছিলেন।

ঐ গোপন কেন্দ্রে থাকার সময়ই অনন্ত সিংহের কাছে খবর আসে যে, তাঁর সঙ্গে ফেণী-সংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী তিন জন নিরাপদে কলিকাতা পৌঁছে গেছেন।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতা কিরণ মুখার্জী, ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ ইত্যাদির প্রচেষ্টায় কলকাতায় তখন "সরস্বতী প্রেস ও লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দোকান "যুগান্তর" দলের নেতাদের খুব বড় ঘাঁটি ছিল। তখনকার দিনের বিপ্লবী সাহিত্যের মধ্যে অনেক বই এই "সরস্বতী লাইব্রেরী" থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায়ও অনেক বিপ্লবী বই ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্প ইতিহাস এখান থেকে অবিভক্ত বাংলার সব দলের বিপ্লবীরা কিনত। এই বিপ্লবী নেতারা তখন "স্বাধীনতা" নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকা তখন বামপন্থী কংগ্রেসীদের সমর্থন করত এবং সুবিধাবাদীদের তীব্র সমালোচনা করত। ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের খবর কলিকাতায় ১৯শে এপ্রিল বিকালে বিশেষ সংখ্যা "দৈনিক নায়ক" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তাতে কিছু ভুল খবরও থাকে। পরের দিন (২০শে এপ্রিল) ইংরেজী ও বাংলা দৈনিকে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের খবর প্রকাশ হয়ে সারা বাংলায় এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এর মধ্যে সাপ্তাহিক "স্বাধীনতা"র সম্পাদকীয় "ধন্য চট্টগ্রাম" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থান সম্পর্কে রক্তক্ষরা ভাষায় এই উদ্দীপনাপূর্ণ সম্পাদকীয় মারফত বিপ্লবী বাংলার মর্মকথা এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে, সারা বাংলায় তা এক নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। সেই সম্পাদকীয় প্রকাশের পরে পুলিশবাহিনী ঐ ছাপাখানা তল্লাসীর নামে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সরকার ঐ পত্রিকাটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন।

এই চারজন মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবীর পরবর্তী কার্যাবলী সম্পর্কে আবার আলোচনা করা হবে এখন আমরা মূল দলের কথায় ফিরে যাই।

২২শে জুলাই, ১৯৩০ রাত্রে জালালাবাদ পাহাড় থেকে ফিরবার সময় অন্ধকারে ও ক্লান্তিতে খুব শৃঙ্খলার সহিত সমগ্র দল এগিয়ে যেতে পারে নি। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ও নির্মল সেন এবং বাকী ১৪ জন বিপ্লবী একটা দলে ছিলেন। লোকনাথ বল, কালচীপদ চক্রবর্তী, ইত্যাদি বিপ্লবীরা মূল দল থেকে অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ রাত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

বার

সূর্য সেন পরিচালিত ১৬ জন বিপ্লবী পুরা সামরিক পোষাকে ২৪শে এপ্রিল রাত্রে নয়াপাড়া গ্রামে সূর্য সেনের নিজ বাড়ীতে উপস্থিত। তখন তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর কমল সেন ও জেঠতুত বড় ভাই শিক্ষক চন্দ্রনাথ সেন বাড়ীতে ছিলেন। বড় ভাই খাকী সামরিক পোশাকে, বুকের উপর বড় একটি উজ্জ্বল তারকা শোভিত সূর্য সেনকে নিজবুকে টেনে নেন। তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা ও কিছু ধুতি শার্ট যোগাড় করার জন্য মাষ্টারদা যখন বলেন তখন ওখানে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ছয় সাত দিন পর পরিবারের স্নেহসিক্ত পরিবেশে বিপ্লবীরা কেবল ডাল আর আলুসিদ্ধ দিয়ে অমৃতের মত ভাত পেট ভরে খেতে পান।

রাত ১১টায় বিপ্লবীরা আসেন, রাত ১টায় তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেন। মাষ্টারদার নিজ পরিবার থেকে মাত্র ৭ জনের উপযোগী ধুতি শার্ট পাঞ্জাবী যোগাড় করা সম্ভব হয়। বাকী ৯ জনের জন্য বেসামরিক পোশাক অন্য বাড়ী থেকে যোগাড় হয়।

এই সময় মাষ্টারদা, নির্মল সেন ইত্যাদি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ হয় যে, এতবড় দল নিয়ে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। কাজ এখনও অনেক অসমাপ্ত আছে। বিচ্ছিন্ন বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং শত্রুদের সঙ্গে আরও অনেক সংঘর্ষ ও সংগ্রাম এবার গেরিলা পদ্ধতিতে করতে হবে। সেজন্য যারা অস্ত্রগার দখলে যোগ দেবার আগে পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যাক এবং ক্রমে স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ কাজে যোগ দিক, এই সিদ্ধান্ত হয়। আবার যখনই কোন জরুরী আহ্বান দলের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে যাবে, তখনই তাকে ছুটে আসতে হবে।

যারা সেদিন দেশের ডাকে এই বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক ও ছাত্র। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল,

বাঘা যতীনের আত্মত্যাগ তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, চরম আত্মদানের জন্য তাদের মনকে তৈরী করেছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-সব স্বাভাবিক দোষ তা থেকে তাদের সবাই মুক্ত হতে পারেন নি। তাই বিপ্লবী দলের কর্মকৌশলের অঙ্গ হিসাবে, গোপনীয়তার ও ভবিষ্যৎ গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রামের প্রয়োজনে যাদের ঐ ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাদের সকলকে ভবিষ্যতে আর এই বিপ্লবী কাজের জন্য পাওয়া যায় নি। দ্বিধা, ভয়, দুর্বলতা কাউকে আটকে রেখেছে, পিতামাতার স্নেহের অন্ধতা কাউকে বিচলিত করেছে। কোন কোন অভিভাবক নিজের পুত্রকে বিপ্লবী দল থেকে রক্ষা করার উপায় হিসাবে নিজে ছেলেকে থানায় নিয়ে হাজির করে দিয়েছেন। পুলিশের হেফাজতে থাকা তবু নিরাপদ, প্রাণ তাদের হারাতে হবে না এমন মনোভাব নিয়ে ঐ সব অভিভাবক অনেক তরুণ বিপ্লবীকে জোর করে ধরিয়ে দিয়েছেন। তবে ফিরে আসার ওয়াদা করে, মরণ পথের এই সব ভুখা সাথীদের জন্য নিজগ্রামে গিয়ে খিচুড়ী রান্না করিয়ে আনতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি তেমন দুর্বলতাও কোন কোন বিপ্লবী দেখিয়েছিল। আজ আমরা বিচার করলে দেখি, ঐ দুর্বলতা দূর করার মত চেতনাবোধ জাগাবার শিক্ষা তখনকার বিপ্লবী নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। দেশকে স্বাধীন করব, বিদেশী ইংরেজ শাসককে দূর করে দেব, তার সঙ্গে দরকার হলে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ দেব, নিজেকে নিঃশেষ করে দেব দেশের মুক্তির জন্য—এই ছিল তখনকার রোমাঞ্চকর শিক্ষা। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বপ্ন, আরাম এ সবের কামনা কেমন করে সমষ্টি স্বার্থে সচেতনভাবে বিলিয়ে দেওয়া যায় এবং তা কেমনভাবে আমাদের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে—সেই চেতনা সেদিন জাগেনি ঐ সব স্কুল কলেজের ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে। তাই জালালাবাদ যুদ্ধে এমন গৌরবজনক জয়লাভের পরও, চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব নিজ দলের সকলকে নিজ নিজ কর্তব্যে বহাল রাখতে অক্ষম হয়েছিল। দুর্বলতাকে জয় করার মত মনের জোর ও চেতনা শক্তি তখন যে ছিল না, এ কথা আজ স্বীকার করতে হবে।

নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যাবার প্রস্তাবে অনেক তরুণ বিপ্লবী আবার খুব আপত্তি তুলল। তারা লড়বে, দেশের জন্য তারা মরবে, কত কাজ তখনও বাকী। সেদিন (১৮ই এপ্রিল) 'গুড-ফ্রাইডে'

থাকাতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা সম্ভব হয়নি। ঐ সব ইংরেজ সাহেব মেমদের মারতে হবে। যে নরেশ রায়ের নেতৃত্বে ঐ দল সেদিন গিয়েছিল সে জালালাবাদে শহীদ হয়েছে—তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হবে, ১৮ই ও ২২শে এপ্রিলের (১৯৩০) যেই স্মরণীয় পাঁচটি দিন সারা চট্টগ্রাম তথা বাংলা ও ভারতকে কাঁপিয়েছিল, তার চেয়েও জোর আঘাত আমরা আবার হানব, যার ফলে সারা দেশে জ্বলে উঠবে বিপ্লবের দাবানল, তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল, দূর হয়ে যাবে বিদেশী শাসককুল—আবার আমরা স্বাধীন হব। এই দাবী সঙ্গত বলে মাষ্টারদা, নির্মল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন এবং অনুরূপভাবে ব্যবস্থা হবে বলে উৎসাহী বিপ্লবীদের জানিয়ে দেন। তারপর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মগোপনের ব্যবস্থা হয় এবং কঠিন পুলিশ ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে মাষ্টারদার সঙ্গে অন্যান্য সব বিপ্লবী নেতা ও সাথীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সফলভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়।

বিচ্ছিন্ন হবার পর বিপ্লবী তরুণদের প্রথম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে কালারপোলে ৬ই মে ১৯৩০ ইং তারিখে। তরুণ ছয়জন বিপ্লবী, রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, স্বদেশ রায়, ফণীন্দ্র নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী মাষ্টারদার কাছে বলে যে, ঐ নিষ্ক্রিয় জীবন তাদের পক্ষে অসহ্য। অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আত্মগোপন করার চেয়ে তারা চায় সংগ্রাম। তারা প্রস্তাব করল, সদরঘাট জেটির কাছে ও পাহাড়তলীতে যেই দুইটি ইউরোপীয়ান ক্লাব আছে, ঐ দু'টি আক্রমণ ও ধ্বংসের জন্য তাদের অনুমতি দেওয়া হোক।

তরুণ সাথীদের সেই সংগ্রামী দাবী মাষ্টারদা গ্রহণ করেন। তখন এই বিপ্লবীরা শহরের ফিরিঙ্গিবাজারে কর্ণফুলীর উত্তর পাড়ে রজত সেনের বাসায় গিয়ে গোপনে পৌঁছে যায়। রজতের স্নেহাকুল মা কয়েকদিন পূর্বে সন্তানের অন্তর্ধানে তার জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন। অক্ষত অবস্থায় তাঁর ছেলে ও তার সাথীদের কাছে পেয়ে মাতৃ হৃদয়ের সকল মাধুরী মিশিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি কিছু রেঁধে তাদের খেতে বসিয়ে দিলেন। রজত এসেই বলেছিল, তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। মা কি জানতেন যে, তাঁর বুকের ধন, নয়নের মণি রজতের জন্য সেই ছিল তাঁর শেষ আয়োজন? খেতে বসার একটু পরই রজতের ছোট

ভাই বোনরা চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশ', 'পুলিশ'। তখন তারা ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কর্ণফুলী নদী তীরে চলে যায়।

৫ই মে তারিখে রজত সেন, স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী আর মনোরঞ্জন সেন তাদের গোপন আস্তানা থেকে রিভলভার, পিস্তল, গুলী আর ভোজালী ইত্যাদি অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এল উপরোক্ত পরিকল্পনা নিয়ে। অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র কাপড় চোপড়ের আড়ালে লুকানো আছে। রজত সেনের পিতা শ্রীরঞ্জন সেন (বাড়ী কোয়েপাড়া, রাউজান থানা) ছিলেন শহরে জজ-কোর্টের উকিল। তাঁদের বাসা ছিল শহরের দক্ষিণাঞ্চলে ফিরিঙ্গী বাজারে। এই ছয়জন বিপ্লবী তরুণ রাত্রে শহরে এসে প্রথমে রজত সেনের বাসায় উঠে। জালালাবাদ সংগ্রামের পরে প্রত্যেক গৃহে অনুপস্থিত পুত্রের জন্যই পিতামাতার ছিল নিদারুণ শঙ্কা। কে বেঁচে আছে, কারা শহীদ হয়েছে, তার সঠিক সংবাদ তখনও জনসাধারণ জানত না। তাই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই রজতের মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর রজতের পাঁচজন সাথীও মায়ের পদধূলি নেয়—এই মুহূর্তে সবার মা এই রজতের মায়ের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছেন। ওদের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সুযোগও নেই। তাড়াতাড়ি রজতের মা কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। যেই বিপ্লবীরা খেতে বসতে যাবে, তখন বাইরে পাহারারত পিতা ও ছোট ভাই ছুটে এসে খবর দেয়, পুলিশের দল একটা আসছে। শহরে টহল দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকবার এই রকম কয়েকটি বাসায় একবার হানা দেওয়া তখন এই সব পুলিশের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ওখানে গিয়েই একখানা সাম্পান নিয়ে তারা কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ে পাড়ি দিল। পুলিশ বাসায় ঢুকেই খুব তাড়াতাড়ি সব কামরা দেখে নদীর পাড়ের দিকে ছুটে গেল। ওখানে তারা খবর পায় যে, ছয়জন যুবক একটু আগেই সাম্পান নিয়ে নদী দিয়ে এগিয়ে গেছে। পুলিশের দল মোটরলঞ্চ নিয়ে পিছনে ধাওয়া করতে কিছুটা সময় নেয়। কালার-পোলের কাছে বিপ্লবীরা প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় বিপ্লবীদের সাম্পানের উপর লঞ্চের সন্ধানী তীব্র আলো এসে পড়ে। তখন মাঝি ভয়ে সাম্পান না চালাতে চাইলে রজত সেন তার বুকের উপর রিভলভার

ধরে বলে, অদূরে কালারপোল তাকে যেতেই হবে। খুব তাড়াতাড়ি বেয়ে কূলের কাছাকাছি যেতেই বিপ্লবীরা পুলিশের লঞ্চ এসে পৌছার পূর্বে লাফিয়ে পড়ে।

এভাবে রাত্রে ছয়জন যুবককে দৌড়াতে দেখলে যে কোন লোকের পক্ষে তা সন্দেহজনক হবে। তার উপর ঘন ঘন হর্ণ—চীৎকার শোনা যাচ্ছে পুলিশ লঞ্চের। তাই কালারপোলের কিছু গ্রামবাসী তাদের পিছু নেয়। চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের খবর এরাও শুনেছে। কেউ কেউ আবার বিপ্লবীদের ধরার জন্য পুরস্কারের কথাও শুনেছে। কেউ পুরস্কারের লোভে, কেউ বা মজা দেখার জন্য ওদের পিছন পিছন যেতে থাকে। প্রথমে তারা আবেদন করে সবাইকে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। লোকসংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। তখন ভয় দেখাবার জন্য বিপ্লবীরা পিছন দিকে রিভলভার থেকে গুলী ছোঁড়ে। তার ফলে একজন গ্রামবাসী আহত হয়, ফলে বিপ্লবীদের অনুসরণকারী দলের জিদ আরও বেড়ে যায়।

বিপ্লবীরা মাঠে নেমে ফাঁকা জায়গায় গুলী করতে করতে অন্ধকারে এগিয়ে যেতে থাকে। ওদিকে পুলিশের দল লঞ্চ থেকে নেমে তাদের পিছনে চলেছে। রাত প্রায় বারটায় খবর পেয়ে পটিয়া থানা থেকে আরও পুলিশ এসে গেছে।

উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের অধীনে কয়েকটি সশস্ত্র পুলিশ দল কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন বিপ্লবীদের সংখ্যা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না। চট্টগ্রামে ১৯৩০—এর ১৮ই থেকে ২২শে এপ্রিলের মধ্যে বিপ্লবীদের যেই বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী ও যেই সাম্রাজ্যে 'সূর্য অস্তমিত হয় না' বলে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচিত হ'ত, তার সমুদ্ধত অহমিকার চরম বিপর্যয় ঘটেছে, সেখানে তাদের সেই গোলামরা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য 'ডাকাত', 'ডাকাত' বলে চেঁচাতে থাকে। গ্রামের বহুলোক তা বিশ্বাস করে, বিপ্লবীদের পিছন পিছন তাড়া করতে থাকে। নিরপরাধ দেশবাসী হতাহত হতে পারে এই ভয়ে বিপ্লবীরা তাদের দিকে গুলী না ছুঁড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য একটি যোগ্য

স্থানের আশায় অথবা কালারপোল পুলের উপর দিয়ে শহরে ফিরবার জন্য দৌঁড়াতে থাকে। এই অবস্থায় ফণীন্দ্র নন্দী প্রথমে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সামরিক পোষাক পরিহিত ও সশস্ত্র এই তরুণ গিয়ে পড়ে বৃদ্ধ চাষী মনসুর আলীর সামনে। হৈ চৈ শুনে বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ফণীন্দ্রকে ঐ অবস্থায় দেখে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে নিয়ে মাচার তলায় লুকিয়ে রাখেন। পশ্চাদ্ধাবনকারীরা একটু 'পরই এসে ঐ ডাকাত ঐদিকে এসে কোথায় গেল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি দেখতে পান নি বলে দেন। পরে বৃদ্ধের সঙ্গে শত্রুতামূলক সম্পর্কের এক আত্মীয় মাচার তলায় খড়ের মধ্যে নড়াচড়া লক্ষ্য করে পুলিশকে খবর দিলে, ফণীন্দ্র তাদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যায়।

অন্যদিকে বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরী অগ্রবর্তী হয়ে, শহরে পার হবার নিরাপদ রাস্তা দেখতে গিয়ে অন্ধকারে কালারপোল পুলিশ-বিটের সামনে পড়ে যায়। সেখানে খুব বলিষ্ঠ দুইজন কনষ্টেবল পিছন থেকে তাকে জাপ্‌টে ধরে ফেলে।

তখন অন্য চারজন বিপ্লবী অন্যদিকে ঘুরে ছুটতে ছুটতে আর একজন মুসলিম চাষীর সামনে পড়ে যায়। তিনি তাদের দেখে সবই বুঝতে পারেন এবং তাড়াতাড়ি নিকটেই যেই শণঘাসের ক্ষেত ছিল তার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বলেন। বিপ্লবীরা তখনই ঐ ক্ষেতে প্রবেশ করে। কিন্তু সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ও গ্রামবাসীর দল দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে, ঐ শণক্ষেত ঘিরে ফেলে।

বিপ্লবীরা তখন সিদ্ধান্ত করে, আত্মসমর্পণ তারা করবে না, লড়তে লড়তেই তারা প্রাণ দেবে। তাই তাদের পক্ষ থেকেই প্রথম গুলীবর্ষণ শুরু হয়। বাইরে থেকে সশস্ত্র বাহিনীও প্রবল গুলীবর্ষণ শুরু করে। আট দশ মিনিট গুলী চলার পর ক্ষেতের মধ্য থেকে গুলী আসা বন্ধ হল। পুলিশ যখন প্রত্যেকের গায়ে ছয় সাতটি গুলীর আঘাতপ্রাপ্ত এই অমর বিপ্লবীদের বাইরে নিয়ে এল, তখন তাদের হাতে মুষ্টিবদ্ধ রয়েছে অস্ত্রাগার দখলের পরে প্রাপ্ত রিভলভার। দেবপ্রসাদ গুপ্তের মৃত্যু কয়েক মিনিট পরই হয়, রজত, স্বদেশ ও মনোরঞ্জন আগেই শহীদ হয়ে গেছে।

বীরের ঐ রক্তস্রোত দেখে উপস্থিত গ্রামবাসী বেদনায় অভিভূত হল। মিথ্যা 'ডাকাত' অপবাদ যাদের ইংরেজ শাসকের গোলামরা দিয়েছিল, তারা যে তাদেরই বীর সন্তান, তা দেখে হৃদয় তাদের গর্বে ভরে উঠল।

তাদের নিজের দেশেরই এই চারজন তরুণ বিপ্লবী বীরের জন্য নীরব শ্রদ্ধা তাদের সজল চোখগুলিতে প্রতিভাত। পনর বছর আগে বালেশ্বরের বুড়ী বালামের তীরে বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীন আর তার সাথীরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিল, তারই ধারাকে এই চারিটি সাহসী বিপ্লবী অনুসরণ করে চলেছে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, শত্রুর কাছে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ নয়—দেশের মুক্তির জন্য লড়তে লড়তে বীরের এই আত্মদান, এই মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে চট্টগ্রামের এই চারজন বিপ্লবী বীর। কালারপোল সংঘর্ষের এই শহীদদের প্রতিও মানবিক সাধারণ ব্যবহার বিদেশী শাসকদের অনুচররা সেদিন করেনি। সহজেই তারা এই মৃতদেহগুলি শহরে এনে আত্মীয় স্বজনের হাতে দিতে পারত কারণ ইংরেজের মীরজাফরীদল গোয়েন্দারা তাদের সনাক্ত করতে পেরেছিল। এই বীর শহীদদের ফটো তুলে ঐখানেই পেট্রল দিয়ে তাদের পবিত্র দেহগুলি ভস্মীভূত করা হয়। যেই স্বদেশ রায়কে প্রথম অভিযানের দিন সংগ্রামী তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল না, যে নিজে থেকে গিয়ে ১৮ই এপ্রিল রাত্রে ইউরোপীয়ান ক্লাবের কাছে স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, তার চারদিন পরে, জালালাবাদ যুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে এসে, বিপ্লবী জীবনের মাত্র উনিশদিন পরে সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মত সে আত্মদান করল।

স্বদেশ, দেবপ্রসাদ, মনোরঞ্জন ও রজত—কালারপোল সংঘর্ষের এই চারজন বিপ্লবী শহীদের আত্মদান সেদিনকার বাংলায় ও ভারতে নূতন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। চট্টগ্রামের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের মধ্যেও এই সাথীদের সাহসিকতাপূর্ন সংগ্রাম নূতন প্রেরণা জাগায়।

তের

এবার আমরা কলিকাতায় অবস্থানরত গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল আর আনন্দগুপ্তের কথায় আর একবার ফিরে যাই।

ফেণীতে বিচ্ছিন্ন হবার পর অনন্ত সিংহ একাকী এসে কলিকাতা কি করে পৌঁছেন তা আগেই বলা হয়েছে। গণেশ ঘোষ, মাখন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্তও প্রায় একই সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হন। চট্টগ্রামের সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবীদলের সঙ্গে বাংলার অন্যতম প্রধান বিপ্লবীদল "যুগান্তরের" গভীর সম্পর্কের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ ও কালারপোল সংঘর্ষের পর সারা বাংলা ও ভারতে বিপ্লবীদলের মর্যাদা ও সম্মান খুবই বেড়ে গেছে। তার উপর চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের প্রতি সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা তখন বিশেষভাবে উদ্বেলিত। অস্ত্রাগার দখল হবার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ বিস্ময়কর সাহসিকতাপূর্ণ অভ্যুত্থানের প্রধান দুইজন নায়ক গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের কলিকাতায় উপস্থিতি তাই কলিকাতার বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে এক নূতন সাড়া জাগায়। যুগান্তরের প্রধান একটি দল তখনকার খুলনা দলের সঙ্গেই চট্টগ্রামের এই বিপ্লবীদের প্রথম যোগাযোগ হয়। তারপর মুন্সীগঞ্জের দল মাদারীপুরের দল ইত্যাদিও নানাভাবে তাদের জন্য গোপন আশ্রয়স্থল যোগাড় করা, অর্থ সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করেছিল।

তবে এই কথা আজ বলতে হবে যে এই পলাতক চারজন চট্টগ্রাম বিপ্লবীকে নিজ নিজ উপদলের আওতায় রেখে গৌরবের অংশীদার হবার চেষ্টাও এই বিপ্লবীদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ তখন কলিকাতায় অন্যান্য বিপ্লবী উপদলের সঙ্গে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন, কলিকাতার

উপর কিছু করা যায় কিনা। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্যরা কাজ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। দেশের মুক্তির জন্য চট্টগ্রামের প্রদর্শিত পথে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য, ব্যক্তিগতভাবে বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যার দ্বারা তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য বিপ্লবীদলের তরুণরা নিজ নিজ নেতৃত্বকে বেশ চাপ দিতে থাকে। এই সময় চট্টগ্রামের দুই প্রধান বিপ্লবী নেতার কলিকাতায় কিছু বৈপ্লবিক কাজ করার প্রস্তাব বিশেষ সমর্থন লাভ করে। কোন কোন বিপ্লবী উপদলের নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব দেখাবার ফলে, তরুণ সদস্যরা নেতৃত্বকে অবহেলা করেই সরাসরি চট্টগ্রামের এই বিপ্লবীদের সঙ্গে অবিলম্বে কাজের দাবীতে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

কলিকাতায় মির্জাপুর ট্যাংক লেন, শাঁখারীটোলা, খিদিরপুর ইত্যাদি নানা গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে এই চারজন বিপ্লবী যখন ছিলেন, তখন সেখানকার মা বোনেরা এঁদের যেমন করে সেবা করেছেন, তার তুলনা নেই। জীবনে প্রথম দেখা, অথচ আপন সহোদর বা পুত্রের মত এই বিপ্লবীরা পরিবারে গৃহীত হয়েছে। ৫০০০৲ টাকা করে যাদের মাথার উপর পুরস্কার ঘোষিত, তেমন দুইজন চট্টগ্রাম বিপ্লবী ও তাদের অন্য দুই পলাতক বিপ্লবী সাথীকে রাখা, তখনকার দিনে কতবড় দুঃসাহসের কথা তা বলাই বাহুল্য। দেশের মুক্তির জন্য আত্মদানের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই বিপ্লবীদের মত আর পথের কথা দেশের মানুষ বেশী ভাবত না—এদের অম্লান দেশপ্রেমকে মানুষ এতটা গভীর শ্রদ্ধা করত যে, শত বিপদ ও লোভকে তুচ্ছ করে দেশের মানুষ পলাতক বিপ্লবীদের তখন আশ্রয় দিয়েছে।

কলিকাতার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় স্থির হয়েছিল, কলিকাতার ইউরোপীয় হোটেলগুলি এক সন্ধ্যায় একই সময় বিপ্লবীরা আক্রমণ করবে। তাতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা দুইজন দুই দলের নেতৃত্ব করবেন, অন্য দুইজনও সঙ্গে থাকবে আর অন্য দলের কোন কোন নেতা অন্য আক্রমণকারী দলে থাকবে। কাজে উৎসাহী বিভিন্ন বিপ্লবীদলের তরুণদের ঐ আক্রমণকারী দলে নেওয়া হবে। এই পরিকল্পনায় সাহায্যের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ, বিস্ফোরক ও বোমা

নির্মাণ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে। এদিকে কলিকাতায় চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের পলাতক নেতাদের উপস্থিতি সম্পর্কে পুলিশের কানে কিছু আভাস পোঁছে গেছে। তাই এই চারজন বিপ্লবীর কলিকাতায় আর বেশী দিন থাকা সম্ভব হলো না।

ফরাসী চন্দননগরেও তখন 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত কিছু বিপ্লবী কর্মী ছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চট্টগ্রামের এই চারজন বিপ্লবীকে ফরাসী চন্দননগরে গোপন আশ্রয় স্থলে রাখার ব্যবস্থা হয়।

আগেই বলা হয়েছে, তখনকার দিনে কলিকাতা পুলিশ কমিশনার টেগার্টের বিরুদ্ধে বাংলার প্রত্যেক বিপ্লবী দলের ঘৃণা অত্যন্ত তীব্র ছিল। তাই টেগার্ট-হত্যার বহু প্রচেষ্টা বিপ্লবীরা করে, কিন্তু কোনবারই তা সফল হয়নি। টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলে অন্য একটি ইংরেজকে হত্যা করে কলিকাতার বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ফাঁসী বরণ করেছিলেন। তাই ১৯৩০-এর মে অথবা জুন মাসে টেগার্ট হত্যার আর এক প্রচেষ্টা হয়। খুলনা বিপ্লবী দলের অনুজা সেন ডালহৌসী স্কোয়ারের পাশে টেগার্টের মোটরে বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমা প্রস্তুতে ত্রুটি থাকায় বোমাটি অনুজা সেনের জীবনাবসান ঘটায়। টেগার্ট অক্ষত থাকে, কেবল তার মোটর গাড়ীতে বোমার টুকরা গিয়ে লেগে কিছু ক্ষতি করে।

এরপরে কলিকাতার পুলিশ ও গোয়েন্দা বহু তরুণকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের উপর চরম নির্যাতন ও অত্যাচার করে। তারপর আরম্ভ হয় ডালহৌসী স্কোয়ার বোমা মামলা। ডালহৌসী স্কোয়ার মামলা উপলক্ষে যেসব বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয় তাতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের এক বড় বোমার কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করতে পারে এবং বিপ্লবীদের পূর্ব-পরিকল্পিত কলিকাতা ইউরোপীয় হোটেল আক্রমণ ব্যাপার আর কার্যকরী হয় না।

এই সময় পত্রিকা মারফত জানা যায় চট্টগ্রামে এক তরুণ বিপ্লবী পুলিশের কাছে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে রাজসাক্ষী হয়েছে। পুলিশের জঘন্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আরও

কিছু ধৃত বিপ্লবী পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেয় কিন্তু যাকে পুলিশ রাজসাক্ষী ঘোষণা করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা শুরু করেছিল, তার স্বীকারোক্তি থেকেই পুলিশ অনেক কিছু জানতে পারে। চন্দন-নগরের গোপন আস্তানায় বসে যখন চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ আসন্ন কলিকাতা অভ্যুত্থানের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তখন চট্টগ্রামে তাঁরই এক প্রিয় সাথীর ঐ স্বীকারোক্তির কথা জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। তাঁর বিশ্বাস হয় তিনি সামনে থাকলে ঐ স্বীকারোক্তি অবশ্যই প্রত্যাহৃত হবে। কয়েকদিন তিনি নিজে ঐ বিষয় চিন্তা করেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযাত্রী গণেশ ঘোষকে বা অন্য দুই তরুণ সাথীকে কিছু না বলে নিজেই এক কর্মপন্থা স্থির করলেন যে, তিনি সোজা গিয়ে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ঘাঁটি লর্ড সিংহ রোডের আপিসে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন। তিনি নিজে এই সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা নীচে দেওয়া হল:

'২৮শে জুন ১৯৩০ কোন বিশেষ কারণে আমি কলিকাতার প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের আপিসে (১৩-১৪ নং লর্ড সিংহ রোড) নিজে গিয়ে উপস্থিত হই। এতে জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারী মহলে বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। ১৯২৩শে শালখিয়া বাঁধা ঘাটে আমি গ্রেপ্তার হওয়ার পরে আমাকে এই আপিসে নেওয়া হয়েছিল এবং অত্যন্ত বিরক্তিকরভাবে গোয়েন্দা কর্মচারীরা আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। গোয়েন্দারা তখন আমার নাম বার বার করে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু কিছুতেই তখন আমি আমার নাম পর্যন্ত পুলিশকে বলিনি।

১৯৩০শে আমি ধরা দেওয়ার পরে তারা যথাসাধ্য আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল, এভাবে আমার আত্মসমর্পণ করার প্রকৃত কারণ কি। এমন কি ১৯৩২শে আন্দামান যাত্রার একদিন আগে পর্যন্ত, আই-বি কর্মচারীরা আমার আত্মসমর্পণের প্রকৃত কারণগুলি তাদের কাছে পুনরা-বৃত্তি করার জন্য বার বার অনুরোধ করে। কিন্তু সব সময় তারা হতাশ হয়েছে। আমার ধরা দেওয়ার আগে বাংলা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানের কাছে নীচের চিঠিখানা লিখি:

(তিনি ১৯৩০ এর ২৭শে জুন রাত্রে বসে তখনকার পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানকে এক ইংরেজী চিঠি লেখেন।

নীচে তার অনুবাদ দেওয়া হোল)

প্রিয় মিঃ লোম্যান,

২৮শে জুন, ১৯৩০ ইং আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি আমাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করার সুযোগ যে আপনি হারাবেন না তা নিঃসন্দেহ, হ্যা আমিও তার জন্যে প্রস্তুত। দয়া করে একথা ভেবে খুশী হবেন না যে, আমি আত্মসমর্পণ করতে চলেছি। কখন একজন আত্মসমর্পণ করে? যখন সে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে আর আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না, তখনই সে ধরা দেয়।

আমি কি একজন অসহায়? কখনও নয়। আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র আমার আছে। প্রয়োজনমত খরচ করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আমার আছে, অনেক সহায়কারী আছে। বাংলাদেশে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিংবা ভারতের বাহিরেও আমার আত্মগোপন করে থাকার মত অনেক আশ্রয়স্থল আছে, আজও আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে পলাতক জীবনে বেশ নিরাপদেই আছি। তবুও আমি নিজে ধরা দিতে যাচ্ছি? আপনি কি মনে করেন আমি নিজ কাজের জন্য অনুতপ্ত? না তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কি আমি এই কাজ করছি। না—এ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইতি—

বিপ্লবী
অনন্তলাল সিংহ

চিঠি দেওয়ার পর সত্যাই যে অনন্তসিংহ কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশের সদর দফতর ইলিশিয়াম রোডে (বর্তমান লর্ড সিংহ রোড) উপস্থিত হবেন, তা পুলিশের লোক বিশ্বাসই করতে পারেনি। অথচ ২৮শে জুন অনন্ত সিংহ চন্দননগরের আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে যখন কলিকাতায় এসে ইলিশিয়াম রো-আপিসে একটি ছোট কাগজের টুকরায় লিখে পাঠালেন,

'অনন্ত সিংহ গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চান'।

তখন তারা একরকম অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কারণ তাদের ধারণা অনন্ত সিংহ সম্পর্কে অনেক সাংঘাতিক। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য ঘোষিত, কিন্তু প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষ ছাড়া তাঁকে জীবিত ধরার কোন আশাই তাদের ছিল না। তাই দল বেঁধে প্রথমে

সশস্ত্র অবস্থায় দূর থেকে একবার তারা দেখে ভাবল, কে জানে কি কপট উদ্দেশ্যে এই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী ওখানে গেছে, হয়ত বা পোশাকের ভিতরে পিস্তল, রিভলভার লুকানই রয়েছে। বেশ দূর থেকে পুলিশ তাঁকে আদেশ দেয়, "হাত উপরে" (হ্যাণ্ডস্ আপ্)।

তারপর তারা এগিয়ে এসে তাঁর দেহতল্লাসী করে যখন দেখে যে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তখন তারা আশ্বস্ত হয়। অনন্ত সিংহ বলেন, তাদের ভয়ের কিছু নেই, তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছেন।

অস্ত্রাগার দখলের পরে চট্টগ্রামে অনন্ত সিংহের পিতা গোলাপ* সিংহ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনন্দলাল সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাঁদের উপর নানা জুলুম করা হয়। ঐ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য তাঁর বড় বোন ইন্দুমতী সিংহ পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে নিয়ে যখন অনন্ত সিংহের সামনে উপস্থিত করেন তখন তাঁর দিদিও বিস্মিত হয়ে পড়েন।

পুলিশ নিয়মমত জবানবন্দী নিয়ে খুব ভাল সশস্ত্র পাহারা দিয়ে অনন্ত সিংহকে চট্টগ্রাম জেলে পাঠিয়ে দেয়। তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা শুরু হয়ে গেছে। একজন ইংরেজ জজকে সভাপতি করে বিশেষ বিচারালয়ে (স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল) এই মামলা চলে।

অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণের সংবাদ বড় হরফে পরদিন যখন সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল, তখন সারা বাংলায় এর কারণ সম্পর্কে নানা মন্তব্য গবেষণা ও সমালোচনা চলতে থাকল। আর চন্দননগরে গণেশ ঘোষ, মাখন আর আনন্দ খুব ব্যথিত হয়ে চিন্তা করতে থাকেন, এই আশ্রয়স্থলে আর থাকা ঠিক হবে না।

এই বাড়ী অবশ্য বেশ নিরাপদ ছিল। বিপ্লবীদল থেকে এই বাড়ীর বাসিন্দাদের স্বাভাবিক দেখাবার জন্য খুব চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিপ্লবী কর্মী শশধর আচার্যকে এই বাড়ীর প্রধান ভাড়াটিয়া

---

* নন্দনকানন তামাকুমণ্ডীতে তাঁর বাসা ছিল, সেই রাস্তার নাম এখন চট্টগ্রাম পৌরসভা "গোলাপ সিংহ লেন" দিয়েছেন।

স্থির করা হয়। তাঁর সঙ্গে পূর্বে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বাল্যবিধবা শ্রীযুক্তা সুহাসিনী গাঙ্গুলী কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর উপর বিপ্লবীদলের নির্দেশ হল, এক কঠিন অভিনয় তাঁকে করতে হবে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিখ্যাত পলাতক বিপ্লবীদের রক্ষা করার জন্য। পূর্বোক্ত শ্রীশশধর আচার্যের সঙ্গে বাইরের লোকের কাছে তাঁর স্ত্রীর পরিচয়ে তাঁকে থাকতে হবে। এই "পরিবারের" সঙ্গে চট্টগ্রামের চারজন বিপ্লবী অস্থায়ী ভাড়াটিয়া পরিচয়ে চন্দননগরের ঐ বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিল।

অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণের পরে আরও কিছুদিন কেটে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার যাদের উপর ঘোষিত তেমন আর একজন বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বল এই সময় কলিকাতা এসে পৌঁছান। গোপনে তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা হয়ে নারায়ণগঞ্জ যান। ওখানে ঢাকার অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যে অনুশীলন দলেরও সাহায্য তিনি পান।

তাঁর কলিকাতা আসবার ব্যবস্থা বেশ চমকপ্রদ। তিনি ঢাকা থেকে ভাল ইউরোপীয় স্যুট যোগাড় করেন। জনৈক বিপ্লবী যুবককে আপিসের আর্দালীর পাগড়ি, কোমরবন্ধ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পোশাকে সজ্জিত করা হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর টিকেট করে গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান একটি স্যুটপরা লোক যখন পিছনে আর্দালী নিয়ে জাহাজের কেবিনে গিয়ে উঠল, তখন সবাই ভাবল কোন বড় ইংরেজ কর্মচারী যাচ্ছে। ষ্টীমার ঘাটে বহু পুলিশ আর গোয়েন্দা তখন লোকনাথ বল ও অন্যান্য পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধান করছে। ষ্টীমারেও প্রতিটি লোককে গোয়েন্দারা পুলিশ গেজেটে প্রকাশিত বিভিন্ন পলাতক বিপ্লবীর ফটো ও বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। হাতে আপিস ফাইল নিয়ে আর্দালীর পোশাকে 'সাহেবের' বাক্স ইত্যাদি নিয়ে অন্য বিপ্লবী তরুণটি অবশ্য গ্রামের, তাই তাকে চিনবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ষ্টীমারেও গোয়েন্দারা ঘুরে ঘুরে দেখছে, টিকেট পরীক্ষককে দিয়ে সন্দেহভাজন যাত্রীদের টিকেট দেখে গন্তব্যস্থল জেনে নিচ্ছে। উপরে টিকেট পরীক্ষা করতে গেলে আর্দালী বলে তার সাহেব একটু বিশ্রাম করছেন, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে, এই কথা তিনি বলেছেন। তখনকার দিনে 'সাহেব'কে বিরক্ত করার, তাদের চোখ

থেকে ঘুম কেড়ে নেবার সাহস কেবল বিপ্লবীদের ছিল। তাই 'সাহেব' লোকনাথ বল নির্বিঘ্নে ষ্টীমার থেকে গোয়ালন্দ রেলে উঠতে পারেন এবং পথের পাহারা সফলভাবে অতিক্রম করে কলিকাতা পৌঁছে যেতে পারেন।

লোকনাথ বলও কলিকাতায় 'যুগান্তর'দলীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলিকাতায় হাজরা রোড ইত্যাদি কয়েকটি গোপন কেন্দ্রে থাকার পর তাঁকেও চন্দননগর আশ্রয়স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন গণেশ ঘোষ ও অন্য দুই তরুণ বিপ্লবী লোকনাথ বলকে পেয়ে আবার নূতন উৎসাহে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও কাজ করতে থাকেন।

ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের গাড়ীতে বিপ্লবী অনুজা সেনগুপ্ত বোমা নিক্ষেপের পরে সারা কলিকাতায় খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার ও তারপরে ইলিশিয়াম রো-তে বর্বর অত্যাচার চলে। প্রায় দুইশত আড়াইশত জনকে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। তার ভিতর থেকে বাছাই করে একদলকে ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমার মামলায় আসামী করা হয়। এদের নাম যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হল, তারমধ্যে অন্যতম প্রধান নেতা কালীপদ ঘোষের নাম না থাকায় গোপন দলের তথ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিপ্লবীদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে। ঐ মামলায় যদি কাউকে আসামী দিতে হয়, তাহলে কালীপদ ঘোষকে দিতেই হবে এই কথা তাঁরা আলোচনা করছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে যুগান্তর উপদল চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের জন্য চন্দননগরের আশ্রয়স্থল স্থির করেছিল, কালীপদ ঘোষ ঐ উপদলের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ছিল এবং চন্দননগরের গোপন কেন্দ্রটি তার প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন ছিল। ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপের সময়ই ঐ উপদলের অনুজা সেনগুপ্ত বিস্ফোরণের ফলে নিহত হন। সেই সূত্রে পুলিশ ঐ দলের সঙ্গে অতি ক্ষীণভাবে সংযুক্ত প্রত্যেকটি বিপ্লবীকে ডালহৌসী স্কোয়ার বোমা মামলার আসামী করে দেয়। কিন্তু কালীপদ ঘোষ ধৃত হওয়া এবং তাকে ঐ মামলায় অন্যতম প্রধান আসামী করার মত কারণ থাকা সত্ত্বেও তাকে মামলার সময় দেখা যায় না।

পরে বিপ্লবীরা জানতে পারেন, তার অল্পদিন পরে গভীর রাত্রে টেগার্টকে তার দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের চন্দননগরের গোপন

আশ্রয়স্থল আক্রমণ করার জন্য তথ্য এই বিশ্বাসঘাতক কালীপদ ঘোষই সরবরাহ করেছিল। তাই তাকে ঐ মামলায় জড়িত করা হয়নি। তাকে নিরাপদে রাখার জন্য হাওড়া জেলের খালি-জেনানা ফটকে কিছুদিন রাখা হয়। তারপর ঐ জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে তাকে অল্পদিন রাখার পর বৃটিশ সরকার এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে তাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তাকে নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভালভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা করেছিল। খুলনার অধিবাসী এই বিশ্বাসঘাতক তার মুখ দেশের লোকের কাছে আর দেখাতে আসেনি।

চট্টগ্রাম-বিপ্লবীরা চন্দননগরের যে বিপ্লবীদের আশ্রয়ে ছিলেন, তার মধ্যে শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম বিপ্লবী সাথী। ফরাসী শাসন থেকে চন্দননগরকে মুক্ত করার জন্য যে বিরাট গণ-আন্দোলন হয়, তার অন্যতম নেতা হিসাবে তিনি পরে চন্দননগর স্বাধীন নগরীর শাসন-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের চন্দননগর আত্মগোপন এবং পরবর্তী পুলিশী অভিযান সম্পর্কে ঐ তিনকড়ি বাবুর বিবরণী (অন্যতম বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ সমর্থিত) নীচে দেওয়া হল :

"চন্দননগরে আমাদের গুপ্ত সমিতির কাজ চলত। চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত থাকায় বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল। বিভিন্ন বিপ্লবীদের জন্য আমাদের তাই অনেক সময় চন্দননগরে আত্মগোপনের জন্য আশ্রয়স্থল ঠিক করে দিতে হত। ১৯৩০শের জুন মাসের শেষের দিকে একদিন ভোরবেলা স্থানীয় বিপ্লবী কর্মী শান্তি (বসন্ত বন্দোপাধ্যায়ের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়) আমায় এসে ডাকল। তাদের কাছে জানলাম, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল অভ্যুত্থানের একজন নেতা চন্দননগর এসেছেন। পরে জেনেছিলুম তাঁর নাম গণেশ ঘোষ, আমাদের নাকি তাঁর ও অন্য তিনজন সাথীর জন্য গোপনে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। বসন্তদার বাড়ীতে গিয়ে দেখি, চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী নেতাটি ধীরভাবে এক কোণায় বসে আছেন। আলোচনায় স্থির হল ইনি দুইদিন থাকবেন এবং পাকাপাকিভাবে আশ্রয়স্থল স্থির হলে তিনি আবার কলিকাতা যাবেন এবং তাঁর অন্য তিনজন

সাথীকে সংগে করে আসবেন। তিনি ঐ দুইদিন আমার বাড়ীতেই রইলেন। আমার কারখানার কর্মী মেজভাই তাঁকে নিজেদের শ্রমিক সাথী বলেই পরিচয় দিলেন প্রতিবেশীর কাছে। আমাদের বাড়ীর লোকরা তাঁর সঙ্গে পূর্ব পরিচিতের মত এমন স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করলেন যে, কারও কোন সন্দেহ হল না।

ইতিমধ্যে গোপনে রাখার সব ব্যবস্থা হল। বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীশশধর আচার্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে টিকেট পরীক্ষকের কাজ করতেন। গোন্দল পাড়ায় তাঁর নামে একটি দোতলা পাকা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। শ্রীযুক্তা সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে (পুটুদি) অন্য জায়গা থেকে আনা হল। তিনি বিধবা হওয়ার পর থেকে শিক্ষকতা করতেন এবং গোপনে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই আশ্রয়স্থলের স্বাভাবিকতার জন্য পুটুদিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান হয়েছে, ঐ শশধর বাবুর স্ত্রী পরিচয় দিয়ে সধবার মত তাঁকে ঐ বাড়ীতে থাকতে হবে। তাঁকে স্থানীয় কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে আমরা সহজেই শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করতে পারলাম। শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী এইভাবে চাকুরী করতে লাগলেন। সেই বাড়ীতে প্রথমে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, জীবন (মাখন) ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত থাকতেন। অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় ধরা দেবার পর লোকনাথ বলও পলাতক অবস্থায় ঐ বাড়ীতে থাকেন।

হঠাৎ ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৩০) রাত্রি প্রায় ২টায় কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের নেতৃত্বে দুই মোটরবাস ভর্তি গোরা সার্জেণ্ট গোন্দল পাড়া গোপন ঘাঁটির গলি দিয়ে ঢুকল। আশে পাশের বাড়ীর লোক কিছু ঘুম থেকে জেগে জানালা খুলে দেখছিল। তাদের উপর হুকুম জারি হল, কেউ জানালা খুললে বা বাড়ীর বাইরে এলে তাদের গুলী করা হবে।

আশ্রয় বাড়ীর দোতলায় একটি ছোট ঘর ছিল। মাখনের উপর সেই সময় পাহারা দেওয়ার ভার ছিল। সব দেখে শুনে আসল ব্যাপার বুঝতে তাঁর দেরী হল না। সে তাড়াতাড়ি গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল আর আনন্দ গুপ্তকে জাগিয়ে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে

এল, তখন টেগার্ট বাহিনী সারা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। তার ভিতর দিয়েও পালাবার উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের ছিল। ঐটি ছিল কলাবাগান এবং তার মধ্যে এক ছোট পুকুর ছিল।

বাগানে বিপ্লবীদের উপস্থিতি অনুমান করে সার্জেণ্টরা খুব জোরালো টর্চ ফেলতে লাগল। তারপর সার্জেণ্টরা চেঁচিয়ে "চ্যালেঞ্জ' (লড়াইতে আহ্বান) জানাল, গুলীর আওয়াজে বিপ্লবীরা তার জবাব দিল। বেশ কতক্ষণ উভয়পক্ষে গুলী বিনিময় হল, মাখনের গায়ে পর পর দুইটি বুলেট এসে বিঁধল, সে তখন পুকুরে জলের মধ্যে ছিল। মাখন ওখানেই চিরবিদায় নিল। গুলী ফুরিয়ে যাবার পর বিপ্লবীরা থেমে গেলে সার্জেণ্টরা এসে তাদের ধরে ফেলতে পারল। রাত ২টা থেকে ভোর ৪-৩০ মিঃ এর মধ্যে এই ঘটনা ঘটে গেল।

ফরাসী আইনে রাত্রে কোন বাড়ী খানাতল্লাসী করার অধিকার ছিল না। তাছাড়া ফরাসী অধিকৃত এলাকায় বৃটিশ পুলিশের পক্ষে একা কোন তল্লাসী বা গ্রেপ্তার করাও আইনত সম্ভব ছিল না।

বৃটিশ সরকারের যদি কারও বিরুদ্ধে বড় অপরাধের জন্যে কোন ব্যবস্থার দরকার হত তা ফরাসী সরকারের অনুমতিক্রমে করতে হত। গ্রেপ্তার বা তল্লাসী ফরাসী পুলিশই করত এবং অপরাধী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিকে বৃটিশ সরকারের হাতে দিত। বৃটিশ আদালতে ধৃত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত না হলে তাকে আবার ফরাসী সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হত--এই ছিল ফরাসী আইন।

কিন্তু এই ব্যাপারে বৃটিশ সরকারী পুলিশ সরাসরি এসে এই বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। ফরাসী পুলিশ আসে পরদিন সকালবেলা। তারা এসে ইতিমধ্যে ধৃত চট্টগ্রাম বিপ্লবী তিনজন এবং শশধর আচার্য সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে চন্দননগর বড় থানায় নিয়ে গেল। একজন বিপ্লবীকে হত্যা করে পুকুরে ফেলে রাখা হয়েছে জানতে পেরে ফরাসী পুলিশ জাল ফেলে পুকুর থেকে মাখনের মৃত দেহ তুলল। সকাল হতেই শহরের ছাত্র, যুবক, জনতা ক্রমে ঐখানে এসে সমবেত হতে লাগল। ফরাসী পুলিশ যখন ডোমকে মাখনের মৃতদেহ বহন করার

জন্য নির্দেশ দিল, তখন যুবকের দল গর্জে উঠল। ফলে ফরাসী পুলিশ ঐ মৃতদেহ হাসপাতালে যুবকদের বহন করতে দিতে বাধ্য হল।

হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ বের করার পর ফরাসী পুলিশ কমিশনার নির্দেশ দিল, কেবলমাত্র শবদেহ বহনকারী ছাড়া কেউ শোক যাত্রায় যেতে পারবে না, পুলিশ পাহারায় মৃতদেহ সৎকার হবে। উপস্থিত ছাত্র যুবকরা জানিয়ে দিল যে, তাদের প্রত্যেককে গুলী করে না হত্যা করা পর্যন্ত শহীদের ঐ পবিত্র দেহ তারা আর কাউকে স্পর্শ করতে দেবে না। পরিস্থিতি চরমে উঠল। ইতিমধ্যে চন্দননগরের তৎকালীন মেয়র চারুচন্দ্র রায়, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে, শ্রীহরিহর শেঠ প্রভৃতি এলেন। মেয়র সব শুনে শহরবাসীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, 'পুলিশ বাহিনীর কোন দরকার নেই, তাদের নিয়ে যাও। শহরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সব দায়িত্ব আমি নিলাম।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মেয়রই ফরাসী আইনে শহরের শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা। মেয়রের ঐ সিদ্ধান্তের পরে পুলিশ বাহিনী যখন বিদায় নিল, তখন কাতারে কাতারে লোক শহীদের মৃতদেহ নিয়ে গঙ্গা নদীর পাড়ে শ্মশানের দিকে চলল। বিপ্লবী-শহীদের সম্মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, 'বে-আইনী হত্যার প্রতিশোধ চাই।' 'চট্টগ্রাম বীর সন্তান জিন্দাবাদ।' 'শহীদ মাখনলাল জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সারা শহরে মিছিল ঘুরল। আবালবৃদ্ধবনিতা, এমন কি সরকারী চাকুরেরা পর্যন্ত ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। শহর প্রদক্ষিণ করার পর মাখনের মৃতদেহ বোড়াই চণ্ডীতলা শ্মশানঘাটে নেওয়া হয়। সেখানে গুলী বিধ্বস্ত মাখনের ফটো তোলা হয়। তার পকেটে দু'টি তাজা কার্টুজ ও দু'খানা দশ টাকার নোট পাওয়া যায়।* সমবেত জনতা পুষ্পবৃষ্টি করে শহীদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। শ্মশানে ঘোষণা হয় যে, রাত্রে মেরী আপিসে (স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি আপিস) এক প্রতিবাদ সভা হবে। সভায় লোকে লোকারণ্য। সভায় একটি প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি কমিটি গঠিত হয়। স্থির হয় চন্দননগরের মেয়র পরদিন ফরাসী ভারতের রাজধানী পণ্ডিচেরী রওনা

* ঐ নোট দু'খানা এখনও চন্দননগর মাখনলাল স্মৃতি কমিটির কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। কার্তুজ ২টি তখন নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

হবেন এবং তিনি ফরাসী ভারতের গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে বৃটিশ পুলিশের বে-আইনী কার্যকলাপ ও নরহত্যার প্রতিবিধান দাবী করবেন। মেয়র চারুচন্দ্র রায় পরদিনই পণ্ডিচেরী যান। প্রায় পনরদিন পর যখন তিনি ফিরে এলেন তখন বোঝা গেল ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। এই বিষয় নিয়ে ফরাসী ভারত সরকার ও ফরাসী উপনিবেশিক মন্ত্রী দপ্তরে বহু স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোন প্রতিবিধান করা গেল না।"

দেশপ্রেমিক চন্দননগরবাসী আজও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের স্মরণ করে। এখন সেই গোন্দলপাড়ার বাড়ীর বাসিন্দারা পরম শ্রদ্ধা নিয়ে যে কোন উৎসুক দেশবাসীকে ঐ ঘরের কোন্ কামরায় বিপ্লবীরা ছিলেন, কেমন করে যুদ্ধ করেছিলেন, কলাবাগানে ঘেরা কোন পুকুরে শহীদ মাখনলালের মৃতদেহ ছিল, দেখিয়ে থাকেন।* উপরোক্ত শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় যখন ১৯৫৩ সালে চন্দননগর "স্বাধীন নগরী"র শাসন সংসদের (কাউন্সিল অব এডমিনিষ্ট্রেশন) সভাপতি ছিলেন, তখন এইসব দেশভক্ত চন্দননগরবাসী বোড়াই চণ্ডীতলা শ্মশানে নদীতীরে শহীদ মাখনলালের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উপর মর্মর-ফলকে তাঁরা লিখেছেন:

'ঘুমন্ত পল্লীর বক্ষে অন্ধকার নীরব নিশীথে
সহসা গরজে বাষ্প ভীমমন্ত্রে অগ্নি নালিকার।
ঘনঘন মার ধ্বনি প্রেতনৃত্যে কৃতান্তের চর—
তপ্ত রক্ত স্রোতে স্নাত শান্ত স্বচ্ছ পুষ্করিণী জল।।
ওরা কারা হানা দিল স্তব্ধরাতে গৃহস্থের ঘরে!
ছদ্মবেশী বীরবপু ঝটপটি জলি রুদ্র তেজে
ঝাঁপ দিল সরোবরে, পিছে ছুটে টেগার্টের দল
ডুবে, ভাসে, রণমত্ত তবু তার অবসন্ন কর।।

* এই গ্রন্থরচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ উদ্দেশ্যে লেখক যখন ১৯৫৭-তে ঐ বাড়ীতে যায়, তখন সেই এলাকার কয়েক শত নরনারী ছাত্র যুবক সেখানে সমবেত হয়ে সেই বিপ্লবী শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। চন্দননগর সংঘর্ষের দিনে যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন, তাঁরা অনেকে সেই কাহিনী বলেন। এক বৃদ্ধা মহিলা সজল নেত্রে যেই ছোট পুকুরটি থেকে শহীদ মাখনের দেহ তোলা হয়, তার সামান্য জল অঞ্জলিভরে নিয়ে লেখকের মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ জানান।

শেষ অগ্নিশিখা বষি নীরবিল অশান্ত নিথর
ওই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর চট্টলার মুক্তিব্রতী প্রাণ
মাখন-জীবনলাল অর্ঘ্য দিল জীবনের দান
২রা সেপ্টেম্বর রাতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে ॥
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের শেষ ভস্মশিখা
চন্দননগর এই মুক্তিতীর্থে নব রক্তটিকা।

(রচনা---প্রবর্তক সংঘের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীঅরুণ কুমার দত্ত) (ফলক প্রতিষ্ঠা--১৯৫৩ ইং)

চন্দননগরে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার, সংঘর্ষ ও শহীদ মাখন ঘোষালের জীবনাবসান, সবই বিপ্লবীদলেরই সেই নেতৃস্থানীয় লোকটির চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

গুলী শেষ হবার পর যখন বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল ধরা পড়লেন তখন তাদের উপর স্বয়ং টেগার্ট সাহেব দৈহিক অত্যাচার করেছিল। মাত্র ১৬ বছরের তরুণ বিপ্লবী আনন্দ গুপ্তও সেই অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। ঐ বাড়ীর ভাড়াটিয়া হিসাবে যাঁদের পরিচয় সেই শ্রীশশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীকেও গ্রেপ্তার করে এই বিপ্লবীদের সঙ্গে আনা হল। তাঁদের উপরও অনেক অত্যাচার চলতে থাকে। তথাকথিত সুসভ্য ইংরেজ কর্মচারী টেগার্ট সুহাসিনী গাঙ্গুলীর গালে এক প্রচণ্ড চড় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রহৃত হতে হতেই গণেশ ঘোষ গর্জে উঠে বলেন, লজ্জা করে না, একজন মহিলার গায়ে হাত দিচ্ছ!

তারপর এই পাঁচজনকে কলিকাতা নেওয়া হয়। এই ঘটনা কলিকাতা ও সারা বাংলায় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। চট্টগ্রামে আত্মগোপনরত নেতা সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা সংবাদপত্রে খবর দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, তাঁদের চট্টগ্রাম আনার অপেক্ষা করছেন। অল্পদিনের মধ্যেই গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তকে চট্টগ্রাম নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আসামী হিসাবে তাদের যোগ করা হল।

ঐ দিনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়রত বিপ্লবী শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী ধরা পড়ার সময় থেকে পুলিশকে নিজেদের ঐ ভাবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কিছুদিন পর পুলিশ ছেড়ে দেয়। তখন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ফরাসী সরকারের বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হিসাবে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের বিরুদ্ধে কলিকাতায় এক মামলা দায়ের করেন। ফরাসী আইন অমান্য করে রাত্রে বাড়ী তল্লাসী ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঐ মামলা দায়ের করা হয়। কিছুদিন মামলা চলার পর লণ্ডন ও প্যারিসের মধ্যে এক সমঝোতার ফলে ফরাসী কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মিথ্যা এক বিবৃতি দেয় যে, বৃটিশ পুলিশ ঐ রাত্রে তল্লাসীর আগে তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিল।

যদিও এই মামলায় এই বিপ্লবী তরুণ-তরুণী পরাজিত হন, তবু সেদিন দেশবাসী হিন্দু বিধবা শ্রীমতী সুহাসিনী গাঙ্গুলীর অপূর্ব আত্ম-ত্যাগে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছিল। কেবল মাত্র চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সযত্নে রক্ষা করার জন্য তিনি আলীপুর কোর্টে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বড় সত্যের জন্য এক বিরাট মিথ্যা পরিচয় স্বীকার করেছিলেন। সেজন্য হিন্দু-বিবাহিতা নারীর মত শাঁখা সিঁদুর দিলেন, নিজের নাম বললেন, 'সুহাসিনী আচার্য'। দেশকে ভালবাসতে গিয়ে, তাকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে গিয়ে পাক-ভারতের নর-নারী বহু আত্মত্যাগ করেছে, কিন্তু এই দেশের সামাজিক সংস্কার ও ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্বন্ধে বাঙ্গালী সমাজে মেয়েদের তখনকার দিনের মানসিকতা বিবেচনা করে তাঁর স্ত্রী হিসাবে প্রকাশ্য আদালতে অভিনয় এক বিরাট আত্মদান সন্দেহ নেই।

চৌদ্দ

চন্দননগরের বিপ্লবীদের চট্টগ্রাম জেলে আনার পর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা জোরে চলতে থাকে। জেলে আলাদা করে রাখা স্বীকারোক্তিকারী রাজসাক্ষী ফকীর সেন (ফতেয়াবাদ) তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। অন্য কয়েকজন তরুণ বিপ্লবীও পুলিশের অত্যাচারে কিছু কিছু বিষয়ে স্বীকারোক্তি করেছিল, তারাও তা প্রত্যাহার করে।

এদিকে পুলিশ পলাতক বিপ্লবীদের বিভিন্ন পরিবারে তল্লাসীর নামে কয়েকদিন পর পরই অত্যাচার, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ ও তাদের পিতামাতা ভাইবোনের ওপর দৈহিক অত্যাচার চালাতে থাকে। বিপ্লবী শহীদ দেবপ্রসাদ ও আনন্দ গুপ্তের পিতা ঁযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শহীদ রজত সেনের পিতা শ্রীরঞ্জন সেন ও বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহের পিতা গোলাপ সিংহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ চট্টগ্রামে বেশ কিছুদিন রেখে পরে ছেড়ে দিয়েছিল। অনন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনন্দলাল সিংহকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম আসামী করা হয়।

তখনকার দিনে অবিভক্ত বাংলার মফস্বল এলাকার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা চট্টগ্রামের "পাঞ্চজন্য" অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রতিদিনের আদালতের বিবরণী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হত। "পাঞ্চজন্যে"র এই ভূমিকা দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবে। এই পত্রিকায় ঐ দেশপ্রেমিকদের বিচারের বিবরণ জানবার জন্য পত্রিকাখানা কিনতে লোকে এত আগ্রহ দেখাত যে, এই পত্রিকার বিক্রয় তখন প্রায় চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

ঐ সময় কলিকাতার তখনকার দিনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শরৎ বোস (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য মাত্র ৩ মাসের জন্য ব্যারিষ্টারী ব্যবসা

ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত এই বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের বাঁচাবার চেষ্টায় এই তিন মাসের মধ্যেই তিনি চট্টগ্রাম আসেন এবং তাঁর জেরা শোনার জন্য প্রতিদিন আদালতের অনুমতি পত্রের জন্য লোক ভিড় করত। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিপ্লবী আসামীদের কোর্টে প্রচুর সশস্ত্র বাহিনী পরিবেষ্টিত অবস্থায় জেল গেট থেকে বর্তমান সিনেমা হল "খুরশীদ মহলের" সামনের রাস্তা দিয়ে কাছারী পাহাড়ে আনা হত। এই সময় রাস্তার এই দুই ধারে রোজ শত শত দেশবাসী তাদের এই দেশপ্রেমিক বিপ্লবী যোদ্ধাদের একটুখানি দেখবার জন্য সারিবদ্ধ অবস্থায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকত। বিচারকক্ষে বিপ্লবী অভিযুক্তদের জন্য একটি বড় লোহার খাঁচা তৈরী করা হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় বাঘ, সিংহ ইত্যাদিকে যেমন ভয়ে খাঁচায় রাখা হয়, বৃটিশ পুলিশ যথেষ্ট অস্ত্রসজ্জিত পাহারাদার বসিয়েও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে, বিপ্লবীদের ঐ লোহার খাঁচায় রেখে, বাইরে রাইফেল দিয়ে পাহারা দিত। এই মামলার দৈনিক বিবরণী কলিকাতার পত্রিকাগুলিতেও নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং লোক অধীর আগ্রহে ঐ সংবাদের জন্য অপেক্ষা করত, তখন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা মাত্র ৩ মাসের জন্য তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের জন্য ব্যারিষ্টারী ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। অথচ চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে বলে বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট নেতারা তাঁকে ধরে পড়লেন। ৩ মাস আইন ব্যবসা করবেন না বলে, ঘোষণা করলেও এই দেশপ্রেমিক ব্যারিষ্টার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনা করার জন্য যখন চট্টগ্রাম আসেন, তখন বৃটিশ সরকার বিশেষ ট্রাইবু-ন্যালের ইংরেজ প্রধান ও তার অন্য সদস্যরা সকলেই বিচলিত হন এবং বিচারাধীন বিপ্লবীরা তাঁকে উল্লাসধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করে।

ব্যারিষ্টার শরৎ বোস এই মামলা পরিচালনা করতে আসায় ভারতে বৃটিশ মূলধনের স্বার্থরক্ষার মুখপত্র দৈনিক "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে লেখে যে, শরৎবাবু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩ মাসের জন্য পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে ব্যারিষ্টারী ছেড়ে আবার চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের মামলায় গেছেন—এ থেকে তিনি যে ঐ বিপ্লবী নীতির প্রতি অনুরক্ত তা সহজেই বোঝা যায়।

শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টে "ষ্টেট স্‌ম্যান" পত্রিকার বিরুদ্ধে ঐ মন্তব্য নিয়ে এক লক্ষ টাকার মানহানির মোকদ্দমা করেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তখনকার দিনের ইংরেজ বিচারপতিরা যে বিচার করেন তাতে শরৎবাবু মামলাতে জয়লাভ করতে পারেন না। ইংরেজ স্বার্থরক্ষকদের ষড়যন্ত্র সফল হয়। শরৎবাবু তখন আর নিজে না এসে অন্য এক বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার শ্রীশ বসুকে এই মামলা পরিচালনার জন্য পাঠান।

কোর্টে যখন মামলা চলছে, তখন চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবীরা নতুন নতুন কাজের আয়োজন করছেন। কঠোর পুলিশ আর মিলিটারী পাহারা, দীর্ঘ সান্ধ্য আইন, পরিচয়পত্র বহন, সন্দেহভাজন ছাত্র-যুবক ও কিশোরদের যখন তখন গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ও মিলিটারী ক্যাম্পে নেওয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করা, ভয় দেখানো ও অকথ্য নির্যাতন করা—এই অবস্থা তখন চট্টগ্রামে চলছে। সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবী-দলের প্রধান ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রাম শহর, পটিয়া থানা, বোয়ালখালী থানা, রাউজান থানার বেশীর ভাগ অংশ, ডবলমুরিং থানার কাট্টলী ও নিকটবর্তী গ্রাম, সাতকানিয়া ও আনোয়ারা থানার কিছু অংশ। এক কথায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত অঞ্চলগুলিই ছিল বিপ্লবীদের সদস্য সংগ্রহ ও গোপন পলাতক জীবন-যাপনের ক্ষেত্র। এইসব এলাকায় যে সব সচ্চরিত্র, সাহসী ও স্বাস্থ্যবান হিন্দু ছাত্র ও যুবক তখন ছিল, তাদের মধ্যে কিছু ভীতু ও সরকারী কর্মচারী পরিবারের ছেলে ছাড়া অন্যান্যরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তখন বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব সদস্যদের সহপাঠি বা স্বগ্রামবাসী অনেক মুসলিম ছাত্রও এই সময় বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পলাতক নেতা সূর্য সেন, নির্মল সেন ইত্যাদি এই সব মুসলিম তরুণ বিপ্লবীদের সাহায্যে অনেক মুসলিম পরিবারে আশ্রয়স্থল যোগাড় করেছেন। মুসলিম সাম্পানের মাঝি এই মুসলিম বিপ্লবীদের উদ্যোগে গভীর অন্ধকার রাত্রে কর্ণফুলী হালদা দিয়ে বহু বিপদ ঘাড়ে নিয়ে পলাতক বিপ্লবীদের পার করে দিয়েছেন। কোন মাঝি জানেন যে পলাতক বিপ্লবীদের রক্ষা করার জন্য নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাচ্ছেন--সূর্য সেনের নাম শুনেছেন, তাঁকে একটুখানি চোখে দেখার খুব ইচ্ছা। কোনদিন দেখেন নি তাই পলাতক আরোহী সূর্য সেনকেই হয়ত জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁকে একবার দেখাতে পার না, শুনেছি বড় ভারী পাহলোয়ান লোক, লম্বা চওড়া—কেমন জব্দ করে দিয়েছে সাহেবদের।

এই সময় বিপ্লবী দলে যে সব মুসলিম তরুণ ও ছাত্র যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--আবদুস সত্তার (রাউজান), মীর আহমদ (বোয়ালখালী), দলিলুর রহমান (চট্টগ্রাম শহর) ।

এঁদের মধ্যে আবদুস সত্তার বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বৃটিশ শাসনকালে কয়েকবছর বিনাবিচারে আটক ও অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩৮শে মুক্তিলাভের পরই তিনি সন্ত্রাসবাদে তাঁর অবিশ্বাস ঘোষণা করে জিলায় কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। জিলা কৃষক সমিতি গঠনের পরে তিনি তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি জেলার কৃষকদের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ও সুবক্তা হিসাবে (বিশেষতঃ চট্টগ্রামী কথ্য ভাষায়) খ্যাতিলাভ করেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বেও অবশ্য বিপ্লবের নানা আয়োজনে মুসলিম দেশবাসীরা অর্থ, জিনিসপত্র ও অন্যান্য বিষয়ে পরোক্ষভাবে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন পূর্ণ দেশপ্রেমিক আবেদনে সাড়া দিয়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার তখনও না গড়ে ওঠায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু তরুণ ও ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ঐ গোপন বিপ্লবী সংগঠনে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্যন্ত সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজে মুসলিম তরুণরা ছিল না। কিন্তু ১৮ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল বিপ্লবী অভ্যুত্থানের স্মরণীয় যেই ৫টি দিনে সারা চট্টগ্রাম কেঁপে উঠেছিল, তাতে এই জেলার হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ অধিবাসীর মনেই লাগে দেশপ্রেমের দোলা। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে তখন এগিয়ে আসতে থাকে আরও অনেক তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রী। তার মধ্যে ছিল ঘরের পর্দানশীন কুলবধূ, ছিল বাগ্‌দত্তা যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মা ঠাকুরমা। দেশপ্রেমিক এই পলাতক বিপ্লবীদের চোখের মণির মত বাঁচাতে হবে। মা বোনের স্নেহের আঁচল দিয়ে অত্যাচারী বিদেশী সরকারের নিয়োজিত সারমেয়দের হিংস্র আক্রমণ থেকে এদের রক্ষা করতে হবে। হিন্দু মুসলিম মা বোন ভাইয়েরা এই পণ নিয়ে, ভয় আর অত্যাচারকে তুচ্ছ করে চট্টগ্রামের দেশভক্ত বিপ্লবীদের এই জেলার গ্রামে গ্রামে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নামহীন, অজানা এসব দেশভক্তদের অমূল্য এই দানের কথা, গোপন আত্মদানের কাহিনী আজাদীর পরে আমরা কেই বা স্মরণ রেখেছি?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করার কাজে সামনে বুক পেতে যারা লাঠি, গুলী, বেয়নেট, কারাগার, ফাঁসীর দড়ি বরণ করে নিয়েছেন তাদের মতই দেশবাসীদের এই আত্মদান। আমরা তাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

পলাতক জীবন শুরু হবার পর কালারপোল সংঘর্ষ ছাড়া আর কোন নতুন বৈপ্লবিক কাজ (সংঘর্ষ বা আক্রমণ) হয় নি। বিপ্লবীরা গোপনসূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারেন যে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য ডি-আই-জি ক্রেগ সাহেব চট্টগ্রাম আসবে এবং ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০ ইং তারিখে চাঁদপুর হয়ে সে কলিকাতা ফিরে যাবে।

বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত হয় যে, রেলগাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেগকে খতম করা হবে।

পূর্বে বোমা তৈরী করার সময় যে ভীষণ বিস্ফোরণ হয় তাতে বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়ে সে ভয়ানক আহত হয়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন তাই অভ্যুত্থানে যোগদানকারীদের মধ্যে সে থাকতে পারেনি। ক্রেগকে শেষ করার কাজে যাবার জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে নির্বাচিত করা হয়। এর মধ্যে কালীপদ চক্রবর্তী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রাত্রি থেকে জালালাবাদ যুদ্ধের দিন পর্যন্ত সব কাজে যুক্ত ছিল। তারপর থেকে তার পলাতক জীবন চলছিল।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০ ইং তারিখ ভোরে এই দুই তরুণ বিপ্লবী চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী থেকে নামে। ভোরের কুয়াশায় তখন চারিদিক ধোঁয়াটে। দুইটি সবুজ রং-এর খদ্দরের চাদর দিয়ে সারা গা মুড়ে বিপ্লবী দুইজন ভিতরে গুলীভরা, অস্ত্রাগার থেকে লুট করে আনা ভাল রিভলভার লুক্কায়িত অবস্থায় প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো গাড়ীতে ক্রেগ-কে খোঁজ করতে থাকে। কলিকাতা ডালহৌসী বোমার মামলায় বিপ্লবী অনুজা সেন যেই বোমা দিয়ে পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিল, সেই একই বোমা কিছু চট্টগ্রামের

বিপ্লবীরাও সংগ্রহ করেছিল। তার দুইটি বোমাও এই দুই তরুণ বিপ্লবীকে দেওয়া হয়েছিল এই কাজের জন্য।

চাঁদপুরে গাড়ী থামার পর বিপ্লবীরা ভোর সাড়ে চারটায় নিজেদের ৩য় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নেমে প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগিয়ে যায়। তখন বেশ লম্বা চওড়া বড় ওভারকোর্ট গায়ে একজন অফিসার একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে দরজা খুলে নামবার উপক্রম করতেই বিপ্লবীদের গুলী তাকে ধরাশায়ী করে। তার মুখ ভোরের কুয়াশার জন্য বিপ্লবীরা ভাল করে দেখতে পায় নি, তাদের খবর ছিল, ঐ প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ক্রেগ যাচ্ছে। যখন বেশ লম্বা চওড়া, কিছু ফর্সা একটি লোক ঐ ভাবে সামরিক বা পুলিশ ওভারকোর্ট গায়ে তারা দেখল, তখন সে যে ক্রেগ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে তা তারা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু গুলী খেয়ে পড়ে যাবার সময় সে যখন 'বাবাগো গেলুম' বলে আর্তনাদ করে উঠল, তা শুনে বিপ্লবীরা বুঝতে পারল যে, যাকে ওরা হত্যা করেছে সে বাঙালী কোন অফিসার। আসলে ক্রেগ তখন অক্ষতই রয়ে গেছে। ক্রেগ ভয় পেয়ে তখন তার রিভলভার থেকে গুলী ছুঁড়তে থাকে। বিপ্লবীরা কোন ভুল হয়েছে বলে স্বাভাবিকভাবেই মনে করে, তাই তারা গুলী চলার ফলে শূন্য চাঁদপুর ষ্টেশন থেকে বাইরে চলে যায়।

পরে জানা যায় যে, ক্রেগই তার নিজের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জীকে ঐ প্রথম শ্রেণীর কামরায় সঙ্গে নিয়েছিল। কালীপদ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের গায়ে যে দু'খানা সবুজ খদ্দরের চাদর ছিল, তা ঐ ঘটনার পরও তাদের গায়ে ছিল। ঐ দু'খানা চাদর গায়ে দিয়ে তারা চাঁদপুর ষ্টেশন থেকে রেল লাইন ধরে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত হেঁটে এসে হাজীগঞ্জ রেল ষ্টেশনে চা খাওয়ার পর রেলে উঠে চট্টগ্রামের দিকে ফিরবার সিদ্ধান্ত করে। ঐস্থান থেকে সামান্য কিছু দূরে ঐ সবুজ চাদরের চিহ্ন দেখেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। ধরা পড়ার সময় তাদের সঙ্গে দু'টি রিভলভার ও নতুন ধরনের দু'টি বোমা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত অতর্কিতে গ্রেপ্তার হওয়ায় তারা ঐগুলি ব্যবহার করতে পারেনি। গ্রেপ্তারের পর চট্টগ্রামে বিশেষ আদালতের বিচারে এই বিপ্লবীদের ফাঁসীর হুকুম হয়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হয়। যদিও এই দুই বিপ্লবী প্রায় একই বয়সের ছিল, তবু রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান ও একটু লম্বা। বয়সে তার চেয়ে সামান্য বড় হলেও বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী একটু খাটো, পাতলা আর রামকৃষ্ণের মত গোঁফদাড়ি তার নেই। হাইকোর্টের মামলায় বিপ্লবীদের পক্ষের উকিল এই অবস্থার সুযোগ নেন। বিচারপতিরা যখন নিম্ন আদালতের ফাঁসীর হুকুম দুই জনের উপরই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত করেন, তখন ঐ বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তীর বয়স মাত্র ষোল বৎসর এবং এই তরুণের বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁর ফাঁসীর দণ্ড মওকুব করার জন্য আবেদন করেন। বিচারপতিরা তখন বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তীর দণ্ডাদেশ ফাঁসী থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করেন।

ফাঁসীর দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে কলিকাতার আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। তাকে ফাঁসী থেকে রক্ষা করার জন্য তার আত্মীয় স্বজনের সব আবেদন ব্যর্থ হয়।

সেই জেলে ঢাকার বিপ্লবীদলের দীনেশ গুপ্তকে তখন ফাঁসীর আসামীর নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছিল। এক আত্মীয়া নিয়মিত দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে জেলে দেখা করতে যেতেন, আবার এই দেশভক্ত বিধবা অনেক পলাতক বিপ্লবীকে তাঁর স্নেহের আশ্রয়ে গোপনে রেখেছেন, বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের এক পলাতক বিপ্লবী আত্মীয় যখন ঐ বিধবা ভদ্রমহিলার গোপন আশ্রয়স্থলে ছিল, তখন অন্য সব বিপ্লবীদের মত প্রীতিলতাও তাঁকে পিসীমা ডাকত, এই পিসীমা একদিন বলেন যে দীনেশের পরের 'সেলে' চট্টগ্রাম বিপ্লবী ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আছে। তার বোন হিসাবে প্রীতিকে দেখা করার পরামর্শ এই পিসীমা দেওয়ার পর, প্রীতি সাহস করে তার নাম বদল করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহ করে। তখন প্রীতিলতা কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষার জন্য তৈয়ার হচ্ছে। প্রীতিলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণের এই আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রথম দেখা হলেও, এই দুটি বিপ্লবী একে অপরকে আদর্শের মধ্য দিয়ে বহুকাল ধরে জানে। তাই মৃত্যুপথযাত্রী এই বিপ্লবী ফাঁসীর পূর্বে বেশ কিছুদিন দরদী ও বুদ্ধিমতী এই নারী বিপ্লবীর কাছ থেকে বোনের

আদর, সহযাত্রীর অভিনন্দন আর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে যে গভীর প্রীতি ও দরদভরা সাহায্য পেয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। প্রীতিলতার ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলীপুর জেলে সাক্ষাতের ব্যাপার প্রীতির ডায়েরীর পাতা থেকে সামান্য উদ্ধৃত করছি :

"বিপ্লবীদের জনৈক সহযাত্রী এক সহানুভূতিশীলা আত্মীয়া যখন আমাকে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার অপরাধে বৃটিশ আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তখন আমি এক নতুন প্রেরণার শিহরণ বোধ করলাম। আমি তার এক সম্পর্কিত বোন হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে কোনমতে এই হাস্যময় তরুণ বীরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি যোগাড় করি। তার ফাঁসীর আগে তার সঙ্গে আমার প্রায় ৪০ বার দেখা হয়েছে। তার সুসংযত দৃষ্টি, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, শিশুসুলভ সারল্য, আবেগপূর্ণ অন্তর, গভীর জ্ঞান ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আমি আগের চেয়ে আরও দশগুণ বেশী শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা তার কাছ থেকে পাই। আমার জীবনাদর্শকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ দেশপ্রেমিকের সাহচর্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। রামকৃষ্ণের ফাঁসীর পরই কোন বাস্তব বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ জাগে। কিন্তু বি-এ পাশ করার জন্য আরও ৯ মাস আমাকে কলিকাতায় অপেক্ষা করতে হবে। টেষ্ট পরীক্ষার পর আমি বিপ্লবী কাজে যোগদান সম্পর্কে আলাপের জন্য চট্টগ্রামে একবার আসি।"

বিপ্লবী রামকৃষ্ণ যখন জ্বরে শয্যাগত, তা সত্ত্বেও রাত প্রায় দু'টার সময় বৃটিশ সরকার আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাকে ফাঁসী দেয়। বিপ্লবীরা সেই রাত্রে আলীপুর জেলে হামলা করতে পারে, এই আশংকায় সরকার আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের দু'পাশে বড় রাস্তার উপর রাত্রে মেশিনগান ও রাইফেল নিয়ে পাহারা দিয়েছিল। ১৮ই এপ্রিলের অভ্যুত্থানের পর থেকে ঐ সময় পর্যন্ত ফাঁসীতে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আত্মোৎসর্গ করেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা চলাকালে পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামের হরিশ হোরের বাড়ীতে যখন অন্যতম প্রধান বিপ্লবী নেতা অম্বিকা

চক্রবর্তী আত্মগোপন করেছিলেন, তখন ঐ গ্রামেরই এক দেশবিদ্রোহীর কাছ থেকে খবর পেয়ে বিরাট পুলিশবাহিনী গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অম্বিকা চক্রবর্তী তাঁর পূর্ববর্তী কারাজীবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে কলিকাতায় তিনি যখন এই রোগে শয্যাগত ছিলেন তখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে চিকিৎসা করেন। এই আত্মগোপন কালে আবার তাঁর সেই রোগের আক্রমণ হয় এবং গ্রেপ্তারের সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। গ্রেপ্তার করে তাঁকে পটিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তখনকার দিনের দারুণ অত্যাচারী গোয়েন্দা বিভাগীয় ইনস্পেক্টার আসানুল্লা থানার সামনে সমবেত উৎসুক জনতার সমক্ষে তাঁকে নাকে মুখে ঘুসি মারে ও বুকে লাথি মারে। তাঁর নাক মুখ দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যায়। দেশহিতব্রতী এই বিপ্লবী নেতার উপর ঐ দৈহিক অত্যাচারে উপস্থিত হিন্দু মুসলিম জনসাধারণ সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু বিদেশী সরকারের বর্বর জুলুমের ভয়ে নীরবে সকলে বাধ্য হয়ে তা সহ্য করে। তার মধ্যে পনর বছরের বিপ্লবী ছাত্র হরিপদ ভট্টাচার্যও ছিল। সে তার পরম শ্রদ্ধেয় নেতার উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে সবার অলক্ষ্যে পটিয়া ত্যাগ করে।

অম্বিকা চক্রবর্তীকে ধরার পর, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার পলাতক বিপ্লবী সরোজ গুহ চট্টগ্রামে এবং পলাতক বিপ্লবী তরুণ ১৬ বৎসরের বিপ্লবী হেমেন্দু দস্তিদার কলিকাতায় ধৃত হয়। এই তিনজনকে নিয়ে দ্বিতীয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা শুরু হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রথম মামলায় কলিকাতা থেকে ব্যারিষ্টার শরৎ বসু ছাড়া আরও কয়েকজন আইনজীবি ও এসেছিলেন, তখনকার দিনে বিখ্যাত আইনজীবী সন্তোষ কুমার বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীশ বসু, কুমিল্লার বিখ্যাত উকিল অখিল দত্ত ও কামিনী দত্ত আর চট্টগ্রাম কোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার যামিনী কুমার ঘোষাল, উকিল বিনোদ সেনগুপ্ত এম, এ, বি-এল ও পুলিন দত্ত, বি, এল (কিছু দিনের জন্য) প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন। ইংরেজ জেলা জর্জ মিঃ ইউনিকে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের সভাপতি করা হয়েছিল। ট্রাইবুন্যালের সদস্য অন্য যে দুইজন জর্জ শেষ পর্যন্ত এই মামলায় রায় দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম হল জনাব আবদুল হাই ও শ্রীনরেন লাহিড়ী।

বিচারকালীন দুই একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ১৯৩১শে তাঁর মৃত্যুর খবর যেদিন সারা দেশের বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ঘোষিত হয়েছে, সেদিন সশস্ত্র পুলিশ পরিবৃত অবস্থায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিপ্লবীরা কোর্টে প্রবেশ করার পরই, "পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকী জয়"—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে থাকেন।

বিচারকদের চোখে বিরক্তি, মুখে গাম্ভীর্য। পুলিশ সার্জেণ্ট ও সরকারী উকিলরা বেশ বিব্রত ও চঞ্চল। ধ্বনি থামার পর বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ দাঁড়িয়ে বিচারকদের বললেন "ভারতের অন্যতম প্রধান জননেতার মৃত্যু সংবাদ জেনে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। সারা দেশের মানুষ এই প্রসিদ্ধ নেতার মহাপ্রয়াণে শোকাভিভূত—তাদের সঙ্গে আমরাও আমাদের শোক প্রকাশ করব। তাই আমার প্রস্তাব, এই উপলক্ষে কোর্টের কাজ আজ বন্ধ থাকুক।"

ইংরেজ শাসনকালীন রাজভক্ত সরকারী উকিল তীব্র ভাষায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন, বিচারকমণ্ডলীও সেটা গ্রহণ-যোগ্য নয় বলে জানিয়ে দেন। তখন লোহার জালের* ভিতরে নিরস্ত্র বিপ্লবীরা বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ আর লোকনাথ বলও ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য জোর দাবী করেন। যখন বিচারকরা কোন মতে রাজী হলেন না তখন বিপ্লবীরা পূর্ব পরিকল্পনামত হট্টগোল, গান ও বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে কোর্টের কাজ অসম্ভব করে তোলেন। অবশেষে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি মিঃ ইউনি পণ্ডিত মতিলালের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দুই ঘণ্টাকাল কোর্টের কাজ বন্ধ রাখার প্রস্তাব করেন এবং বিপ্লবীরা "বন্দেমাতরম" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।

আর একদিন সরকারী উকিল বিপ্লবীদের সম্পর্কে এক অত্যন্ত অশোভন ও অমর্যাদাজনক মন্তব্য করেন। তখনও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

---

* উল্লেখযোগ্য সেই লোহার জালে ঘেরা কাঠগড়া এখনও চট্টগ্রাম জেলা ও সেসন জজের কোর্টের ভিতর আছে।

মামলার সব বিচারাধীন আসামীরা এমন ভয়ানক প্রতিবাদ জানান যে, শেষ পর্যন্ত ঐ ইংরেজভক্ত উকিলকে সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সময় চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে বসে বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলকে অন্যান্য বিচারাধীন বিপ্লবীদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। জেলের ভিতরে বসেও এই বন্দী বিপ্লবীরা বাইরে পলাতক নেতা সূর্য সেনের সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকমত রক্ষা করতেন। বিশেষতঃ পুলিশ অল্প বয়সের ও তাদের চোখে কম দায়িত্বশীল কয়েকজন বিপ্লবী তরুণকে জামিনে থাকার সম্মতি দিয়েছিল। তাদের মারফত জেলের ভিতরে বসে বন্দী নেতারা এক বিস্ময়কর বৈপ্লবিক কাজের আয়োজন করেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ জালালাবাদ সংগ্রামে যোগ দিতে পারেন নি তাঁরাও এভাবে জেলে আটক থেকে, শেষ পর্যন্ত হয়ত ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিতে রাজী ছিলেন না। প্রায় ত্রিশ জনের মত বিচারাধীন বিপ্লবী বন্দীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে স্থির হল, জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে। বাইরে মাষ্টারদার সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার এক বড় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বন্দীদের এবং বাইরের জনসাধারণের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, বিশেষ আদালতের বিচারে অন্য বন্দীদের বেশী সাজা, দীপান্তর ইত্যাদি হলেও নেতা তিনজনের নিশ্চয়ই ফাঁসী হবে।

বন্দীরা নিজেদের মুক্ত করার জন্য দুইটি উপায়ের কথা বিবেচনা করে। রোজ বিচারের জন্য এদের জেল থেকে কোর্টে নেওয়া হয়, সেই সময় বাইরের বিপ্লবীরা এসে এদের ছিনিয়ে নেবে অথবা জেলের ভিতর থেকে জেলের দেওয়াল উড়িয়ে দিয়ে, জেলের ওয়ার্ডারদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে বেরিয়ে আসা, এই প্রস্তাব গোপনে মাষ্টারদার কাছে পাঠানো হয়। তিনি তখন পলাতক অন্যতম নেতা নির্মল সেন ও তরুণ বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে আলোচনা করে ঐ বিপ্লবী ষড়যন্ত্র সমর্থন করেন। দ্বিতীয় উপায় হল—

কোর্টে উঠবার রাস্তার দু'পাশে ডিনামাইট বসানো হবে। তাদের একটি বাদ দিয়ে অন্যটিকে একের পর এক বৈদ্যুতিক তার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। এক গোপন যায়গা থেকে সুইচ টিপতে হবে। ট্রাইবুন্যালের সদস্যদের গাড়ী রোজ এসে যেখানে থামে, তার তলায় যে ডিনামাইট পাতা হবে প্রথমে সুইচ টিপে তাতে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে এবং ফলে বিচারকদের নিয়ে গাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘটনার তদন্তে আসবে পুলিশ আর মিলিটারীর গাড়ী। দ্বিতীয়বার সুইচ টিপে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে বন্দীদের জন্য নিযুক্ত রক্ষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে গোপনে প্রতীক্ষা-রত বাইরের পলাতক বিপ্লবীরা এবং তাদের সহযাত্রীদের তারা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ইংরেজের বন্দীদশা থেকে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ বেশ ভালভাবে এগিয়ে যায়। ডবলমুরিং-এ এক তরুণ বিপ্লবীর বাড়ীতে আর বক্সীর হাটে এক দোকানের পিছনের ঘরে গুপ্ত ঘাঁটি থেকে ডিনামাইট সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য আয়োজন চলতে থাকে।

জেলের ভিতরে বিপ্লবী বন্দীরা বাইরের সাথীদের সাহায্যে অনেক মালমশলা খুব সফলভাবে নিয়েছেন। সেখানে জেলের বড় জমাদার, ছোট জমাদার, ডাক্তার আর কিছু চালাক সাধারণ কয়েদীকে বিপ্লবী বন্দীরা নিজেদের গোপন সহায়ক হিসাবে পেয়েছেন। মনে মনে দেশীয় অনেক সরকারী কর্মচারীও তখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ, দেশের মুক্তি কামনা তাদের মনকেও বিচলিত করত। তাই তাদের দেশপ্রেমকে এই কাজে বিপ্লবীরা যতটা পারেন উজ্জীবিত করেন, যেখানে তা সম্ভব হয় না, সেখানে গোপনে কিছু অর্থও দেওয়া হয়। সেই সময় প্রাদেশিক গোয়েন্দা সদর দফতর থেকে ঝানু গোয়েন্দা অফিসাররা মিলিটারী আর পুলিশের সাহায্যে সারা শহর ও জেলায় গোপন ও প্রকাশ্য বহুবিধ পাহারার ও তল্লাসীর আয়োজন করেছিল। বিপ্লবীরা তাকে ব্যর্থ করে জেলের মধ্যে নিয়েছিল কয়েকটি পিস্তল ইলেক্‌ট্রিক তার ও বাল্‌ব আর প্রচুর বিস্ফোরক।

১৯৩১-এর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে বাইরের রাজমিস্ত্রীরা কাজ করছিল। তাদের সঙ্গে জেলের "রাজ-দফা-র" অর্থাৎ যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সে সব কয়েদীরাও আছে।

জেলের কিছুটা অংশে পাকা গাঁথুনি করা হবে। সেজন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ একটি নতুন ইলেকট্রিক বালব্‌ ও তার সঙ্গে যুক্ত কিছু কাল সরু ইলেক্‌ট্রিক তার পাওয়া গেল। জেল কর্তৃপক্ষ এই নূতন, বালব্‌ আর তার পেয়ে বাইরে পুলিশকে খবর দেয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার ইত্যাদি সদলবলে এসে জেলের ঐ অংশ গোটা খুঁড়ে ফেলার ব্যবস্থা করে। মাটির তলায় ইলেক্‌ ট্রিক তার, বালব্‌, ছোরা ইত্যাদি পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বন্দীদের উপর কড়া পাহারা বসল।

বিপ্লবীরা কর্তৃপক্ষের সকল সতর্কতাকে বিফল করে দিয়ে কি কি যোগাড় করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনন্ত সিংহ তাঁর 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে' লিখেছেন:

"দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীরের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কয়েক মাসের চেষ্টায় আমরা জেলের মধ্যে নিয়ে এলাম অনেক কিছু—রিভলভার, কার্তুজ, বড় বড় ড্যাগার, আধমণ বারুদ, ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য অনেক রকম যন্ত্রপাতি—যেমন বিভিন্ন ধরনের ফাইল, কাটিং প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, লোহা কাটার করাত ইত্যাদি। জেলের মধ্যে সেই সমস্ত জিনিস গোপনে রাখার ব্যবস্থা হল এবং গাঁজাখুরি গল্পের মত শোনালেও এইটি নির্ভেজাল সত্য যে, জেলের মধ্যে আমরা ছোটখাট এক Mobile (গতিশীল) ও invisible (অদৃশ্য) কারখানা স্থাপন করলাম।"

বাইরে বসে যেসব বিপ্লবী ডিনামাইট বসাবার ষড়যন্ত্র করছিল, তাদের একজন ভোর রাত্রে কুলী সেজে মাথার উপর ডিনামাইট-এর টিন একটি নিয়ে যাবার সময় ধরা পড়ে যায়। তখন সান্ধ্য আইন চালু ছিল। ভোরে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ঘড়ি ভুল দেখে বিপ্লবী তরুণটি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আর টহলদার মিলিটারীর হাতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাড়ী খানাতল্লাসী করা হল, অনেক সন্দেহভাজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হল। এই সব ধৃত বিপ্লবীদের নিয়ে কিছুদিন পরই "চট্টগ্রাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা" শুরু হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিল:

অর্ধেন্দু গুহ
অনিল রক্ষিত
রবি সেন
নিবারণ ঘোষ
সুশীল সেন
প্রফুল্ল মল্লিক
হৃদয় দাস
প্রভাত দত্ত

বিচারে সকলেরই সাজা হয়। এই সময় ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশের কাছে উদঘাটিত হয়নি এমন একটি ব্যবস্থাও বিপ্লবীরা করেছিল। আসকার খাঁর দিঘীর পাড়ের পশ্চিম কোণায় ছিল বীরকন্যা প্রীতিলতার পিতা শ্রীজগদ্বন্ধু ওয়াদ্দারের বাসা। তিনি তাঁর বাসার একখানিতে সপরিবারে থাকতেন। অন্যখানি ভাড়া দিতেন। বিপ্লবীরা তাদের নতুন পরিকল্পনার জন্য ঐ বাসাটি বড় রাস্তা থেকে অনেক দূরে নির্জন যায়গায় অবস্থিত বলে ভাড়া করার চেষ্টা করে।

তাদের পরিকল্পনা ছিল, ঐ বাসার দুইটি ঘরের একটিতে ডিনামাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক রাখা হবে। তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার যুক্ত করা হবে। যদি কোর্টে বা জেলে যে ডিনামাইট বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা কোন কারণে ব্যর্থ হয়, তাহলে এখানকার ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে।

এখানে ঘরের বাইরে ছোট একটি বোমা বিস্ফোরণ করা হবে এবং কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করতে হবে। ঐ ব্যাপারে জানাজানি হলে তখনই আসবে পুলিশ। বিস্ফোরক ও ডিনামাইট ভর্তি ঘরখানায় থাকবে তালা। বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, এই ঘটনা দেখবার জন্য অবশ্যই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য বড় বড় কর্মচারীরা সেখানে উপস্থিত হবে। তখন ঐ বাড়ী থেকে দূরে গোপন জায়গা থেকে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঐ বন্ধঘরে বিস্ফোরণ করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সব পুলিশ ও বড় বড় ইংরেজ শাসকদের নিয়ে সমস্ত ঘরশুদ্ধ বিস্ফোরণে উড়ে যাবে।

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় বিভিন্ন বিপ্লবী ধরা পড়ে যাওয়ায় এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়নি।

এই বাড়ী ভাড়া করার সময় একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। কোন ভাড়াটিয়ার সংগে পরিবার যদি না থাকে বাড়ীর মালিক ভাড়া কোনমতেই দেবেন না। তখন বিপ্লবীরা প্রীতিলতার পিতাকে এক বড় ধোকা দেয়। দেওয়ানজী পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় বিপ্লবী ছাত্র সুশীল সেন থাকত। একজন বিপ্লবী ভাড়াটিয়া সেজে সুশ্রী ছাত্র সুশীল সেনকে মেয়েদের পোশাকে সজ্জিত করে ভাড়াটিয়ার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে এক সন্ধ্যাবেলা তরুণ বিপ্লবী অনিল রক্ষিত মোটর চালিয়ে নিয়ে প্রীতিলতার পিতার কাছে হাজির হল, তিনি তখন ঐ ঘর ভাড়া দিতে রাজী হয়েছিলেন। ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত আগের পরিকল্পনা মত ঐ বাড়ীতে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু তা কাজে পরিণত করার সুযোগ বিপ্লবীদের হয়নি।

দ্বিতীয় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ও বিপ্লবী তরুণ সরোজ গুহের দ্বীপান্তর হয়। এই মামলার অন্যতম আসামী পলাতক অবস্থায় কলিকাতা থেকে ধৃত বিপ্লবী ছাত্র হেমেন্দু দস্তিদারকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু মুক্ত হবার আগেই, তাকে বিনা বিচারে আটক করে রাজপুতনার আজমীর মারওয়ারের দেউলী আটক-খানায় পাঠানো হয়। ১৯৩৮শে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

এদিকে প্রধান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন তাঁর কিছু বিশ্বস্ত সহকর্মী নিয়ে চট্টগ্রামেই আত্মগোপন করে আছেন। এইসব পলাতক বিপ্লবীদের ধরবার জন্য তখন পুলিশ যে অকথ্য বর্বর অত্যাচার করেছিল, তার সবটা আলোচনা করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা ঠিক হবেনা, তবু তার কিছু উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে বিপ্লবীরা যে গ্রামেই আত্মগোপন করে থাকত তা নানা সূত্রে পুলিশ জানতে পারত। তার জন্য গ্রামে গোয়েন্দা পুলিশ ও মিলিটারীর ঘাঁটি বসে যায়। বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী, শ্রীপুর, খরন্দ্বীপ, কধুরখীল গ্রাম, পটিয়া থানার ধলঘাট,

গৈরলা, চক্রশালা, বরমা, গুয়াতলী গ্রাম, রাউজান থানার নয়াপাড়া, কোয়েপাড়া, দেওয়ানপুর, পাঁচখাইন ইত্যাদি গ্রামের উপরই পুলিশের নজর খুব বেশী পড়ে এবং এই তিন থানাতেই পুলিশ ক্যাম্প বসে। তার মধ্যে ধলঘাট ক্যাম্পের অত্যাচার ও বর্বরতা সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। এই ক্যাম্পে পটিয়া ও বোয়ালখালী থানা থেকে ধৃত স্কুলের বার তের বছরের ছাত্রদের নিয়ে এসে বদ্ধ কুঠরীতে রেখে দেওয়া হত। তারপর লাঠি ও ঘুসি, সবুট পদাঘাত ঐ সব কোমল কিশোরদের নাকে মুখে বুকে পিঠে গিয়ে পড়ত। যন্ত্রণায় ঐসব নিরপরাধ ছাত্র ও কিশোরদের চোখ দিয়ে জল পড়ত। কিন্তু একটি গোপন সংবাদও প্রকাশ হয়ে পড়ত না। একদিন একটি কিশোরকে ধলঘাট ক্যাম্পে কধুরখীল থেকে ধরে আনা হয়েছে। ঐ গ্রামে মাষ্টারদা ও অন্য কোন পলাতক বিপ্লবী আছেন, এই সংবাদ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রাম্য দেশদ্রোহীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে, বার বার গ্রাম, পাড়া ও বাড়ী গভীর রাত্রে অতর্কিতে ঘেরাও করেও বিপ্লবীদের ধরতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। তাই ঐ গ্রামের এই ছাত্রটি বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত এই সংবাদ পেয়ে, পুলিশ তাকে ধলঘাট ক্যাম্পে নিয়ে আসে। অনেক অত্যাচার ও লোভ দেখাবার পরও যখন এই ছেলেটির মুখ থেকে কোন তথ্য আদায় করা গেল না, তখন তাকে বলা হল ক্যাম্পের নিকটবর্তী অশ্বত্থ গাছে তাকে ফাঁসী দেওয়া হবে।

তবুও এই দেশপ্রেমিক কিশোরটি অচল অটল। নির্ভীকভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যই বেশ মোটা এক লম্বা পাটের দড়ি নিয়ে এসে তাকে গাছ তলায় নিয়ে যাওয়া হল। তার দুই পা জোড়া করে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়িখানার অপর প্রান্ত অশ্বত্থ গাছের ডালে ছুঁড়ে দেওয়া হল। তারপর আস্তে আস্তে দড়িখানা টানতে শুরু করলে কিশোরটির পা উপর দিকে আর মাথা নীচের দিকে হয়ে যায়। তখন দড়িটা টেনে রেখে আবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সূর্য সেন, নির্মল সেন এরা কোথায় এসব তাকে বলতে হবে। ছেলেটি অবিচলিতভাবে এক জবাবই দেয়—"জানি না।"

তখন পুলিশের লোক দড়িটা কিছু ছেড়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরে এসে ছেলেটির মাথা মাটিতে আঘাত লাগে। যন্ত্রণাকাতর

মুখে কঠোরতা ফুটে ওঠে। কিন্তু কোন সংবাদ এই বর্বরতার পরও পুলিশ পায় না।

আর একটি স্কুলের ছেলেকে এই ক্যাম্পে আনা হয়। অনেক চেষ্টার পর তার কাছ থেকে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে, ছেলেটিকে কঠিন শীতের রাত্রে উলঙ্গ করা হয়। তারপর গরম সিদ্ধ ডিমের উপরের খোসা ছাড়িয়ে ছেলেটিকে মাটিতে ফেলে তার গুহ্যদ্বারে জোরে চেপে ধরা হয় এবং ঢোকাবার চেষ্টা করা হয়। তাতেও যখন ঐ দেশভক্ত কিশোর অবিচল ছিল, তখন তাকে ক্যাম্পের পাশে যে পাকাঘাট দেওয়া বড় পুকুর আছে, তাতে নিয়ে শীতের ভিতরে খালি পায়ে, ঐ উলঙ্গ অবস্থায় অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অবশেষে তার কাছ থেকে কোন সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে, ঐ ঘৃণ্য বর্বরের দল ছেলেটিকে ক্যাম্পের এই নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার থেকে মুক্তি দেয়।

আজ আমরা যখন রোজ দু'বেলা খেতে বসি, আমাদের প্রতি গ্রাস অন্নের মধ্যে যেমন কৃষকের কতটা দান আমাদের স্মরণ থাকে না— তেমনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এই দেশ থেকে দূর করে দেওয়ার পরে যে আজাদী আমরা আজ ভোগ করছি, তখন এমন সব নাম-না-জানা দেশপ্রেমিকদের আত্মদানের কথা কি আমাদের মনে পড়ে? এমনই কত হিন্দু মুসলিম নরনারী, ছাত্র কিশোর—দেশকে পরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বীরত্ব-ব্যঞ্জক উপায় তারা গ্রহণ করেছিল এবং সেইজন্য তাদের অমূল্য প্রাণও উৎসর্গ করেছিল। আজ তাদের যথাযোগ্য ভাবে সম্মান করা দূরে থাকুক, আজ তাদের আত্মত্যাগকে কেবল স্মরণ রাখার মত আমাদের সর্বনিম্ন দায়িত্বও আমরা কি পালন করতে পেরেছি?

বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীকে দেশদ্রোহীর সাহায্যে গ্রেপ্তার করার পর পটিয়া থানায় নিয়ে প্রকাশ্যভাবে যে অত্যাচার করা হয়, তাতে তখনকার দিনের এক গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্‌পেক্টার বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। বন্দী বিপ্লবী নেতার নাকে মুখে ঘুসি মারার ফলে রক্তপাত হতে

দেখে সেদিন নীরব দর্শকদের মধ্যে কিশোর বিপ্লবী হরিপদ প্রতিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে তখন স্কুলের ছাত্র। সে বার বার গোপন নেতৃত্বের কাছে দাবী করতে থাকে যে, যেই গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টারটি সবার পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতাকে এমন অমানুষিকভাবে অত্যাচার করেছে, তাকে খতম করে দিতে হবে। হরিপদ খুব ছোট ছিল বলে, প্রথমে এই কাজের গুরুদায়িত্ব তাকে দেওয়া না হলেও, পরে তার আগ্রহাতিশয্যে তাকেই এই কাজে অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৩১-এর ৩০শে আগষ্ট তারিখে পাহাড়তলী নেজামত পল্টন মাঠে ফুটবলের রেলওয়ে কাপের শেষ খেলা। প্রভূত জনসমাগম হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের জন্য সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে। সব সরকারী কর্মচারীরা নিজ নিজ কোমরে রিভলভার, সঙ্গে রিভলভার ও পিস্তলবাহী দেহরক্ষী নিয়ে খেলা দেখতে বসেছেন। তার মধ্যে ঐ পূর্বোক্ত গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টারও ছিল। অদূরে বিভিন্ন দর্শকদের মধ্যে কিশোর বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য গুলীভরা রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত আছে। খেলা শেষ হল, কাপ বিতরণের পর অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ঐ গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টার গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় হরিপদের গুলীতে সে ধরাশায়ী হল। পর পর কয়েকটি গুলীতে তার মৃত্যু হয়। হরিপদকে ঘটনা স্থলেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়।

এই গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টার হত্যাকে উপলক্ষ করে তখনকার শাসক-শ্রেণী চট্টগ্রাম শহরে এক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কোতোয়ালীতে তখন যে দারোগা ছিল, সে ভদ্রলোক নিহত গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টারের বিশেষ অনুগত ও বন্ধুস্থানীয়। ইংরেজ পুলিশ সুপার কোতোয়ালীর এই বড় দারোগার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে এ সময় চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার এক ঘৃণ্যপথ অবলম্বন করে। হত্যাকারী আর নিহত ব্যক্তি দুই সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় এই ব্যাপারে তাদের কিছু সুবিধা হয়। তাই সহজেই ধর্মান্ধতা জাগানো ইংরেজ ও তার দালালদের পক্ষে কঠিন হয় না। আবার বিপ্লবীদলে তখন মুসলিম মধ্যবিত্ত যুবকদের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। তাই প্রধানতঃ হিন্দু ছাত্র ও তরুণরাই যখন ইংরেজ শাসনকে খতম করার সংগ্রামে লিপ্ত তখন শহরের

বড় বড় কিছু হিন্দুবাড়ীতে যদি লুটতরাজ করানো যায়, তা'হলে ভয়ে তাদের বাড়ীর ছেলেদের তারা আর বিপ্লবীদলে যেতে দেবে না।

গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টার হত্যার পর হরিপদ ভট্টাচার্য যখন ধরা পড়ে তখন তার উপর চরম দৈহিক অত্যাচার হয়েছিল। তাকে পুলিশ হাজতে নেওয়ার পর পলাতক নেতা সূর্য সেন, নির্মল সেন ইত্যাদির খোঁজ পাওয়ার জন্য হরিপদকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ ও অত্যাচার করা হয়, কিন্তু তার অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কাছে সব ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন কোতোয়ালীর বড় দারোগা শহরের বিভিন্ন পাড়ার দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে দাঙ্গা ঘটাবার জন্য সলা পরামর্শ করে। তারাও লুটতরাজ করে কিছু রোজগার করতে পারবে এবং স্বয়ং কোতোয়ালীর বড় দারোগা তাদের সহায় থাকবে এই আশ্বাস পেয়ে তারা দলে দলে শহরের কিছু হিন্দুর দোকান-পাট, ঘর-বাড়ী লুট করতে থাকে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নেওয়ার জন্য উপরওয়ালার নির্দেশ পেয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। শহরের বড় বড় কাপড়ের দোকান, সোনা-রূপার অলঙ্কার, গ্রামোফোনের দোকান এবং কিছু অর্থবান ব্যক্তিদের বাসা দলে দলে লোক গিয়ে আক্রমণ করে। দোকানের মূল্যবান সোনার অলঙ্কার, কাপড়-চোপড়, বাসা থেকে সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, হারমোনিয়াম ইত্যাদি ঐ সব লোক জোর করে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে ইংরেজ পুলিশ সুপার পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল।

শহরের এই পরিকল্পিত লুণ্ঠন লীলার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তখনকার দিনের কলিকাতার বাইরে অবিভক্ত বাংলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা "পাঞ্চজন্যে"র উপর হামলা। চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের নেতা মহিম চন্দ্র দাস তখন লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে বন্দী আছেন। তিনিই "পাঞ্চজন্য" পত্রিকার প্রধান পরিচালক। "পাঞ্চজন্য" পত্রিকা কংগ্রেসের মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনার প্রথম থেকে, এই পত্রিকায় দেশপ্রেমিক ঐ বিপ্লবী বন্দীদের মামলার সমস্ত খবর খুবই বিস্তারিতভাবে উঠত। তার জন্য গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টার হত্যার পরে, পুলিশ সার্জেণ্ট ও সশস্ত্র বাহিনী গিয়ে ঐ পত্রিকা আপিসের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দাস তখন "পাঞ্চজন্য" সম্পাদক। ঐ সময় তিনিও আপিসে ছিলেন না।

বর্বর পুলিশের দল "পাঞ্চজন্য" আপিসে ঢুকেই পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীহীরেন চৌধুরীকে বেদম প্রহার করে এবং তাঁর মাথায় বন্দুকের কুঁদা দিয়ে আঘাত করে। ফলে তাঁর মাথা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয় এবং তিনি এর ফলে বহুদিন হাসপাতালে ছিলেন। ছাপাখানার জিনিস-পত্র সব ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে, অন্যান্য কর্মীদের মারধর করে ফিরে যাবার সময় তারা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে "পাঞ্চজন্য" পত্রিকার বড় মূল্যবান ছাপার যন্ত্রটি ভেঙ্গে দিয়ে যায়। হিটলারের হিংস্রতার পূর্বে সংবাদপত্র আপিস ধ্বংসের এই রকম ঘটনার ইতিহাসে আর বেশী জানা যায় না।

গ্রামে পুলিশের অত্যাচার আরও চরম আকার ধারণ করে। উপরোক্ত গোয়েন্দা ইনস্পেক্টারকে হত্যা করার জন্য যেই বিপ্লবী কিশোর হরিপদ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাকে সঙ্গে করে সশস্ত্র পুলিশ তার গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যায়। গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী, সামান্য কিছু আসবাব তাদের ছিল। গুর্খা সৈন্যরা ঘরে ঢুকেই ভোজালী দিয়ে জানালা, দরোজা, কাঠের চৌকি, খাট সব কেটে নষ্ট করতে থাকে। হরিপদ ভট্টাচার্যের পিতামাতা ও অবিবাহিত বোনকে টেনে ঘরের বাইরে এনে উঠানে দাঁড় করানো হয় এবং একবার তাদের সামনে হরিপদকে নিয়ে এসে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করা হয়। আবার তাকে দু'দিক থেকে ধরে রেখে, তার মা বাবা বোন এদের উপর বর্বর নির্যাতন করা হয়। বিশেষতঃ মেয়েদের গায়ে অন্যায়ভাবে হাত দেওয়া হয়। রাইফেল আর সঙ্গীনের পাহারায় এই চরম বর্বরতা কিছুক্ষণ চলার পর, পেট্রোল দিয়ে পুলিশ হরিপদ ভট্টাচার্যদের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়।

তারপর তারা হরিপদকে সামনে নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীর উপর হামলা করতে যায়। পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও কিছু কিছু গ্রামবাসী দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই কিশোরকে দেখছিল। পুলিশ তাকে বলে, তাকে চেঁচিয়ে বলতে হবে—"বৃটিশ সরকার কী জয়" "সূর্য সেন ধ্বংস হোক"। নির্ভীক কিশোর দৃপ্তকণ্ঠে বলে "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", "ইনক্লাব জিন্দাবাদ," "মাষ্টারদা কী জয়"। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর নির্মম প্রহার চলতে থাকে। এক উৎসাহী ইংরেজের ভাড়াটিয়া সৈন্য সঙ্গীন দিয়ে তার চোখে খোঁচা দেয় আর তার চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এই সৈন্যদল সেদিন সারোয়াতলী স্কুলের পরম শ্রদ্ধেয়

হেডমাষ্টার শ্রীযতীন্দ্রলাল দস্তিদারকেও স্কুলে ঢুকে প্রহার করে। ছাত্রদের সকলের উপর পুলিশ লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার ও নির্যাতন করে। এইভাবে তারা হরিপদ ভট্টাচার্যের নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী সারোয়াতলী, কানুনগোয়পাড়া, ধোরলা, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের নিরপরাধ নারী, শিশু ও অন্যান্য গ্রামবাসীর উপর বর্বর হামলা ও নির্যাতন চালায়। রাত্রে এই নির্যাতন ও বর্বরতা চলার সময়, ইংরেজের এই ভাড়াটিয়া সৈন্য ও পুলিশরা অল্প বয়সের বিবাহিতা মহিলা ও কুমারীদের উপর ব্যভিচার পর্যন্ত করেছে বলে প্রকাশ। এক বাড়ীতে বিপ্লবী সূর্য সেন ও অন্যান্য পলাতক বিপ্লবী নেতারা গোপনে থাকেন এই সংবাদ পুলিশ পেয়েছিল। বাড়ীর মালিক তা অস্বীকার করলে, তাঁর অবিবাহিতা তরুণী কন্যাকে তাঁর সামনে উলঙ্গ করে তার উপর দৈহিক অত্যাচার করা হয় বলে শোনা গেছে।

এই অত্যাচারের সংবাদ চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরাট জনসভায় অনলবর্ষী ভাষায় সুবক্তা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রতিবাদ জানান। এই সভায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন শাসমল ও দেশপ্রিয়কে নিয়ে এক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। ঐ বেসরকারী তদন্ত কমিশন চট্টগ্রাম এসে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুলিশ বর্বরতার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও লাঞ্ছিতা মা বোন ও নির্যাতিত সকলের সঙ্গে ব্যক্তি-গতভাবে আলাপ করেন। শহরেও যে সকল লুটতরাজ ও অত্যাচার একজন ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিচালনায় চলে, এই কমিশন তার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করেন।

বিশেষ করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চেষ্টায় সারা বাংলার জনমত এই ইংরেজ সরকারের পরিকল্পিত অত্যাচারের ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিদারুণ বিক্ষুব্ধ হয়। তার ফলে সরকার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বেল-কে সভাপতি করে একটি সরকারী তদন্ত কমিটি করে। ঐ তদন্ত কমিটির বিভিন্ন সাক্ষ্য গ্রহণের পরে, যে ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী ঐসব লুটতরাজ, নির্যাতন, বলাৎকার ও অন্যান্য অত্যাচার চালানোর জন্য কোতোয়ালী থানায় আহূত এক বৈঠকে উপস্থিত থেকে পরিকল্পনা দিয়েছিল, সে কলিকাতায় এক হোটেলে নিজের রিভলভার দিয়ে

আত্মহত্যা করে। আর "বেল-তদন্ত কমিটির" রিপোর্টে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের ঘোষিত প্রায় সকল অভিযোগই প্রমাণিত হওয়ায়, সে রিপোর্ট আর জনসাধারণের কাছে কখনও প্রকাশ করা হয়নি।

ঐ সময় যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে তৎকালীন র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের শ্রমিক মন্ত্রিসভা "হাউজ অব কমনস্" -এ তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি দেন। ঐ সভায় দেশপ্রিয় চট্টগ্রামের বুকের উপর পুলিশের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে যে বর্বরতা সংগঠিত হয়েছিল, তার বিবরণ জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ পার্লিয়ামেণ্ট তথা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের পক্ষে তা' সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তাই কিছুদিন পর দেশপ্রিয় যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন বোম্বাই বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই ১৮১৮ ইং ৩ নং বেঙ্গল রেগুলেশন আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়। আটককালে তাঁর রক্তের চাপ রোগ বৃদ্ধি পায় এবং সরকার জনমতের চাপে তাঁকে রাঁচির এক বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখেন। ঐ বাড়ীতেই বিনা বিচারে আটক অবস্থায় চট্টগ্রাম তথা তৎকালীন বাংলা ও ভারতের অবিসংবাদিত নেতা ও শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সন্তান দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন।

হরিপদ ভট্টাচার্য গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরটিকে হত্যা করার পরবর্তী-কালে চট্টগ্রাম শহরে ও গ্রামে যে অত্যাচার পুলিশের উদ্যোগে হয়েছিল, তার মধ্যে হিন্দু বাসা-বাড়ী ও দোকান-পাটই লুট হয়েছিল সত্য, কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে তা হয়নি। তখন বিপ্লবীদলে প্রধানতঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র যুবকরাই ছিল ও হত্যাকারী হিন্দু এবং নিহত ব্যক্তি মুসলমান হওয়ায় সাময়িকভাবে কিছু স্বভাব-অপরাধী ও সাধারণ লোককে কোতোয়ালী থানায় ঐদিন সন্ধ্যায় ডেকে কোতোয়ালীর দারোগা তাদের সাম্প্রদায়িকভাবে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, তা'সত্ত্বেও কোন মুসলিম সেদিন কোন হিন্দুর গায়ে হাত দেয়নি, কোন হিন্দুনারীকে অপমানিত করেনি। দোকান, ঘরবাড়ী লুট তারা করেছিল এবং পুলিশ কর্মচারীরা তখন দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখেছিল, লুটের মালের বখ্‌রাও নিয়েছিল। তাই ঐ দিনের

বেদনা-দায়ক ঘটনাগুলিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা সত্যের অপলাপ হবে।

বিচারে হরিপদ ভট্টাচার্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তারপর তাকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা ও অন্যান্য বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে আন্দামান দ্বীপে রাখা হয়।

ষোল

মাষ্টারদা আর নির্মল সেন এই দুই প্রধান বিপ্লবীনেতা ১৯৩২-এর জুনে পলাতক বিপ্লবীদের কয়েকজনকে নিয়ে ধলঘাটে এক গোপন বৈঠক করেন। বাড়ীর মালিক ছিলেন গ্রামের এক সাহসী ব্রাহ্মণ-বিধবা সাবিত্রী দেবী। তাঁর বাড়ীখানা ছিল মাটির দোতলা। বাড়ীতে তখন তাঁর তরুণ পুত্র রামকৃষ্ণ আর তরুণী বিবাহিতা কন্যা। এই বাড়ী গোপন আশ্রয়স্থল আর বৈঠকের জন্য আগেও সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চট্টগ্রামের নারী-বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের সঙ্গে এই গোপন কেন্দ্রে মাষ্টারদা দেখা করবেন। বিপ্লবী নেতা নির্মল সেনও থাকবেন। কিছুদিন পূর্বে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে (কলিকাতা) বিপ্লবী রামকৃষ্ণ যখন ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে একমাত্র প্রীতিলতাই কৌশলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে। শহীদ রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ দিনগুলির কথা দুই প্রধান নেতার শোনার খুব ইচ্ছা। তাই এই গোপন কেন্দ্রে যে জরুরী বৈঠক, তার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রীতিলতার কাছ থেকে ঐসব কথা শোনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা।

প্রীতিলতা ১৯২৯শে ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে মেয়েদের মধ্যে আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়েছিল। তারপর কলিকাতার বেথুন কলেজে বি-এ পড়বার সময় সে ক্লাসের পরীক্ষায় তার চার বিষয়, বাংলা, দর্শন, সংস্কৃত ও ইংরেজী সব ক'টাতেই প্রথম হত। সে দর্শনে অনার্স পড়ত এবং ক্লাসে এত ভাল ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সে দর্শনশাস্ত্রে খুব ভাল অনার্স নিয়ে পাশ করবে বলে কলেজের অধ্যাপিকারা নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ, কালারপোল ইত্যাদি ঘটনার পর ভাল ছাত্রী প্রীতিলতা ভাল বিপ্লবী হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে এবং পড়ায় বেশ অবহেলা করতে থাকে। প্রীতিলতার

যেই নিকট আত্মীয়ের সংস্পর্শে সে বিপ্লবীদলের সদস্যা হয়েছিল, চট্টগ্রামের সেই তরুণ বিপ্লবী তখন কলিকাতায় আত্মগোপনে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বার বার সে দেখা করে কেবল এই দাবীই করছিল, কেন তাঁকে কোন কাজে নেওয়া হবে না—ছেলেদের মত দেশের মুক্তির জন্য লড়তে আর মরতে পারবে। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে আসবার পর প্রীতিলতা বহু চেষ্টা করে পলাতক নেতা মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করে তার এই ইচ্ছা জানায়। ধলঘাটের এই গোপন বৈঠকেও প্রীতিলতা বেশী আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিল, মেয়েদের জন্য প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যোগ দেবার অনুমতি মাষ্টারদার কাছ থেকে আদায় করার জন্য।

তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেন (ভোলা) সন্ধ্যার কিছু পরে প্রীতিলতাকে এই বৈঠকে নিয়ে আসে। তখন গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবীর বিবাহিতা কন্যা স্নেহলতা শহরের শ্যামাঙ্গী অথচ স্বাস্থ্যবতী ও সাহসী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার মার সঙ্গে আলাপ করে যে, নিশ্চয়ই বড়লোকের মেয়ে হবে, তাকে কি করে তাদের অতি সাধারণ খাওয়া ওরা দেবে? কেবল একরাত্রি খাবে, কিছু ভাল খাওয়ানো দরকার। পাশের বাড়ীর এক বউ-এর সঙ্গে স্নেহলতার খুব বন্ধুত্ব। স্নেহলতা তার কাছে গিয়ে বলে তাদের বাড়ীতে এক অতিথি এসেছে, সেজন্য ক'টা হাঁসের ডিম দরকার। কথায় কথায় সে বলে ফেলে তার মধ্যে শহরের এক মেয়েও আছে। পাশের বাড়ীর ঐ মধ্যবিত্ত পরিবারটির কোন লোক এই আলোচনা শুনতে পেয়ে ধলঘাট রায়বাহাদুর দুর্গাদাস দস্তিদারের পুকুর পাড়ে যে মিলিটারী, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ঘাঁটি (ক্যাম্প) ছিল সেখানে এই মূল্যবান খবরটি পৌঁছে দেয়।

এদিকে প্রীতিলতা বলে, সে নেতাদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবে। রান্নায় অপূর্ব ও তাকে সাহায্য করতে থাকে। এখানে প্রীতিলতার নিজের লেখা ডায়েরী থেকে কিছু অংশ উধৃত করলে সবার ভাল লাগবে: "সেদিন সকালেও ভোলার (অপূর্ব সেন) জ্বর নিয়ে সে কত হাস্যকৌতুক" করছে। আনন্দের এই নির্ঝরটিকে যতই দেখেছিলাম, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। নির্মলদা বলছিলেন এই ভোলা হল মাষ্টারদার 'এসিষ্ট্যাণ্ট', ও বেশ ইংরেজী জানে। ওকে দিয়ে তিনি কতকিছু লেখান। ভোলা এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বাড়ী গিয়েছিল।

বাড়ীতে তার অনেকগুলি বৌদি। বাড়ী থেকে চলে আসার সময় সে বৌদিদের ডেকে বলল, তোমরা সব 'ফল্ ইন' কর, আমি নমস্কার করব —আমার 'কমাণ্ড'—বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল অপূর্ব। আজ ভাবছি ঐ রকম করে বিদায় নেওয়া ওরই সাজে।...........

এদিন সাগু ঠাণ্ডা করে অপূর্বকে খাওয়ালাম।

আমার হাতে জীবনের শেষ খাওয়া সে খেয়ে নিল। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হলে খেতে বসতে যাব, তখনই মাষ্টারদা বললেন, 'পুলিশ', 'পুলিশ'। মাষ্টারদাকে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব। তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন, নীচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও। উপরে রইলেন মাষ্টারদা, নির্মলদা আর ভোলা। ক্যাপটেন ক্যামেরণ তখন সিঁড়ি বেয়ে রিভলভার হাতে উপরে উঠছে। নির্মলদা দাঁড়িয়ে তাকে গুলী করলেন। সাহেব ক্যাপটেন ক্যামেরণ গুলীবিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। তারপর দু'দিক থেকে কিছুক্ষণ গুলী চলল।

এমন সময় মাষ্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এল। মাষ্টারদার পাশে তখন ভোলা দাঁড়িয়ে। এত বিপর্যয়েও তার চোখে মুখে কোন চাঞ্চল্য নেই, দেখে কি চমৎকার লেগেছিল। রিভলভারের ট্রিগারে হাতটি রেখে মাষ্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে। মাষ্টারদা বললেন "চলো"। আমরা তিনজন রওনা হলাম। পিছন দিক দিয়ে বেরোবার সময় শুকনো পাতার উপর খস্‌খস্ শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চিরে এক গুলী এসে অপূর্বর বক্ষভেদ করল। আমি আর মাষ্টারদা অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলাম। রামকৃষ্ণদা বলছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। গত দু'দিন ওর সঙ্গেই ছিলাম, তখন তার হাসিই কেবল শুনেছি, অবশেষে আমারই দু'চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।" (প্রীতিলতার নিজের লেখা ডায়েরী থেকে)।

১৯৩২-এর ১৩ই জুন ধলঘাটে মহীয়সী নারী সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে এই সংঘর্ষে একটি ইংরেজ সামরিক কর্মচারী প্রথম নিহত

হয়। তার মৃত্যুতে অধীনস্থ সিপাহীরা প্রথমটা কিছুটা বিব্রত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আরও অস্ত্রশস্ত্র ও সিপাহী এসে এই সংগ্রামে যোগ দেয়। কিন্তু ভিতর থেকে যখন গুলী আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন এরাও উদ্যত সঙ্গীন নিয়ে বাড়ীর মধ্যে যাবার আগে আদেশ দিল, ঘরের মধ্যে কে আছ বেরিয়ে এস।

গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবী, কন্যা স্নেহলতা ও পুত্র রামকৃষ্ণ একে একে বাইরে এল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে যেই গোয়েন্দা পুলিশ ছিল তাদের প্রশ্নবাণ শুরু হল, ভিতরে কে কে আছে তাদের বলতে হবে। মহীয়সী বৃদ্ধা বিধবা মাতা ঐ পরম নির্যাতনের মুখেও দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, "জানিনা"।

তখন ঘর লক্ষ্য করে লুইস গানের গুলীবর্ষণ কিছুক্ষণ চলল। পুরানো মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী দোতলা বাড়ীর এক অংশ ভেঙ্গে পড়ল, তবুও গুলীর প্রত্যুত্তর যখন ভিতর থেকে এল না, সাহস করে কাপুরুষ ঐ সশস্ত্র সিপাহীরা সেই বিধ্বস্ত ঘরে ঢুকল।

সিঁড়ির কাছে দেখা গেল ক্যাপটেন ক্যামেরণের প্রাণহীন দেহ। উপরের তলায় বিপ্লবী নির্মল সেন গুলীবিদ্ধ ও প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে আছেন। বাড়ীর উত্তর পূর্ব কোণে গড়ের পাড়ে পাওয়া গেল বিপ্লবী অপূর্ব সেনের মৃতদেহ। তার পকেটে অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত রিভলভার ও এক গোপন চিঠি পাওয়া যায়। তাতে ইংরেজ এক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে খতম করার বিষয় উল্লেখ ছিল। পুলিশ বাড়ী তল্লাসী করার পর সাবিত্রী দেবী, তাঁর পুত্র ও কন্যাকে গ্রেপ্তার করে শহরে নিয়ে যায়।

ওদিকে ভোলা গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাবার পরই মাষ্টারদা আর প্রীতিলতা আস্তে আস্তে গিয়ে বাড়ীর পূর্ব দিকে পানাভরা গড়ের মধ্যে গিয়ে নামেন। ওখানে কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য নাকটি জলের বাইরে রেখে এই দুই বিপ্লবী অনেকক্ষণ জলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকেন। পরে পুলিশ ঐদিক থেকে সরে গেলে তাঁরা উঠে ভিজা কাপড়ে করলডেঙ্গা পাহাড়ের পাদদেশে এক কৃষকের আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেন। তখন বর্ষার জলে মাঠঘাট ডুবে গেছে, জলকাদা

ভেঙ্গে মাষ্টারদা আর প্রীতিলতা সেখানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন ভোর হবার বেশী বাকী ছিলনা।

ক্রমে পুলিশ জানতে পারে যে, ধলঘাটের ঐ সংঘর্ষে মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা ছিলেন। তাই ইংরেজ সামরিক এক ক্যাপটেনকে হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজ সরকার তার পুলিশ, মিলিটারী আর গোয়েন্দাদের ধলঘাটের নরনারী, ছাত্র, যুবক, কিশোর সবার উপর বর্বর নির্যাতন করার জন্য লেলিয়ে দেয়। অনেককে গ্রেপ্তার করে কুখ্যাত ধলঘাট ক্যাম্পে নিয়ে নানারকম অকথ্য অত্যাচার করা হয়। সমস্ত ধলঘাট গ্রামবাসীর উপর আশী হাজার টাকার "পিউনিটিভ ট্যাক্স্" বসানো হয় এবং তা তাড়াতাড়ি জোর করে ভয় দেখিয়ে আদায় করে ফেলা হয়।

সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র-কন্যাদের বিরুদ্ধে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের জন্য মামলা আনা হয়। কন্যা বিচারে মুক্তি পায়। সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। যখন মাতাপুত্র মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে দণ্ডভোগ করছিল, তখন রামকৃষ্ণ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ঐ জেলেই দেহত্যাগ করে। সাবিত্রী দেবী গ্রাম্য প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণ-বিধবা। জেলে তিনি সাধারণ কয়েদীদের রান্না করা ভাত তরকারী খেতে পারবেন না, কারণ হিন্দু বিধবারা অন্য কারও রান্না স্পর্শ করেন না এই দাবীতে তিনি জেলে অনশন ধর্মঘট করেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন, এটা ঘরবাড়ী নয়, জেলখানা। তাই ওখানকার আইনকানুন না মানলে তাঁর আরও জেল হবে। সাহসী এই গ্রাম্য নারী তখন চীৎকার করে জেল কর্তৃপক্ষকে নানা গালিগালাজ করে বলেন, যদি মৃত্যুও আসে তবু তিনি তাঁর দাবী ছাড়বেন না, তাঁকে নিজে রান্না করে খাওয়ার জন্য সব পাত্র ও সরঞ্জামাদি দিতেই হবে। তাঁর অনমনীয় মনোভাবে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর ঐ ন্যায়সংগত দাবী মেনে নেয়। জেল থেকে ফিরে আসার পর তিনি কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। ১৯৪৬শে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন চট্টগ্রাম "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার" বন্দীদের মুক্তি দেন, তখন বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ চট্টগ্রামে আসার পরই শহীদ বিপ্লবী

নেতা নির্মল সেন ও তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। যে মাটির দোতলায় দাঁড়িয়ে নির্মল সেন গুলী চালিয়ে ক্যাপটেনকে হত্যা করেছিলেন, সেখানে তিনি নিজেও শহীদ হয়েছিলেন, সেই বাড়ীর চিহ্ন তখন নেই। তার পাশে গ্রামবাসীদের অর্থ সাহায্যে ছোট একটি কুঁড়েতে সাবিত্রী দেবী ছিলেন। তাঁর প্রাঙ্গণে দেশপ্রেমিক কর্মীরা অস্থায়ী এক শহীদ স্তম্ভ বিপ্লবী নেতাদের স্মৃতি সভার জন্য তৈরী করেছে। এই দেশভক্ত মহীয়সী নারী তখন অশ্রুসজল চক্ষে ধলঘাট সংঘর্ষের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে বলেন, আমার ছেলে নির্মল আর ভোলাকে সেদিন হারিয়েছিলাম—রামকৃষ্ণকেও জেল থেকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। আমি জানি তোমরা যখন ফিরে এসেছ এর প্রতিশোধ তোমরা নেবে।" তার কিছুকাল পরই সাবিত্রী দেবী এই জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন।

ধলঘাটে যখন প্রীতিলতা মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখনও তার পলাতক জীবন আরম্ভ হয়নি। সে গোপনে তাদের শহরের আসকার খাঁর দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার বাসা থেকে প্রধান নেতা সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার প্রধান দাবী ছিল, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে গত দুই বৎসরে কোন মেয়েকে কেন "কাজ" দেওয়া হবে না। ১৯২৬-২৭শে প্রথম যখন এক নিকট আত্মীয় বড় ভাই-এর মারফত সে বিপ্লবীদলের সঙ্গে প্রথম সংযুক্ত হয়, তখনও তার প্রশ্ন ছিল, যদি ঝাঁসীর রাণী খোলা তলোয়ার নিয়ে ইংরেজের সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে পারে, সে কেন পারবে না। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রীতিলতার ডাক নাম ছিল 'রাণী'।

বিপ্লবীদলে যোগ দেবার পর পাঁচ ছয় বছর পার হয়ে গেল, অনেক তরুণ লড়তে লড়তে হাসতে হাসতে দেশের মুক্তির জন্য নিজেদের তাজা প্রাণ উৎসর্গ করে গেল—এবার মেয়েদেরও দেশের জন্য মরতে দিতে হবে—এই ছিল বিপ্লবীকন্যা প্রীতিলতার দাবী।

ধলঘাট সংঘর্ষের পর পুলিশ জানতে পারে যে, সেখান থেকে প্রধান নেতা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা সাফল্যের সঙ্গে পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

তাই তারপর থেকে বাধ্য হয়ে প্রীতিলতাকে আত্মগোপনে থাকার জন্য অনুমতি দিতে প্রধান নেতা মাষ্টারদা বাধ্য হন। বিপ্লবী দলের সদস্যাদের পক্ষে তখনকার মিলিটারী ও পুলিশ জুলুমের দিনে আত্মগোপন করার কোন সিদ্ধান্তই এর আগে হয়নি। কারণ মেয়ে-বিপ্লবীদের পক্ষে রাত্রে চলাফেরা করা, বিভিন্ন পোশাক নিয়ে পুলিশ বিভ্রান্ত করা—ইত্যাদি কাজ সহজ ছিল না।

কিছুদিন পূর্বে দলের অন্যতম নারী-বিপ্লবী কল্পনা দত্ত পুরুষের পোশাকে তাদের আন্দরকিল্লার বাসা* থেকে গোপন বিপ্লবী কেন্দ্রে কাট্টলী যাবার পথে পাহাড়তলী ষ্টেশনের পাশে ভেলুয়ার দীঘির কোণায় গুণ্ডা প্রকৃতির কিছু লোকের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল চট্টগ্রাম কলেজের বি-এ ক্লাসের একটি ছোট ছেলে। তার ডাক নাম ছিল বুলবুল। গুণ্ডা প্রকৃতির লোকগুলি প্রায়ই ঐ দীঘির উঁচু বড় পাড়ে বসে আড্ডা দিত। কল্পনা দত্ত তার সাথীকে সঙ্গে করে' পুরুষের পোশাকে তাদের পাশ দিয়ে যেতেই ওদের মধ্যে একজন এসে তার হাত ধরে ফেলে। তারা বলে এই মেয়ে পুরুষের পোশাক পরে' পালিয়ে যাচ্ছে। সৌভাগ্যবশতঃ কোন মামলার তদন্ত করার জন্য এক দারোগা ও কিছু পুলিশ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ঐ দারোগাই তখন কল্পনা দত্ত এবং তার সাথী বিপ্লবী ছাত্রটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। কল্পনারও বিশেষ আগ্রহ, তাকে "কাজ" দিতে হবে। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের এই দু'টি নারী বিপ্লবী বার বার প্রধান নেতা সূর্য সেনকে অনুরোধ করেছেন, দেশের মুক্তি সংগ্রামে মেয়েরাও যে তাদের ভাইদের চেয়ে কম সাহসী নয় তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাই পাহাড়তলীতে ধরা পড়ে জামিনে মুক্ত থাকার সময় বিপ্লবী নারী কল্পনা দত্ত আবার তাদের শহরের বাসা থেকে আত্মগোপনে চলে যাবার জন্য দলের সর্বপ্রধান নেতাদের অনুমতি পায়। সে দ্বিতীয়বার পলায়নের সময় চট্টগ্রাম কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্রী ছিল। এবার চট্টগ্রাম কলেজের ঠিক পশ্চিমে দেব পাহাড়ের ভিতর দিয়েই সে সফলভাবে পলায়ন করতে

---

* চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের ঠিক নীচে যে "নিমাইচরণ দস্তিদার চেরিটেবল আউটডোর" ডাক্তারখানায় বর্তমানে "যক্ষ্মা-নিরোধ কেন্দ্র" স্থাপিত হয়েছে তার ঠিক উত্তরে যে বড় দোতলা বাড়ী, ওটা ছিল কল্পনা দত্তের পিতামহ রায় বাহাদুর ৺দুর্গাদাস দত্তের বাড়ী, গ্রেপ্তার হবার পর মামলা চালাতে গিয়ে ঐ বাড়ীখানা তাদের বন্ধক দিতে হয়েছিল, পরে তা হারাতে হয়েছে।

পারে। তখন চট্টগ্রাম কলেজের পালি-অধ্যাপক যিনি ছিলেন, তাঁর এক সুন্দর বাসা দেবপাহাড়ে ছিল। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পালির অধ্যাপক শ্রীযুত মহিম বড়ুয়ার এক মেয়ে ছিল কল্পনা দত্তের পরিচিতা। তার সাহায্যে এবার সফলতার সঙ্গে সে বিপ্লবীদের গোপন আডডায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়।

বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এই দুইজন নারী সদস্যাকে আত্মগোপনে থাকার অনুমতি দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে পরে বিপ্লবীরাই অনেক আলোচনা করেছেন। অনেকের মতে এই আত্মগোপনের অনুমতি দেওয়ার ফলে দলের মধ্যে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষতঃ এই দুই বিপ্লবী কুমারী তরুণী হওয়ায়, পলাতক জীবনের গোপন আশ্রয়স্থলগুলির মাতা, বধূ ও অন্যান্য মেয়েরা তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। পুরুষ-বিপ্লবীদের পক্ষে মুসলিম পরিবারে লুঙ্গি পরে থাকা যেমন সহজ ছিল, গ্রামের মুসলিম মেয়েদের মত দুইখানা কাপড়ে দেহ ঢেকে এই একটি গ্রাজুয়েট ও অন্যটি কলেজের ছাত্রী হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের পক্ষে বিভিন্ন পোশাকে থাকা সম্ভব ছিলনা। তবে হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে তারা বেশ সহজেই মিশে গিয়ে থাকতে পারত। প্রীতিলতা ও কল্পনা আত্মগোপনে যাবার পর গ্রামে পুলিশ তৎপরতা খুব বৃদ্ধি পায়। তাদের দু'জনকে ধরার জন্য পুলিশ প্রথমে আড়াই শত টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করে। পরে এই টাকার সংখ্যা বাড়ানো হয়।

প্রথমেই কল্পনা দত্তকে বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে ভার দেওয়া হয়—চট্টগ্রামের ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে শহরে পাহাড়ের উপর তার বাড়ীতে রাত্রে উঠে গুলী করে হত্যা করতে হবে। তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অতি সাবধানে কঠিন পুলিশ পাহারায় বাস করতেন। রাত্রে সশস্ত্র হয়ে কল্পনা দত্ত ঐ পাহাড়ের প্রায় উপরে যখন উঠে গেছেন, তখন পাহারাদার সৈন্যরা কতক্ষণ পর পর নিয়মমত যে "রকেট কার্টিজ" আকাশে ছুঁড়ছিল, তা ছুঁড়ে দেওয়ার ফলে সারা আকাশ আলোয় সামান্য সময়ের জন্য ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা দত্তকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরের দিকে এগিয়ে যাবার আগ্রহ দমন করে, পাহাড়ের গায়ে লম্বা হয়ে পড়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসতে হয়। নারী-বিপ্লবীদের দিয়ে "কাজ" করার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রীতিলতাও কল্পনার বৈপ্লবিক কাজে আত্মদানের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

সতের

আগেও বলা হয়েছে যে, ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল গুড্-ফ্রাইডে থাকায়, সেই রাত্রের অন্যতম পরিকল্পনা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা সম্ভব হয়নি। খৃষ্টানদের প্রধান পর্বের জন্য সেদিন ক্লাব বন্ধ ছিল। তারপর থেকে প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত বিপ্লবীদের অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে এক সঙ্গে অনেক ইংরেজ হত্যার এই সিদ্ধান্ত সর্বদাই অব্যাহত ছিল।

ধলঘাট ক্যামেরণ-হত্যার পর থেকে প্রীতিলতাকে আত্মগোপনে যেতে হয়েছিল পূর্বেই বলা হয়েছে। তার সঙ্গে তার চেয়ে কিছু ছোট কল্পনা দত্তকেও* পরে আত্মগোপন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০শের অন্যতম পরিকল্পনা চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের খবর স্থানীয় ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ানরা জানার পর থেকে তারা ওখানে নাচগান ও খেলা-ধূলা ছেড়ে দেয়। শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে, রেলওয়ে এলাকা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে সশস্ত্র রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের সান্ধ্য ও নৈশ আনন্দ উচ্ছাস এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা তারা করেছিল।

তাই এই পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবই বিপ্লবীরা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করে। তখন দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে প্রধানতঃ বিশিষ্ট বিপ্লবী তরুণ শান্তি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদের একটি খুব ভাল ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। অদূরে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে

* প্রীতিলতা ও কল্পনা দুইজনই তখনকার দিনের চট্টগ্রামের একমাত্র উচ্চ-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রীতি ১৯২৭শে, কল্পনা ১৯২৯শে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। কল্পনা ম্যাট্রিকে ১৫ টাকার বৃত্তি পায়। প্রীতি কয়েকটি 'লেটার' পেয়ে ১ম বিভাগে পাশ করে ঢাকা ইডেনে আই-এ পড়তে যায়। পরে ওখান থেকে মেয়েদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম স্থান অধিকার করে সে ২০ টাকা বৃত্তি পায়।

বিপ্লবীরা গোপনে ও নিরাপদে পিস্তল, রিভলভার ও রাইফেল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। কারণ গুলীর শব্দকে সমুদ্রের গর্জন ওখানে বিলীন করে দিত। পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের সব আয়োজন এই কাট্টলী কেন্দ্রে বসেই করা হয়।

এই পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য প্রথমে বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। নানা কারণে পর পর দুইবার এই তরুণ বিপ্লবী পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার বেদনা সহ্য করতে না পেরে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী একদিন রাত্রে কাট্টলীর সমুদ্র তীরে গিয়ে রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করে। এভাবে সে যে মরবে, বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদা থেকে শুরু করে তার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ মনে করেনি। ১৯২৭শে যখন কক্সবাজারে সে তার উকিল পিতার সঙ্গে থাকত তখন অমৃতাঙ্কুর সেনগুপ্ত, বিধূ সেন, প্রবোধ রক্ষিত ইত্যাদি তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গেই তার বিপ্লবী জীবন শুরু হয়। তার মত এত উৎসাহী, কর্মঠ ও সদাহাস্যময় তরুণ তখনকার বিপ্লবীদলে কমই দেখা যেত। আই-এ পড়ার সময় সে কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালায় যখন ছিল, তখন সেখানেও তার চরিত্র-মাধুর্য সকলের কাছে তাকে প্রিয় করে তুলেছিল এবং সে ছাত্রদের নিয়ে একটি গোপন বিপ্লবীদল গড়ে তুলেছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে সে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আত্মগোপন করেছিল। মাষ্টারদার নির্দেশেই পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ করতে যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে মাষ্টারদার কাছে একখানা চিঠি লিখে রেখে যায়। তাতে সে তার ক্লাব আক্রমণের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ করে।

এরপর মাষ্টারদা স্থির করেন যে, মেয়ে বিপ্লবীদের দিয়েই এই কাজ করাতে হবে। তিনি তখন বলেছিলেন:

"বাংলায় বীর যুবকের আজ অভাব নাই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ, কালারপোল পর্যন্ত এদের দীপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে বীর যুবকের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও যে শক্তির খেলায় মেতেছে, ইতিহাসে সে অধ্যায় আজও অলিখিত রয়ে গেল। মেয়েদের আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হোক এই-ই

আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগত জানুক, এদেশের মেয়েরাও মুক্তি যুদ্ধে পিছনে নেই।"

এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাষ্টারদা পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের কিছুদিন পূর্বে একবার দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে আসেন। ওখানে আলাপের জন্য আসবার পথে পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং তারিখে পাহাড়তলীতে ধরা পড়েছিল। প্রীতিলতা নিরাপদে কয়েকদিনের মধ্যে সেখানকার গোপন কেন্দ্রে আসে। মাষ্টারদা তাকে জানিয়ে দেন যে, তার নেতৃত্বে ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৩২ ইং) তারিখে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হবে।

শুনে প্রীতিলতা খুবই আনন্দিত হয় এবং কাট্টলী সমুদ্রসৈকতে গিয়ে বোমা ছোঁড়া ও গুলীতে লক্ষ্যস্থির করার শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। নির্ধারিত তারিখে মাষ্টারদা একজন দেহরক্ষী নিয়ে আবার এখানে রাত পৌনে দশটায় হাজির হন। ক্লাব আক্রমণের জন্য প্রীতিলতার নেতৃত্বে অন্য যেসব বিপ্লবী নির্বাচিত হয়েছিল তাঁরা হলেন:

(১)	শান্তি চক্রবর্তী*	(দক্ষিণ কাট্টলী)
(২)	কালী দে	(গোসাইল ডাঙ্গা)
(৩)	সুশীল দে	(ধোরলা)
(৪)	প্রফুল্ল দাস	(কাট্টলী)
(৫)	মহেন্দ্র চৌধুরী	(মোহরা)

রাত দশটায় পূর্ণ সামরিক বেশে সজ্জিত হয়ে প্রীতিলতা ও অন্যান্য বিপ্লবীরা সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্লাব আক্রমণের জন্য বেরিয়ে যায়। আগে থেকে ক্লাবের সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য বিপ্লবীরা যোগাড় করেছিল। প্রীতিলতা বিপ্লবীদের নিয়ে ক্লাবের কাছাকাছি বেশ নিরাপদেই চলে আসতে পারেন। সেখানে গিয়ে একটু ঝোপের মত যায়গায় কিছুক্ষণ তারা আত্মগোপন করে থাকে। সেখান থেকে

* বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তী ১৯৩৪শে ধৃত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর ১৯৩৮ থেকে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। পরে যক্ষ্মা রোগে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ১৯৪৩ ইং তাঁর মৃত্যু হয়।

তারা দেখতে পায় যে ক্লাবে তখন "বল"-নাচ চলছে এবং সশস্ত্র প্রহরী দরজায় দাঁড়ানো। তবুও বিপ্লবীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তারা আক্রমণ করবেই।

আক্রমণ পদ্ধতি সম্পর্কে গোপন-ঘাঁটি ত্যাগ করার পূর্বেই বিশদ আলোচনা হয়েছে। তবুও আর একবার প্রীতিলতা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, হুইসেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ তিন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। বিলিয়ার্ড রুমের দিকে একদল, পিছন দিক থেকে একদল এবং প্রীতিলতার সঙ্গে একদল (প্রতি দলে ২।৩ জন) প্রথমে বোমা, রাইফেল ও রিভলভার দিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে।

ক্লাবের এ দেশীয় এক মুসলিম বাবুর্চির সঙ্গে আগে থেকে বিপ্লবীদের সংযোগ হয়েছিল। এই মুসলিম যুবক বিপ্লবীদের ক্লাব সম্পর্কে সব তথ্য (কত দরজা জানালা—কোন্‌দিকে কয়টা প্রবেশ পথ, পলায়নের পথ ইত্যাদি) সরবরাহ করেছিল। ক্লাবে ইউরোপীয়ান নারী-পুরুষ কখন বিশেষভাবে পানোন্মত্ত বা খেলাধূলা, নাচে মত্ত, এই বিশেষ ক্ষণটিতে বাবুর্চিখানার ছোট জানালা থেকে বাবুর্চি একটি ছোট টর্চ-এর আলো কয়েকবার জ্বালানো ও নিভানো দ্বারা সংকেত করবে। এই গোপন-সংকেত আগে থেকেই স্থির ছিল। দেখা গেল ঠিকমত এই সংকেত পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ক্লাব আক্রমণের আদেশ দিয়ে নিজেও দৌড়ে সামনের দরজায় গিয়ে বোমা নিক্ষেপ করে। দরজায় যে সশস্ত্র প্রহরী ছিল তাদের মধ্যে যারা আহত হয়ে পড়েনি, তারা প্রলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করে। অন্য দুইদিক থেকেও পূর্ব-পরিকল্পনা মত আক্রমণ চলল। আর্তনাদ, হাহাকার, ধোঁয়া সবকিছু মিলে এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটি ইংরেজ পুরুষ মদের টেবিল থেকে বোতল, কাঁচের গ্লাস এসব বিপ্লবীদের দিকে ছুঁড়ে মারছিল। প্রীতির অব্যর্থ গুলীতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। টেবিলের তলা থেকে এক ইংরেজ হঠাৎ প্রীতিকে লক্ষ্য করে গুলী করে। গুলী এসে প্রীতিলতার হাতে লেগে বুকের পাশ ঘেঁসে চলে যায়। প্রীতিও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ইংরেজটিকে গুলী করে। প্রীতিলতার ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

দূর থেকে মিলিটারী মোটরগাড়ীর সন্ধানী আলো এসে ক্লাবের দিকে পড়তেই প্রীতির আদেশে বিপ্লবীরা পশ্চাদপসরণ করে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই প্রীতিলতা জিজ্ঞাসা করে সবাই ঠিকমত এসেছে কিনা। দেখা গেল সকলেই ফিরে এসেছে, তখন প্রীতিলতার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। সে তার পোশাকের ভিতর থেকে বের করে মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সায়েনাইড। স্বাদে মিষ্ট এই বিষ প্রীতিলতা তখন মুখে ঢেলে দেয়।

প্রীতিলতার এভাবে বিষ খাওয়ার ব্যাপারে কোন কোন মহল থেকে সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল যে, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সাফল্যের পরও কেন প্রীতি বিষ খেয়েছিল? এ সম্পর্কে তখনকার বিপ্লবীদের কর্মধারার একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা দরকার। বিপ্লবী দলের পুরুষ সদস্যদের ব্যাপারে কোন অস্ত্র-সংঘর্ষমূলক কাজে যাবার সময় নির্দেশ থাকত, যতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে গুলী থাকবে, ততক্ষণ গুলী চালাতে হবে। এর মধ্যে যদি কোন কৌশলে পশ্চাদপসরণ করা সম্ভব হয় তা করতে হবে। তাও যদি অসম্ভব হয় গুলী শেষ করে ফেলার পর আত্মসমর্পণেও কোন বাধা নেই।

মেয়ে বিপ্লবীদের এই ধরনের কাজে পাঠাবার সময় আর একটি বেশী নির্দেশ থাকত। তাদেরও শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে কিন্তু সহজে পুলিশের হাতে ধরা তারা দেবেনা, কারণ মেয়েদের সম্পর্কে মানবোচিত মর্যাদা দানের মত মনোবৃত্তির অভাব বহুভাবেই তখনকার পুলিশেরা প্রকাশ করেছিল। তার উপর যদি আহত হয়ে মেয়েদের পড়ে থাকতে হয় এবং সেজন্য ধরা পড়তে হয়, তাহলে কোন অবাঞ্ছনীয় ও ঘৃণ্য দৈহিক অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিষপানে দেহত্যাগই শ্রেয়। প্রীতিলতা আহত হয়েছিল এবং সেই আঘাত থেকে রক্তক্ষরণে তার গায়ের পোশাক পর পর দুই তিনটি যেভাবে ভিজে যাচ্ছিল, তা থেকে প্রীতিলতা হয়ত মনে করেছিল, তার আঘাত বেশ গুরুতর। আর ঐ অবস্থায় শত্রুর হাতে যাওয়া অপেক্ষা নিজেকে জগত থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই প্রীতিলতা করেছিল। প্রীতিলতাকে শৈশব থেকে জানবার এবং বিপ্লবী দলে যোগদানের প্রথম মুহূর্ত থেকে তাকে বুঝবার

সুযোগ যাদের হয়েছিল, এই অভিমত তাদেরই।*

আক্রমণের কিছুক্ষণ পরে পুলিশ ও মিলিটারী এসে মৃত ও আহত ইংরেজ নর-নারীদের ক্লাবের ভিতর থেকে বারান্দায় এনে পাশাপাশি রাখে। কিছুক্ষণ পরে তারা প্রীতিলতার খাকি সামরিক পোশাক পরিহিত মৃত দেহটিও পায় তখনও তারা ঐ মৃতদেহ যে একজন নারী বিপ্লবীর তা বুঝতে পারেনি। পরে শরীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা তা বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃতদেহ শহরে কোতোয়ালী থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেহ তল্লাসী করে প্রীতিলতার কাছে পাওয়া যায়:—

১। মাথার পাগড়ী—এটা খোলার পরই তার দীর্ঘ কেশ মাটিতে এলিয়ে পড়ে;

২। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের "প্ল্যান";

৩। শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো;

৪। ভারতীয় রিপাবলিক্যান আর্মির একটি বিজ্ঞপ্তি যাতে প্রীতিলতার ফটো ছাপানো ছিল;

৫। একটি 'হুইসেল';

৬। একটি নিজের হাতে লেখা বিবৃতি।

---

* যাঁরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত ত ছিলই না বরং নানাভাবে বিপ্লবী সূর্য সেন দলের বিরোধিতা করেছিল, তারা আপন স্বার্থোদ্ধারের জন্য, এই বিষয়ে নানাভাবে শুনে এবং উদ্দেশ্যমূলক কল্পনার সাহায্যে যে গ্রন্থ রচনা করে এবং তা থেকে সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা ঘটনা মিশিয়ে ছায়াচিত্র দ্বারা জনসাধারণের দেশপ্রেমকে বেসাতি করে দু'পয়সা আয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, তাদের বিবরণে চট্টলগৌরব বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত সম্পর্কে অনেক অন্যায় ও অসত্য মন্তব্য করা হয়েছে। তাতে ঐ লেখকের মানসিক বিকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে। সে দিনের বৈপ্লবিক দলের চিন্তাধারা যে অবৈজ্ঞানিক তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও এইসব মহীয়সী মেয়েদের দেশপ্রেমকে মুখোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা দিতে যারা কুণ্ঠিত তাদের জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার যারা তাদের সম্পর্কে করে, তাদের জন্য খাঁটি দেশপ্রেমিকদের অবজ্ঞাই প্রাপ্য।

প্রীতিলতার সেই বিবৃতিটি নীচে দেওয়া হল :—

"আমি বিধিপূর্বক ঘোষণা করিতেছি, যেই প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যাচারীর স্বার্থ সাধনে প্রয়োগকারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক আমি সেই ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্যা।

এই বিখ্যাত "চট্টগ্রাম শাখা" দেশের যুবকদের দেশপ্রেমকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। স্মরণীয় ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল এবং উহার পরবর্তী পবিত্র জালালাবাদ ও পরে কালারপোল, ফেণী, ঢাকা, কুমিল্লা, চন্দননগর ও ধলঘাটের বীরোচিত কার্যসমূহ ভারতীয় মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের মনে এক নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আমি এইরূপ গৌরবমণ্ডিত একটি সংঘের সদস্যা হইতে পারিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী অনুভব করিতেছি।

আমরা দেশের মুক্তির জন্যই এই সশস্ত্র যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধেরই একটি অংশ।

বৃটিশ জোর পূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর রক্তশোষণ করিয়া তাহারা দেশে নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের এবং সকল অধঃপতনের একমাত্র কারণ। সুতরাং তাহারাই আমাদের একমাত্র শত্রু। স্বাধীনতা লাভ করার পথে তাহারাই আমাদের একমাত্র অন্তরায়। যদিও মানুষের জীবন সংহার করা অন্যায়, তবুও বাধ্য হইয়া বড় বড় সরকারী কর্মচারীর ও ইংরেজদের জীবন সংহার করিতে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছি। মুক্তিপথের যে-কোন বাধা বা অন্তরায় যে-কোন উপায়ে দূর করার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমাদের দলের মহামান্য ও পূজনীয় নেতা মাষ্টারদা অদ্যকার এই সশস্ত্র অভিযানে যোগ দিবার জন্য যখন আমাকে ডাক দিলেন, তখন

আমি নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, এতদিনে আমার বহু প্রত্যাশিত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আমি এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিলাম। এই উন্নত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট নেতৃত্ব যখন আমার মত একটি মেয়েকে এই গুরুভার অর্পণ করেন তখন এতগুলি কর্মঠ ও যোগ্যতর ভাইয়েরা বর্তমান থাকিতে অভিযানে নেতৃত্বের ব্যাপার একজন ভগিনীর উপর কেন ন্যস্ত হইবে, এই বলিয়া আমি আপত্তি জানাইলাম এবং একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে ঐ কাজে যাইতে চাহিলাম।

কিন্তু পরে আমি পূজ্য নেতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলাম।..

আমি মনে করি যে আমি দেশবাসীর নিকট আমার কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও হয়ত আমার প্রিয় দেশবাসীর মধ্যে এমনও অনেক আছেন, যাঁহারা বলিবেন যে--ভারতীয় নারীত্বের উর্ধ্বতন আদর্শে লালিত একটি নারী কি করিয়া নরহত্যার মত এই ভীষণ হিংস্র কাজে লিপ্ত হইল।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না? ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে, রাজপুত রমণীরা অসীম সাহসের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা শত্রুর প্রাণসংহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এইরূপ আরও কত নারীর বীরত্ব গাথায় পূর্ণ। তবে কেন আমরা আজিকার ভারতীয় নারীরা বিদেশীর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে নিজের দেশকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য এই মহান যুদ্ধে যোগদান করিব না? যদি বোনেরা ভাইদের সঙ্গে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, তবে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানে তাহাদের বাধা কি? সশস্ত্র বিদ্রোহে অন্য দেশে বহু নারী যোগদান করিয়াছে, তবে কেন ভারতীয় নারীরা বিপ্লবের এই পন্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিবে?

নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে তাহারা আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। নিজ মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে কোন দুরূহ

বা ভয়াবহ ব্যাপারে ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে তাহারা ইচ্ছুক—ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই আজিকার এই অভিযানের নেত্রীত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি।

আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি যে, আমার দেশের ভগিনীরা আর নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন—এই আশা লইয়াই আমি আজ এই আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।

(স্বাক্ষর) প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং

আগেই সামান্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবীদলে কোন মেয়েকে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে সদস্যপদ দেওয়া হত না। বিপ্লবীদলে মেয়ে বিশেষতঃ কুমারী মেয়ে তখনকার দিনে আসার পথে সামাজিক বাধা ছিল দুস্তর, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মেয়েরা তখনও খুব অল্পই লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে। চট্টগ্রামের মত মফঃস্বল শহরে একটিমাত্র বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। শহরে যারা থাকে, যেমন উকিল, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী ও অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়েরা কিছু কিছু সংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে মাত্র এই স্কুলে পড়ছে। গ্রামের মেয়েদের পড়া তখন প্রাইমারী স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—বড় জোর তখন সামান্য কেউ মধ্য ইংরেজী স্কুলে পড়ছে। এখন চট্টগ্রামের গ্রামে বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে এবং অন্ততঃ পাঁচ ছয়টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। তখন সহ-শিক্ষা মাত্র বহু বিরোধীতার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে (১৯২৬শে শুরু) চলছে। ছেলেমেয়েদের সহজ সামাজিক মেলামেশাও তখন সহনীয় ছিল না।

দূরদর্শী ও স্থিরবুদ্ধি বিপ্লবী-নেতা সূর্য সেন সামাজিক চেতনার এই স্তর সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদলে নারী-সদস্য গ্রহণের সম্মতি দেন নাই।

প্রীতিলতা ১৯২৭ সালে ডাঃ খাস্তগীর বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে। তার খুব নিকট-সম্পর্কিত এক বড় ভাই তখন বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট তরুণ সদস্য এ কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রীতিলতা এই বড় ভাইটির বই-এর ভিতর থেকে তখনকার দিনের বাজেয়াপ্ত বই "ক্ষুদিরাম", "কানাইলাল", "বাঘা যতীন" ইত্যাদি চুরি করে পড়ত। একদিন দাদার কাছে সে ধরা পড়ে গেল, দাদা তাকে প্রথম খুব বকে দেয়, কেন না বলে তার বইপত্র সে ধরবে। তারপর তার আগ্রহ দেখে তাকে সে নিজে রীতিমত ঐ রকম বই গোপনে পড়ার জন্য দিতে থাকে।

একদিন প্রীতিলতা তার দাদাকে বলে, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, কেন আমি পারব না?

দাদা বিপ্লবীনেতার কঠোর নির্দেশমত বলে, তা তোমাকে দিয়ে হবে না, আমরা বিপ্লবীদলে মেয়েদের নিই না।

সে প্রায়ই বলত, ঝাঁসীর রাণীর মত আমিও 'রাণী', আমাকে নিতে হবে দলে, আমি ঠিক পারব।

তার আগ্রহাতিশয্যে একদিন ঐ দাদাটি এই ব্যাপার নিয়ে মাষ্টারদার সঙ্গে আলাপ করে। সব শোনার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বিপ্লবী নেতা তাঁর পূর্ব-সিদ্ধান্ত কিছু পরিবর্তন করে বলেন, মেয়েদের দলে নেওয়া যেতে পারে। তবে তাদের কাজ হবে গোপন বই-পত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা-পয়সা জমা রাখা। আর নিজেদের অলংকারপত্র দরকার মত দলের অর্থ ভাণ্ডারে দান করা।

এই সীমাবদ্ধ সুযোগ নিয়ে সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবীদলে প্রথম নারী সদস্যা হিসাবে প্রীতিলতা ১৯২৭শে স্থান পায়। মাষ্টারদার নির্দেশ থাকে যে বিপ্লবীদের নিজের আপন বোন ও খুব নিকট আত্মীয়া ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিপ্লবীদলে আনার কোন চেষ্টা করা হবে না এবং যার মারফত কোন মেয়ে দলে আসবে তার সঙ্গে ছাড়া বিপ্লবীদলের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা ব্যতীত আর কোন সদস্যের সঙ্গে তার বৈপ্লবিক-দলের গোপন পরিচয় থাকবে না।

প্রীতিলতা ম্যাট্রিক পাশ করার পর ঢাকার ইডেন মেয়ে কলেজে পড়তে যায়। তখন মাসে মাত্র দশ টাকা খরচে মেয়েরা এই কলেজ বোর্ডিং-এ থাকা খাওয়া করতে পারত এবং তার মধ্যে তাদের কলেজের বেতনও হয়ে যেত। কারণ সরকার থেকে অনেক সাহায্য তখন এই কলেজের জন্য দেওয়া হত। তাই প্রীতিলতার পিতা অল্প বেতনের মিউনিসিপ্যাল আপিসের কেরাণী শ্রীজগবন্ধু ওয়াদ্দাদার তাকে ইডেনে আই-এ পড়তে পাঠান।

এই কলেজে পড়ার সময় তখনকার দিনের বিখ্যাত নারী-বিপ্লবী শ্রীযুক্তা লীলা নাগের "দীপালী সংঘের" সঙ্গে প্রীতিলতার যোগাযোগ হয়। প্রীতিলতা এক ছুটিতে গিয়ে বলে যে, সে ঐ সংঘের সদস্যা হয়েছে। তখন এক বিপ্লবীদলের সদস্য বা সদস্যাকে অন্যদলে যেতে দেওয়া হত না। প্রীতিলতা বুঝেছিল, ঐ দলটি যখন কেবল মেয়েদের নিয়েই গঠিত এবং তারাও দেশের মুক্তির জন্য লড়বে, তবে তার ঐ দলে ভর্তি হতে দোষ কি ?

কিন্তু ঐ "দীপালী সংঘ" ছিল তখনকার দিনের ঢাকার বিপ্লবী নেতা ৺অনিল রায় পরিচালিত "শ্রী-সংঘের" মহিলা শাখা।* যখন চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা একথা জানতে পারেন, তিনি বলেন তাতে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ "শ্রী-সংঘ" ও চট্টগ্রামের সূর্য সেন পরিচালিত "যুগান্তর দলের" সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং দুই দলের সঙ্গেই "অনুশীলন দলের" রাজনৈতিক শত্রুতা ছিল।

প্রীতিলতা দলে আসার পর থেকেই তার ঐ বড় ভাইটি তাকে বইপত্র পড়িয়ে, অস্ত্রশস্ত্র গোপনে রাখতে দিয়ে ও তার ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি শিখিয়ে দিয়ে তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

---

* লীলা নাগ, এম, এ, ঢাকার নারী আন্দোলনের অগ্রদূত। তিনি ঢাকায় কয়েকটি মেয়েদের স্কুল ও সমাজ সেবা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী। জীবনে কয়েকবার তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। ১৯৪০-৪১ এ তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী নেতা "অনিল রায়ের" বিবাহ হয়। স্বামী স্ত্রী উভয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত "ফরোয়ার্ড ব্লকে" যোগদান করেন। পূর্ব-বাংলায় তখনকার দিনের নারী আন্দোলনে এই মহিলার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৯৩০শে যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল হয় তখন প্রীতিলতা কলিকাতা বেথুন কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। ১৯২৯শে সে ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ২০৲ টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। তারপর সে তার বাবার অমতে মায়ের সহায়তায় কলিকাতা বেথুনে বি-এ পড়তে যায়। সেখানে সে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং বেথুন কলেজের মেয়েদের ভিতরে এক ছোট গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। মেয়েদের সঙ্গে দরদ ও আন্তরিকতা নিয়ে মিশবার খুব দক্ষতা তার ছিল এবং তার মধুর ব্যবহারে মেয়েরা তাকে খুব আপন মনে করত। বানারসী ঘোষ ষ্ট্রীটের মেয়েদের হোষ্টেলের মেয়েরাও তাকে খুব বেশী ভালবাসত। বিশেষতঃ গভীর রাত্রিতে ঐ হোষ্টেলের ছাদে বসে প্রীতিলতা প্রাণের আবেগে যখন বাঁশী বাজাত তখন মেয়েরা বিমুগ্ধ চিত্তে তার পাশে বসে থাকত। প্রীতিলতার বি-এ-তে অন্যতম বিষয় ছিল "দর্শন" এবং এই বিষয়ে ক্লাসের পরীক্ষায় সে সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করত। এতে সে অনার্সও নিয়েছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ ও কালারপোল সংঘর্ষের পরে সে বৈপ্লবিক কাজের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। তাই বি-এ অনার্স পরীক্ষা সে আর দেয়নি এবং 'ডিসটিনক্‌শান' নিয়ে সে ১৯৩১শে বি-এ পাশ করে।

এখানে বিপ্লবী কল্পনা দত্তের* কথাও একটু বলা দরকার। ১৯২৯শে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জিলা রাজনৈতিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন ও নারী সম্মেলন হয়। শেষোক্ত সম্মেলনের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে কল্পনা দত্তের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। কল্পনা দত্ত ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের তখনকার দিনের খ্যাতনামা ডাক্তার রায় বাহাদুর ৺দুর্গাদাস দত্তের নাতনী। শহরে বেশ বড় বাড়ী, পিতা সাব-রেজিষ্ট্রার, গ্রাম শ্রীপুরেও বেশ বিষয়-সম্পত্তি, প্রীতিলতার পিতার চেয়ে বহু সম্পদশালী পরিবারের এই মেয়েটিও চট্টগ্রাম

---

* বর্তমানে কল্পনা যোশী। ১৯৪৪ এ তদানীন্তন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক পি-সি-যোশীর সঙ্গে কল্পনা দত্তের বিবাহ হয়। এখন কল্পনা যোশী তাঁর স্বামী ও দুই পুত্রসহ ভারতে আছেন।

ডাঃ খাস্তগীর স্কুলের ছাত্রী এবং ১৯২৯শে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করে মাসিক ১৫৲ টাকা করে সে বৃত্তি পেয়েছিল।

অস্ত্রাগার দখলের পরে কলিকাতায় চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে থেকে কাজ করছিল তাদের মধ্যে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র মনোরঞ্জন রায়ের (ক্যাবলা রায়) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে বিভিন্ন ভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে গড়ে তোলার ব্যাপারে এই বিপ্লবীও অনেক সাহায্য করেছিলেন।

যেই বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রীতিলতা ও কল্পনার দলগত গোপন যোগাযোগ ছিল তারা ১৯৩১-শের মধ্যেই পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে জেলে ও আটকখানায় চলে যায়। দেশের জন্য আত্মদানের পরম আগ্রহ নিয়ে এই দুই নারী-বিপ্লবী অনেক কষ্ট করে গোপনে মাষ্টারদা'র সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে। সেজন্য কল্পনা দত্ত কলিকাতায় বেথুন কলেজ থেকে চট্টগ্রাম কলেজে বি-এস-সি ক্লাসে এসে ভর্তি হয়। প্রীতিলতা বি-এ পাশ করে চট্টগ্রাম নন্দনকানন বালিকা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে (বর্তমানে অপর্ণাচরণ উচ্চ-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়) শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

ঝাঁসীর রাণীর দেশপ্রেম চট্টগ্রামের যে "রাণীর" (প্রীতিলতা) তরুণ মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তার প্রভাবে একদিন প্রীতিলতা নিজের অমূল্য জীবন দিয়ে তা বাস্তবে রূপায়িত করে গেল। বিপ্লবী দিনের এই প্রথম নারী শহীদকে আমরা অভিনন্দন জানাই, কারণ জীবনের আদর্শকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে গেছে আমাদেরই পূর্ব-বাংলার এই মহীয়সী নারী। আজ যে নারীরা আমাদের দেশে সমাজের বহু বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে জীবনের সত্য মূল্যকে আদায় করার জন্য নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের যাত্রাপথে প্রীতিলতার এই আত্মদান নতুন আলোকপাত করেছে।

প্রীতিলতা যেদিন পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব নিয়ে যায়, নারী হয়ে নর-হত্যার মত কাজে কেন সে যাচ্ছে, তার কারণ তার নিজের বিবৃতিতে সে বলতে চেষ্টা করেছে। ব্যক্তিগত বা এই রকম ভীতিপ্রদ ও সশস্ত্র সংঘর্ষের মারফত গুটিকয়েক দেশপ্রেমে উন্মত্ত

তরুণ-তরুণীর এভাবে আত্মদান করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের দেশকে সেদিন হয়ত মুক্ত করতে পারিনি। কিন্তু ১৯৩০—৩৫ এর মধ্যে বাংলার বিপ্লবীদের যে আন্দোলন, তা ১৯৩৫-এর ভারত শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে যে সব কারণে বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল, ঐ আন্দোলন তার মধ্যে যে অন্যতম এ বিষয়ে আজ অনেকেই নিঃসন্দেহ। সেই সময় মেয়ে বিপ্লবী হিসাবে প্রীতিলতার আত্মদান দেশের মেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেমের ও সাহসিকতার এক নতুন আদর্শ স্থষ্টি করেছিল।

পাহাড়তলী ঘটনার পর তখনকার বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র, অধুনা লুপ্ত কলিকাতার "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় ঐ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে, প্রীতিলতার অসীম সাহসিকতার প্রশংসা করেছিল। পরে অবশ্য ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন আপত্তি করায়, ঐ পত্রিকা প্রীতিলতার প্রতি প্রশংসাসূচক অনেকগুলি বিশেষণ তার পরবর্তী সংখ্যায় প্রত্যাহার করেছিল।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পর পুলিশের আর একদফা অত্যাচার চট্টগ্রামের বুকের উপর দিয়ে চলে। সামান্যতম সন্দেহ-ভাজন ছাত্র ও যুবককে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ধরা হয় এবং গোয়েন্দা আপিসে নিয়ে অনেকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। কিন্তু বহু জিজ্ঞাসাবাদ, অর্থলোভ আর নির্যাতন নিপীড়নের পরও পুলিশ কোন মতে জানতে পারেনা যে শহীদ প্রীতিলতার সঙ্গে ঐদিন আর কে কে ছিল। তাই অনেক চেষ্টা করেও পাহাড়তলী ঘটনাকে উপলক্ষ করে আর কোন মামলাও করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্র ও যুবককে বহুদিন বিচারাধীন রেখে প্রমাণাভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

পাহাড়তলী ক্লাবে বিপ্লবীদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ নর-নারীর হতাহতের সংখ্যা তখনকার সরকার কোনদিন প্রকাশ করেনি। কেবল একজন ইংরেজ মহিলা বোমার আঘাতে ভয়ানক আহত হয়ে পরে মারা যায় বলে সরকার তখন স্বীকার করে। বেসরকারী সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মোট ৫৩ জন ইংরেজ নর-নারী ঐ রাত্রে হতাহত হয়েছিল।

আঠার

এর কিছুদিন পর "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলার রায় বাহির হয়। এই মামলা যখন প্রথম শুরু হয় তখন অস্ত্রাগার দখলের পর ধৃত বিপ্লবীদের মধ্য থেকে পুলিশ বাছাই করে ২৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে। পরে বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ আত্মসমর্পণ করলে তিনি অন্যতম আসামী হন এবং চন্দননগর সংঘর্ষের পরে বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল এবং তরুণ বিপ্লবী আনন্দ গুপ্তকে প্রথম "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলায় যুক্ত করা হয়।

অস্ত্রাগার দখলের পরে এই মামলায় যেসব বিপ্লবীদের অভিযুক্ত করা হয়, তাদের পরিবারবর্গের উপর পুলিশ ভয়ানক নির্যাতন ও জুলুম চালায়। যেসব পরিবারের কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি পলাতক ছিল, সেসব পরিবারের উপরই নির্যাতন হয়েছিল খুব বেশী। পলাতক আসামী খোঁজ করার নাম করে দিনে বা গভীর রাত্রে বর্গীর হাঙ্গামার মত পুলিশ ও গোয়েন্দারা জোর করে ঘরে ঢুকে পলাতক ব্যক্তির পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র সকলের উপর জুলুম করা, বাড়ীর কুমারী যুবতীদের পর্যন্ত শালীনতা বর্জিত তল্লাসী করা, লাঠি ও বন্দুকের কুঁদা দিয়ে আঘাত করা এবং অশ্লীল গালিগালাজ করা এসব চলত।

বিপ্লবী অনন্ত সিংহের পিতা গোলাপ সিংহ চট্টগ্রাম শহরের তখনকার দিনের নন্দনকানন এলাকার (তামাকুমণ্ডীর) বিশেষ খ্যাতনামা লোক ছিলেন। পুলিশ তাঁর বিপ্লবী পুত্রকে না পেয়ে এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে রেখে দেয়। অনন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনন্দলাল সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বড়বোন শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী সিংহকে পুলিশ যথেষ্ট হয়রানি করে। কালারপোলের সংঘর্ষে শহীদ রজত সেনের পিতা জেলা জর্জকোর্টের উকিল শ্রীরঞ্জন সেনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে রেখেছিল। কালারপোলের অন্যতম শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত এবং চন্দননগর সংঘর্ষে ধৃত তাঁর ছোট ভাই আনন্দ গুপ্তের পিতা রুগ্ন ও বৃদ্ধ যোগেন্দ্রনাথ

গুপ্তকেও পুলিশ তাঁর দুই বিপ্লবী ছেলের পিতা হওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করে এবং চট্টগ্রাম প্যারেডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় ব্রাহ্মমন্দিরের পিছনে টিলার উপর তাদের যেই বাসা আছে, তাতে বহুবার তল্লাসী করে এবং আনন্দ গুপ্তের মা, অবিবাহিতা দিদি ইত্যাদির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। জালালাবাদ শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের ছোটভাই সুখেন্দু দস্তিদার প্রথম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী এবং অন্য দুই ভাই মামলা শুরু হওয়ার পরে প্রায় এক বছর পর্যন্ত পলাতক ছিল। এক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ঐ দুইজনকে পুলিশের হাতে হাজির করে দিতে না পারলে, তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব নীলাম করা হবে বলে সরকার থেকে ঐ পরিবারের অভিভাবকদের উপর নোটিশ দেওয়া হয়। ঐ ধরনের নোটিশ অবশ্য অন্যান্য পলাতক বিপ্লবীদের পরিবারের উপরও দেওয়া হয়েছিল।

এই মামলা পরিচালনার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় নিম্নলিখিত বিচারকদের নিয়েঃ

মিঃ ইউনি—সভাপতি (তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা জজ)

রায় বাহাদুর দুর্গাদাস ঘোষ

রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৩—১০—৩০ হইতে)

খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল হাই

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি (রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্র), ৩০২ (নরহত্যা), ৩৯৫ (ডাকাতি), ৩৯৬ (খুনসহ ডাকাতি) রেলওয়ে আইনের ১২৫ ধারা, অস্ত্র আইনের ১৯ এবং বিস্ফোরক আইনের ৪বি ধারা, টেলিগ্রাফ আইনের ২৫ ধারা মতে ঐ ৩০ জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হয়। গ্রেপ্তারের পর কোন কোন তরুণ বিপ্লবী অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে স্বীকারোক্তি করেছিল। পরে বিপ্লবীনেতা অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল ইত্যাদি চট্টগ্রাম জেলে আসার পর তারা সকলেই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। সরকার যাদের রাজসাক্ষী বলে পূর্বে ঘোষণা করেছিল, তাদের সকলকে এই মামলায় আসামী শ্রেণীভুক্ত করে নেয়। সাময়িক দুর্বলতার জন্য যারা মামলার

প্রথমদিকে স্বীকারোক্তি করেছিল, তারাই পরে মনের জোর ফিরে পেয়েছিল এবং স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের ফলে যে তাদের কম সাজা বা খালাস পাওয়ার সব সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ জেনে-শুনেই তারা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের দেশপ্রেমের পুনরুজ্জীবনের এই দিকটি লক্ষণীয়।

ট্রাইবুন্যালের বিচারের সময় সরকার পক্ষ থেকে উকিল ছিলেন রায় নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বাহাদুর, চট্টগ্রামের তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটার খান বাহাদুর আবদুস সত্তার ইত্যাদি।

বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন প্রথম কিছুদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ বিখ্যাত নেতা ও ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু, পরে ব্যারিষ্টার শ্রীসন্তোষ কুমার বসু, শ্রীশ কুমার বসু, চট্টগ্রাম জজ কোর্টের উকিল শ্রীবিনোদ সেন ইত্যাদি।

বিচারকরা এই মামলায় অন্ততপক্ষে তিনজন নেতা—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলকে যে প্রাণদণ্ড দেবেন, এ সম্পর্কে দেশের কারও সন্দেহ ছিল না। সেজন্য যেদিন রায় দেওয়ার তারিখ ছিল, সেদিন বিপ্লবীদের নিকটাত্মীয় এবং অন্যান্য সহানুভূতিশীল বহু দেশবাসী চট্টগ্রাম কোর্টে হাজির ছিলেন। রায় প্রকাশ হলে দেখা যায়, মৃত্যুদণ্ড বিচারকরা কাউকে দেন নাই। নিম্নোক্ত বিপ্লবীদের ২৫ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তরের আদেশ হয়:—

(১) গণেশ ঘোষ (২) অনন্ত সিংহ (৩) লোকনাথ বল (৪) ফণীন্দ্র নন্দী (৫) আনন্দ গুপ্ত (৬) লালমোহন সেন (৭) সহায়রাম দাস (৮) সুবোধ চৌধুরী (৯) সুখেন্দু দস্তিদার (১০) ফকির সেন (১১) সুবোধ রায় (১২) রণধীর দাসগুপ্ত।

ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিরা শেষোক্ত চারজনের কম বয়স বিবেচনা করে সরকারের কাছে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য সুপারিশ করেন।

বিপ্লবী অনন্তলাল সিংহের বড় ভাই নন্দলাল সিংহ পাহাড়তলী রেলওয়ে কারখানায় কাজ করতেন। ১৮ই এপ্রিলের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রয়োজনে কিছু যন্ত্রপাতি তিনি যে রেলওয়ে কারখানা থেকে যোগাড় করে এনেছিলেন মামলায় তা প্রমাণিত হয়। সেজন্য তাঁকে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট ডাক্তারের পুত্র, অনিল বন্ধু দাস বিচারকদের মতে নাবালক বলে সাব্যস্ত হয়। সে তাদের বাড়ী থেকে বন্দুক ও টাকা পয়সা চুরি করে এনে বিপ্লবীদলে দিয়েছিল এবং তার জন্য চুরির অপরাধে ৩ বৎসরের জন্যে তাকে অল্পবয়স্ক কয়েদীদের (বোরস্টাল স্কুলে) সংশোধনাগারে রাখার আদেশ হয়।

নিম্নোক্ত বিপ্লবীরা ট্রাইবুন্যালের মতে নির্দোষ বলে খালাস পেয়েছিলেন কিন্তু সরকার তাদের সকলকে তখনকার দিনের বিনাবিচারে আটক করার আইনে, 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট'-এ বিভিন্ন আটকখানায় বন্দী করে রেখেছিল :

(১) নিতাইপদ ঘোষ, (২) শান্তি নাগ, (৩) শ্রীপতি চৌধুরী, (৪) অশ্বিনী চৌধুরী, (৫) সুকুমার ভৌমিক, (৬) সুবোধ বিশ্বাস, (৭) ননীগোপাল দেব, (৮) অনিল ঘোষ, (৯) মধুসূদন গুহ, (১০) সুবোধ মিত্র, (১১) সৌরীন দত্ত চৌধুরী, (১১) প্রবোধ বল, (১৩) হেরম্ব বল, (১৪) বিজয় সেন, (১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য, (১৬) ধীরেন্দ্র দস্তিদার।

প্রথম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা শুরু হওয়ার পর চক্রশালা গ্রামে (পটিয়া থানা) বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ধৃত হন বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী* কলিকাতা থেকে পলাতক অবস্থায় বিপ্লবী হেমেন্দু দস্তিদার এবং অন্যত্র ধরা পড়েন বিপ্লবী সরোজ গুহ।

---

* অস্ত্রাগার দখল ও তৎপরবর্তী জালালাবাদ যুদ্ধের অন্যতম বিপ্লবী নেতা ১৬ বছর কারাদণ্ড ভোগের পর ১৯৪৬ এ তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী কর্তৃক মুক্তি পান। তারপর ১৯৫২-৫৬ পর্যন্ত তিনি পশ্চিম বাংলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬২-র প্রথম ভাগে তিনি কলিকাতায় এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।

সরকার এই তিন জনকে বিচার করার জন্য যে বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে, তাতে ছিলেন:

(১) মিঃ এ, ডি, উইলিয়ামস্—জেলা জর্জ; চট্টগ্রাম

(২) মিঃ নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়—অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

(৩) মিঃ এ, এফ, এম, রহমান—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

এই তিনজনের বিরুদ্ধে প্রধান ধারা ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা)। এর মধ্যে বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী সম্পর্কে ট্রাইবুন্যালের অন্যতম সদস্য মিঃ রহমান রায়ে বলেন যে, ইনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের আয়োজনে যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সাক্ষ্য প্রমাণে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি বলে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু অন্য দুইজন সদস্য তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত দেন বলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

বিপ্লবী সরোজকান্তি গুহ সম্পর্কে বিচারকরা বলেন যে, তিনি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি তবে অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় আসামী বিপ্লবী হেমেন্দু দস্তিদারের এক ডাকনাম ছিল এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশ তল্লাসীতে ঐ সংঘর্ষে যোগদানকারীদের যে তালিকা পাওয়া যায়, সেই তালিকায়ও ঐ ডাকনাম ছিল। প্রধানতঃ ঐ কারণেই (কারণ ঐ একই ডাকনাম অন্য অনেকের হতে পারে) সন্দেহের অবকাশে হেমেন্দু দস্তিদারকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিনাবিচারে আটক করা হয় এবং অল্পদিন পরই তাকে আজমার মারবারে দেউলী আটকখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ধৃত হওয়ার পর পুলিশ তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করে। ফলে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হাইকোর্টে আপীল করার ফলে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাঁর প্রাণদণ্ড মওকুব হয় এবং তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই অন্যান্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকার তাঁকে আন্দামান দ্বীপের 'সেলুলার জেলে' (প্রতি কয়েদীর জন্য এক একটি আলাদা 'সেল' অথবা 'কুঠরী' ঐ জেলে ছিল বলে ঐ জেলের নাম 'সেলুলার জেল' ছিল) পাঠানো হয়নি।

উনিশ

পর পর দু'টি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় যখন প্রকাশ হ'ল এবং আলীপুর জেলে বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী এবং তার পরে অনেক বিপ্লবীর যখন দীপান্তর ও বহু বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়—তখনও দলের প্রধান নেতা সূর্য সেন চট্টগ্রামেই আত্মগোপন করে আছেন। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পর ঐ রকম বড় কাজের পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তাঁর দলের বড় নেতা সবাই চলে গেছেন তাঁকে ছেড়ে। ধলঘাটে শহীদ হয়েছেন বিপ্লবীনেতা নির্মল সেন, আর তিন প্রধানের অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীও তখন জেলে। তার পরবর্তী স্তরের প্রধান তরুণ বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বল—তাঁরাও জেলে কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তাঁদের কারও যে ফাঁসীর হুকুম হয়নি এজন্য মাষ্টারদা সুখীই হয়েছেন।

কিন্তু যখন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর সবাই বয়সে, অভিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিতে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট, বড় সব নেতাকে পুলিশ যখন বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছে তখন তাদের সব শক্তি তারা দলের প্রধান নেতাকে ধরবার জন্য নিয়োগ করল। তাঁর গ্রেফতারের জন্য অস্ত্রাগার দখলের পর যে ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত ছিল, তার পরিমাণ ক্রমে বাড়ানো হতে থাকল। পুলিশ গেজেটে তাঁর খুব ভালো একটি ফটো ছাপা হল* এবং তাঁকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দেওয়া বা তাঁকে ধরবার জন্য ঠিকমত খোঁজ-খবর দেওয়ার জন্য ৫০০০ থেকে ৭৫০০ তা বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা এবং সর্বশেষ সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা করা হল।

---

* তখন বিপ্লবী দলের অন্যতম অনুশাসন ছিল ফটো না তোলা কারণ ফটো পুলিশ পেয়ে গেলে আত্মগোপন করার প্রয়োজন হলে তা করা কঠিন হবে। পুলিশ তাই চুরি করে বিপ্লবীদের ফটো তুলত এবং পুলিশ গেজেটে প্রকাশিত ফটোটি ঐভাবে তোলা। এই বইতে সূর্য সেনের যে ছবি ছাপানো হল, তা তখনকার দিনের কোন বিপ্লবী পুলিশের কাছ থেকেই যোগাড় করে এবং যে ফটো পুলিশ গেজেটে ছাপা হত, এই ছবি সেই ফটোরই অনুকৃতি।

এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে সারা ভারতে। তিনি লবণাম্বুবেষ্টিত ভারতে স্বাধীনভাবে লবণ প্রস্তুতের বিরুদ্ধে ইংরেজের যে আইন ছিল, তা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করেন। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী খুব উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ঐ আইন অমান্য আন্দোলনে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে গণ বিক্ষোভের প্রকাশ দেখে গান্ধীজী যেমন তাতে "হিংসা"র আবির্ভাব এবং তার ফলে তাঁর অহিংসনীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা ক'রে সেই আন্দোলনে ইতি টেনেছিলেন, নয় দশ বৎসর পরে তিনিই আবার এই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। তাতে মজুর, চাষী, ছাত্র-ছাত্রী আর গরীব সাধারণ মানুষ দলে দলে যোগ দিচ্ছে। পুলিশের লাঠি, বেয়নেট আর গুলী দেশপ্রেমের প্রাচীরে ব্যাহত হয়ে ফিরে আসছে—জেলখানা গুলিতে স্থান নেই। এবারও গান্ধীজীর মনে হল, বাড়াবাড়ি হচ্ছে—অহিংসার মূলনীতিকে অতিক্রম করা হচ্ছে। এবারও তাঁর অভিযোগ—আন্দোলনে "হিংসার" আবির্ভাব হচ্ছে—তিনি নিজে আটক হয়েছেন, কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু, সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীজহরলাল নেহরু ইত্যাদি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাই তাঁরই ইঙ্গিতে কংগ্রেসের তরফ থেকে যে দ্বিতীয় গণ-আন্দোলনের আহ্বানে সারা ভারত এগিয়ে এসেছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে—সেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। গণ-আন্দোলন যখনই দুর্বল হত, বিদেশী সরকারের জুলুমবাজীও তখন বেড়ে উঠত।

বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন তখনও গ্রেপ্তার না হওয়ায় তিনি চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলিম জনসাধারণের কাছে এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষে পরিণত হয়েছেন। পলাতক অবস্থায় তিনি পুলিশের বেড়াজাল থেকে কিভাবে অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে রক্ষা করেছেন, সে সম্পর্কে বহু উপাখ্যান তখন মুখে মুখে, কানে কানে ঘুরছে। অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের পাতলা সামান্য টাকপড়া মানুষটি, চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবু যাঁর নির্দেশে এত বড় বড় সংঘর্ষ ও সংগ্রাম ঘটেছে সেই বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের "ইয়া বড় গোঁফ," 'কত বড় পলোয়ান,' 'ইচ্ছা করলেই বাইশ হাত লাফ দিতে পারেন,' 'চট করে চেহারা বদলে ফেলতে পারেন'—এই ধরনের কত কথা তাঁর সম্পর্কে চালু হয়েছে।

ফলে যেসব ছাত্র অস্ত্রাগার দখলের এই চার বছর পরে একটু বড় হয়ে উঠেছে, মাষ্টারদাকে একটুখানি দেখবার জন্য তাদের আগ্রহের সীমা নেই। পুলিশের অত্যাচারকে উপেক্ষা ক'রে, গোপনে এই বিস্ময়কর বিপ্লবী নেতাকে দেখবার অদম্য ইচ্ছা ছাত্রদের।

পুলিশও ক্রমে খবর পেয়ে গেছে যে—কিশোর, যুবক ও ছাত্ররা বিপ্লবী দলের খুব জরুরী ও গোপনীয় খবর আনা-নেওয়া এবং ঘোরতর অন্ধকার বা বৃষ্টির কঠিন দুর্যোগে বড় বড় পলাতক বিপ্লবী নেতাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করছে ও গোপন চিঠি আনা-নেওয়ার কাজ করছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও মিলিটারী ইণ্টেলিজেন্স অফিসারের (এম-আই-ও) উদ্যোগে জেলায় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি সরকারী পদবী লোভী, বৃটিশ পদলেহী, মেরুদণ্ডহীন ও কাপুরুষ কিছু উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি লোককে ঐ প্রতিষ্ঠানে সদস্য করা হয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। ইংলণ্ডের প্রধান গোয়েন্দা-বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং কেবল বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত উপরোক্ত এম-আই-ও মাঝে মাঝে কয়েকটি নির্দেশ দেন এবং উল্লিখিত রাজভক্ত প্রজারা তা পালন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

এই সময় জেলার প্রায় সব উচচ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরোক্ষভাবে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য বাধ্য করা হয়। বার তের বছরের ছাত্র থেকে ষোল আঠার বছরের ছাত্রদের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট মতে তিনভাগে ভাগ করা হয়। তাদের প্রত্যেককে তিন রকম পরিচয় পত্র দেওয়া হয়:

১. লাল পরিচয় পত্র—যারা খুব সন্দেহভাজন, যাদের সঙ্গে বিপ্লবীদলের যোগ আছে বলে বিশেষ সন্দেহ।

২. সবুজ পরিচয় পত্র—যারা কম সন্দেহভাজন, তবে বিপ্লবী যোগাযোগ কিছু কিছু আছে বলে সন্দেহ।

৩. সাদা পরিচয় পত্র— যারা সুশীল ও সুবোধ বালক অর্থাৎ যাদের মারফত গোয়েন্দা পুলিশ খবর সংগ্রহ করতে পারবে বলে মনে করে।

হুকুম দেওয়া হয়, যাদের কার্ড দেওয়া হবে, সব সময় ঐ কার্ড তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে। যখনই কোন পুলিশ, সরকারী কর্মচারী অথবা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য ঐ কার্ড দেখতে চাইবেন, তা অবশ্যই দেখাতে হবে। চট্টগ্রামের প্রায় একুশ হাজার ছাত্রকে ঐ কার্ড বহন করতে হত। স্কুলের শিক্ষকগণকে নিজ নিজ স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে এক এক দল করতে হয়, তার নাম দেওয়া হয় "হাউজ" (ঘর)। "হাউজ" গুলির নাম বিভিন্ন বিশিষ্ট প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত করে ঐ পবিত্র নামগুলিকে কলঙ্কিত করার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন "হাউজ" এর নাম হয়, যেমন "মোহসীন হাউজ", "আশুতোষ হাউজ", "বিদ্যাসাগর হাউজ" ইত্যাদি।

প্রত্যেক শিক্ষককে এই এক এক "হাউজের" দায়িত্ব নিতে হত। এতে যে ছাত্রগুলি থাকবে তাদের স্কুলের নির্ধারিত সময়ে কেবল পাঠ্য-পুস্তক পড়ালেই ঐ শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হবে না। তাঁকে স্কুলে ও স্কুলের বাইরে প্রত্যেক ছাত্র কার সঙ্গে মিশছে, কি করছে সব লক্ষ্য করতে হবে এবং যদি কোন ছাত্র কোন সন্দেহভাজন (বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত) ব্যক্তির, ছাত্রের বা যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করছে বলে শিক্ষক টের পেয়ে যান তখনই তা তাঁকে ঐ বিষয়ে চট্টগ্রামে তখন বিশেষভাবে নিযুক্ত সামরিক গোয়েন্দা কর্মচারী (এম-আই-ও) কে জানাতে হবে। কোন শিক্ষক এই কাজে অবহেলা করলে তাঁর চাকুরী যে যাবে তার কোন সন্দেহ ত নেই-ই এমন কি গোয়েন্দাদের গ্রাম্য "ক্যাম্পে" বা সদরের গোপন নির্যাতনের কক্ষে হয়ত একদিন যেতে হবে। উপরোক্ত ইংরেজ গোয়েন্দা কর্মচারী প্রায়ই বিভিন্ন স্কুলের এইসব "হাউজ সিষ্টেম" (ঘর-ব্যবস্থা) পরিদর্শন ও পরীক্ষণ করত এবং ছাত্রদের ধমক দিয়ে আসত যে, পলাতক বিপ্লবীদের কোন খবর জেনেও যদি তারা না বলে, তা'হলে তাদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে। অনেক কিশোর ছাত্রকে ঐ এম-আই-ও অকথ্য নির্যাতন করছে। এই সব ব্যবস্থার ফলে সারা জেলায় ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অভিভাবকদের মধ্যে—এক কথায় সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আতংকের অবস্থা সৃষ্টি বিদেশী সরকার করেছিল।

গণ আন্দোলনের অভাব এবং সরকারী জুলুম মিলে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তখন ভাঁটার ভাব। অন্যদিকে বিপ্লবীদলের প্রধান

প্রধান নেতা সংঘর্ষে নিহত, মামলায় অভিযুক্ত ও বিনাবিচারে আটক হয়ে থাকাতে, বিপ্লবীদলের ৩য় ও ৪র্থ স্তরের যে সব সদস্য পলাতক ছিল, তাদের মধ্যেও নেতৃত্বের লোভ দেখা দেয়। এমনও হয়েছে যে, সর্বজনপূজ্য সবাধিনায়ক সূর্য সেনকে পর্যন্ত তাঁর অনুবর্তী কোন ছোট নেতা তাঁর নিজের কোন কাজে বা মতে সমর্থন না পেয়ে তাঁর অবাধ্যতা করার চেষ্টা করেছে, তাঁর সঙ্গে অসংগত ব্যবহার করেছে।

বাইরে ভিতরে যখন এই অবস্থা, তখন বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন গৈরলা গ্রামে শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে গোপনে আছেন। গরীব এই বিধবা পনর হাজার টাকার লোভ আর পুলিশের চরম অত্যাচারের ভয়কে জয় করেছিলেন। সারা দেশের প্রিয় এই প্রধান বিপ্লবী নেতাকে তিনি সাহস করে আশ্রয় দিয়েছেন। কলিকাতার অত্যন্ত অভিজ্ঞ বড় বড় গোয়েন্দা অফিসার নিয়োগ, ইংরেজ এবং স্থানীয় গোয়েন্দাদের বহু ষড়যন্ত্র, গোপনে গোপনে মোটা টাকা দেওয়া, বহু অকথ্য অত্যাচার—কিছুতেই যখন প্রধান নেতা সূর্য সেনকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না, তখন সরকার চট্টগ্রামবাসী এক মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র দারোগাকে বর্মা থেকে আমদানী করে। ঐ দারোগা পটিয়া থানার বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের লোক এবং বিপ্লবীদলের পটিয়া, বোয়ালখালী ও রাউজান ইত্যাদি থানার মধ্যবিত্ত হিন্দু বৈদ্যকায়স্থ অনেক পরিবারের লোকজনকে ভালভাবে চিনত। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন এই কয় থানার মধ্যেই আছেন বলে গভীর সন্দেহ প্রাদেশিক থেকে আরম্ভ করে জেলা গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের ছিল। তাই পূর্বোক্ত ঐ পুলিশ কর্মচারীকে সরকার চট্টগ্রাম জেলার গোয়েন্দা বিভাগে নিযুক্ত করে আনে, বিশেষ করে তার সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিচিত ব্যবহার করে সে যাতে সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে।

১৯৩৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারী এই গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে পলাতকা বিপ্লবী কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত আর সুশীল দাসগুপ্ত। ঐ বৈঠকে তৎকালীন অন্যতম প্রধান পলাতক বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদারেরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি এসে পৌঁছতে পারেন নাই।

তরুণ বিপ্লবী ব্রজেন সেন ঐ গ্রামেরই অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নেত্র সেন। ব্রজেন সেন যে তার প্রতিবেশী বিশ্বাস বাড়ীতে যাতায়াত করে তা বড় ভাই নেত্র সেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিল। তার ছোট ভাই যে সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে তাও তিনি জানতেন, কিছুদিন ভাল করে লক্ষ্য রাখার পর পনরহাজার টাকার লোভে নেত্র সেন পুলিশকে খবর দেয় যে, বিশ্বাস বাড়ীতে খুব সম্ভবতঃ সূর্য সেন আত্মগোপন করে আছেন।

উপরোক্ত তারিখে একজন ইংরেজ ক্যাপটেন অনেক সশস্ত্র সিপাহী নিয়ে ঐ বিশ্বাস বাড়ী রাতের অন্ধকারে ঘিরে ফেলে। পূর্বোক্ত মদ্যপায়ী চটগ্রামবাসী গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার এবং আরও বেশ কিছু গোয়েন্দা পুলিশ সেই সঙ্গে উপস্থিত হয়। অতীতেও কয়েকবার সূর্য সেন এইভাবে সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্বেও উপস্থিত বুদ্ধি, তৎপরতা ও সাহসের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। এইদিনও তিনি পলায়ন সম্ভব হলে তা করার জন্য তাঁর সাথীদের নির্দেশ দিলেন। বেষ্টনকারী বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য পলায়ন পথের বিপরীত দিকে পর পর দুইবার গুলীর আওয়াজ করার পর, সত্যই সেই ফাঁদে বেশীর ভাগ পুলিশ পা দেয়। এই সুযোগে শান্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাশগুপ্ত একদিকে পালিয়ে যেতে পারেন। অন্য পথে কল্পনা দত্ত ও মণি দত্ত এগিয়ে গিয়ে এক পুকুরের মধ্যে নেমে কিছুক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে এবং সাফল্যের সঙ্গে চলে যেতে পারে। মাষ্টারদা তাঁর অতি পরিচিত এণ্ডি-চাদর খানা মুড়ি দিয়ে গুলীভরা রিভলভার নিয়ে পুলিশের পাহারা ও গুলী বর্ষণের মধ্যে ঠিকমত অনেক দূর এগিয়ে আসতে পারেন। তিনি অন্ধকারে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। খুব চেষ্টা করেও তিনি কোন পাহারারত পুলিশ দেখতে পেলেন না। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এক বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল একজন সশস্ত্র সিপাহী। তার উপর কড়া হুকুম ছিল, তার সামনে দিয়ে যে কোন লোক যাক, তাকে ধরে ফেলতে হবে। ঐ গাছের পাশ দিয়ে গেলেই গ্রাম্য পায়ে চলা এক ছোট পথ, ঐ পথে উঠলেই মাষ্টারদা নিরাপদ।

হঠাৎ অন্ধকারে লুকানো ঐ একটি মাত্র সিপাহী কোন কথা না বলে, পিছন থেকে মাষ্টারদাকে এমন ভাবে দু'হাতের উপর দিয়ে জাপ্‌টে

ধরে ফেলল যে, স্বভাবতঃ কৃশ এই বিপ্লবী নেতা খুব চেষ্টা করেও তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। তাঁর কোমরে বারটি গুলীর থলি, ছয়ঘরা ভাল রিভলভার--এসব কোন কাজে এল না। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এই অন্যতম খ্যাতনামা নেতা এইভাবে শেষ পর্যন্ত দেশদ্রোহী নেত্রসেনের জন্য ধরা পড়ে গেলেন।

যেই সিপাহী তাঁকে ধরেছিল, তিনিই যে সেই বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন তা সে বুঝতেই পারেনি। কারণ তাঁর সম্পর্কে এত কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল যে, এমন শান্ত চেহারার রোগা লোকটি কখনও সূর্য সেন হতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি। কেবল উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালনের জন্যেই সে তার পাশ দিয়ে পলায়নপর লোকটিকে ধরেছে। অবশ্য মাষ্টারদা তার হাত থেকে ছুটবার জন্য কিছু ভান করেন এবং ভয়ানক অসুস্থ কোন রোগীর জন্য তিনি ডাক্তার বাড়ী যাচ্ছেন, এই কথা ঐ সিপাহীকে বলেন, যতদূর খবর পাওয়া যায়, ঐ সিপাহীটি ছিল গুর্খা এবং অত্যন্ত একরোখাভাবে কর্তব্য পরায়ণ। সে বলে, বড় সাহেবের কাছে তাঁকে সে নিয়ে যাবেই এবং তখন তিনি ইচ্ছা করলে তাঁকে ডাক্তার বাড়ী যেতে দিতে পারেন।

'বড় সাহেবের' কাছে অর্থাৎ গোয়েন্দা ও মিলিটারী কর্মচারীদের সামনে নিয়ে গেলে যে তিনি আর মুক্তি পাবেন না এটা তিনি জানতেন। কিন্তু সিপাহীর শক্ত আলিঙ্গন থেকে তাঁর মুক্ত হবার আর কোন উপায় ছিলনা।

অন্যদিকে ইংরেজ সামরিক কর্মচারী এবং পূর্বোক্ত চট্টগ্রামী গোয়েন্দা ইনস্‌পেকটার ও সিপাহীরা কোন পলাতক বিপ্লবীকে না পেয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন সেই সিপাহী চাদর গায়ে একটি লোককে ধরে তাদের সামনে হাজির করল। বলল, এই লোকটি বাড়ীর অনেক পিছন দিক থেকে যাচ্ছিল এবং আদেশমত সে তাকে ধরে এনেছে। লোকটি ডাক্তার বাড়ী যাচ্ছিল, একথাও সিপাহীটি জানাতে ভুল করল না।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেদিকে সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মচারীটি তাকাল। সূর্য সেনের মত বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সহজে সিপাহীর

করলে পড়বে তা তাদের ধারণাতেই আসে না। ঐ প্রধান বিপ্লবীকে অক্ষত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা অসম্ভব বলেই তারা মনে করত। তখনও ঐ বাড়ীর উঠানে অন্ধকার, ভোরের সামান্য বাকী। গোয়েন্দা কর্মচারীটি ধৃত বন্দীর মুখের উপর টর্চের আলো ফেলতেই সে অবাক বিস্ময় ও আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল—"সূর্য সেন", "সূর্য সেন"।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সব কর্মচারী ও সিপাহী তাদের এতদিনের আশা পূরণ হওয়ায় তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল, একজন কর্মচারী তার কোমর থেকে রিভলভার আর গুলীর থলি নিয়ে ফেলল। তাঁর সারা শরীর খুব ভাল করে তল্লাসী করা হল, কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না। তাঁকে আনার একটু পর দেশদ্রোহী সংবাদদাতার ছোটভাই ব্রজেন সেনও অন্য একটি সিপাহীর হাতে ধরা পড়ে যান। এই দু'জনকে ধরার পর শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ী আবার খানা-তল্লাসী করা হয়। এবার পুলিশ বাড়ীর ভিতরে মেজের উপর একটি বিছানার ধারে দুই তিনটি বই এবং সূর্য সেনের নিজের হাতে লেখা একটি অর্ধসমাপ্ত খাতা পায়। তার উপরে নাম লেখা "বিজয়া"। পরে দেখা যায় এই খাতাটিকে এই বিপ্লবী নেতা তাঁর আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। বইগুলির মধ্যে ছিল রুশ-বিপ্লবী ট্রট্স্কী রচিত—"রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস"। পরে সূর্য সেনের মামলায় এই বইটি ও "বিজয়া"র উল্লেখ হয়—সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনকে কড়া পাহারায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করে পটিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পথে পথে খবর রটে যে, জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ধরা পড়েছেন। দলে দলে নর-নারী এই বিপ্লবী নেতাকে দেখার জন্য পথের ধারে দাঁড়ায়। পটিয়া থানায় নিয়ে গেলে থানার প্রাঙ্গণ শত শত হিন্দু-মুসলিম ঘিরে ফেলে। সেই সব লোকের মধ্যে মন্তব্য শোনা যায়, এই নাকি 'চাটগাঁর রাজা'? আশে পাশের গ্রাম থেকে কেবল সূর্য সেনকে একটুখানি চোখে দেখার জন্য লোক এসে থানার কাছে, পথের উপর জমা হতে থাকে।

তারপর সশস্ত্র পাহারায় রেলে করে সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনকে শহরে আনা হয়। রেলগাড়ী যখন চট্টগ্রাম শহরের পূর্ববর্তী ষ্টেশন

ষোলশহর জংশনে থামে তখন জনৈক ইংরেজ সামরিক কর্মচারী ঐ গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞাসা করে, "চট্টগ্রামের সিংহ কোথায়" (Where is the lion of Chittagong)? পাহারায় রত সিপাহীরা দেখিয়ে দেয় শৃঙ্খলিত বিপ্লবী নেতাকে। কাপুরুষ ইংরেজটি তখন গিয়ে বন্দী সূর্য সেনের মুখে একটি প্রচণ্ড ঘুষি দেয়। তাঁর নাকমুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে—প্রশান্ত দৃষ্টিতে তিনি ঐ দিকে তাকিয়ে থাকেন। ১৯৩০-এর আঠারই এপ্রিল থেকে ১৯৩২-এর ২৩শে সেপ্টেম্বরের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ পর্যন্ত বেশ কিছু ইংরেজকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল এবং অন্য ইংরেজরা তার জন্য মূলতঃ এই সূর্য সেনই দায়ী বলে মনে করত। তাই তার বিরুদ্ধে আক্রোশের ঐ কাপুরুষোচিত বহিঃপ্রকাশ ষোলসহর ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর একটি রেলের কামরায় ঘটেছিল।

যাই হোক যথা সময়ে বন্দী সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনকে প্রথমে জেলা গোয়েন্দা সদর দপ্তরে, পরে কোর্ট মারফত চট্টগ্রাম জেলে নেওয়া হয়। জেলের ভিতরে বাহিরে সশস্ত্র রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। জেল পরিচালনার কর্তৃত্ব আগেই এক ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর হাতে দেওয়া হয়েছিল।

জেলে তাঁকে নির্জন কুঠরীতে বন্ধ করে রাখা হয়। কোন বই, সংবাদপত্র, লিখবার কাগজ, পেনসিল কলম কোন কিছুই তাঁকে দেওয়া হত না। দিনের মধ্যে একবার কয়েদী-মেথরের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়! নির্জন কুঠরীর ভিতরে খোলা পায়খানার টুকরী সে যখন সাফ্ করতে আসে সশস্ত্র প্রহরী তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে—কোন কথা কেউ বলে না কেবল নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করে তারা চলে যায়।

বিশ

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর দলের নেতৃত্বভার পড়ে তরুণ বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। অস্ত্রাগার দখলের পূর্বে বোমা তৈরী করতে গিয়ে সে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়, তার সঙ্গেই আহত অর্ধেন্দু দস্তিদার যদিও অস্ত্রাগার দখলে যোগ দিতে পেরেছিল, বিপ্লবী তারকেশ্বর তাতে যোগ দেবার মত তখনও সুস্থ হয়ে উঠে নাই। তারপর থেকে তার পলাতক জীবন চলছে এবং পুলিশ ও তার জন্য শেষ পর্যন্ত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। নিজের কর্মক্ষমতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী তারকেশ্বর দিন দিন সাথীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে থাকে এবং ক্রমে বিপ্লবীদলের সদস্যরাও তাকে পরবর্তী প্রধান নেতা হিসাবে গ্রহণ করে।

বিশেষ সাহসী বিপ্লবী সাথী বীরেন দে'কে সঙ্গে নিয়ে একদিন তারকেশ্বর দস্তিদার বরমা গ্রাম দিয়ে গভীর রাত্রে যাওয়ার সময় এক গোয়েন্দা সাব-ইনস্পেকটারের সামনে পড়ে যায়। দুইজন বিপ্লবীর হাতেই গুলীভরা রিভলভার ছিল। ঐ দারোগাকে গুলী দ্বারা আহত করে বিপ্লবীরা সাফল্যের সঙ্গে চল যেতে পারে।

এই বীরেন দে কিছুদিন পর দলের কিছু নূতন ছেলেকে রিভলভার চালনা শিক্ষা দিচ্ছিল। অসাবধানতার ফলে একটি ছেলে হঠাৎ রিভলভারের ঘোড়ায় টিপ দিয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় বীরেন দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। করলডেঙ্গা পাহাড়ের এক গোপন স্থানে এই ঘটনা ঘটে। পাহাড়ী লতাপাতা দিয়ে সাথীরা তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু রক্তস্রোত কোন মতেই থামে না। আহত বীরেনকে নিকটবর্তী এক গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়। আহত স্থান ক্রমে পঁচে যায়, গোপন চিকিৎসা দ্বারা যতটা করা সম্ভব বিপ্লবীরা করে, কিন্তু এই দুঃখজনক দুর্ঘটনার ফলে বিপ্লবী বীরেন দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

মাষ্টারদা ধরা পড়ার তিনমাস পর বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামের এক আশ্রয় কেন্দ্রে ছিলেন। ১৯৩৩-এর ১৮ই মে একদিন ভোরবেলা পুলিশ আর মিলিটারী ঐ কেন্দ্র ঘিরে ফেলে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের পর এই দুই বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়। সেদিনকার ঐ সংঘর্ষ সম্পর্কে বিপ্লবী কল্পনা দত্ত (যোশী) নিজেই যা লিখেছেন, তা নীচে দেওয়া হল :—

"বহুদিন ধরে বাহ্যতঃ বিপ্লবীদের কোন কার্যকলাপ না দেখে সরকার মনে করেছিল বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে। ধলঘাটে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ঘাটি আক্রমণের পর নির্মলদার (নির্মল সেন) ও ভোলার (অপূর্ব সেন) মৃত্যু, মাষ্টারদার ও প্রীতির পুলিশ ব্যূহ ভেদ করে পলায়ন, পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ইত্যাদি পর পর কয়েকটি ঘটনার ফলে সরকার পক্ষের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী ছেলেরা অদূর ভবিষ্যতে কিছু করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সরকার এই বিপ্লবীদের ধরবার জন্য তখন বদ্ধপরিকর হয়ে গ্রামে গ্রামে মিলিটারী ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল; কারফিউর আরও কড়াকড়ি হল এবং শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নয়, বার বৎসরের অনূর্ধ্ব বালকদেরও ধরে বেঁধে রেখে বিপ্লবীদের পরস্পরের এবং বাইরের সঙ্গে সমস্ত রকম সংযোগ ও সহযোগের পথ বন্ধ করবার প্রচেষ্টা করল। জনসাধারণের উপরও নির্যাতন ও নিপীড়নের সীমা ছিলনা। কিন্তু সরকার পক্ষ মরীয়া হয়ে উঠলেও জনসাধারণ এবং বিপ্লবী দল তখনও মনোবল হারায়নি।

সরকারী পুরস্কার পাওয়ার লোভে এক গ্রামবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় মাষ্টারদা ধরা পড়লেন ১৯৩৩ ইংরেজীর ফেব্রুয়ারী মাসে গৈরালা গ্রামে। পুলিশ বেষ্টনীর মাঝখান থেকে আমরা অন্যান্য সকলেই পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম। খালি পারেননি মাষ্টারদা আর মাষ্টারদাকে বাঁচাতে গিয়ে সামনে গিয়ে পড়েছিলেন টুনুদা (ব্রজেন সেন)।

যে গ্রামবাসীর সাহায্যে বিপ্লবীদের আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হয়েছিল তারা হতাশ হয়ে পড়ল—আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা হয়ে পড়ল মরীয়া। পুরানো আশ্রয়স্থলগুলো পুলিশী হানার জন্য অকেজো হয়ে উঠল—পুরানো সমর্থকদের গৃহে পুলিশী অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলতে

লাগলো। এমন অবস্থায় আশ্রয়স্থল পাওয়াও মুস্কিল--আর কোনরকমে পাওয়া গেলেও একদিনের বেশী দু'দিন সেখানে থাকা সম্ভব হোতো না। পলাতক জীবনের প্রয়োজনে পলাতক জীবনের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে যে নিয়মগুলো আমরা মেনে চলতাম--যে রীতিনীতি-গুলো গড়ে উঠেছিল তার ভিৎ ধসে পড়তে লাগল। অস্ত্রাগার দখল বা চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ যে সব গ্রামের ছেলেদের দিয়ে হয়েছে বিশেষ করে সে সব গ্রামের অধিবাসীরা ছিলেন এসব বিপ্লবীদের প্রতি স্নেহসম্পন্ন এবং মধ্যবিত্তবহুল গ্রাম ছিল বলেই এইগুলি বেশী রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ছিল। বৈপ্লবিক কাজের প্রস্তুতির জন্য এসব গ্রামের মধ্যেই আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতাম। তাছাড়া আমরা সে বাড়ীতেই আশ্রয় নিতাম যাঁরা সব জেনেশুনে সব রকম বিপদের ঝুঁকি বহন করতে রাজী থাকতেন। হিন্দুপরিবারের উপর অত্যাচার বেশী হত বলে, সরকারের সন্দেহ তাদের উপর বেশী পড়ত বলে এসব গ্রামের বহু মুসলমান পরিবারও আমাদের সযত্নে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন।

কিন্তু মাষ্টারদা ধরা পড়ার পর এসব গ্রামে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমরা ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে আশ্রয় খুজে খুঁজে চলতে লাগলাম। অনন্যোপায় হয়ে কোনদিন বা টাকার বিনিময়ে আশ্রয় জোগাড় করতাম, কোনদিন বা এমন আশ্রয়ে গিয়ে পড়তাম যাঁরা আমাদের আশ্রয় দিয়ে নিজেদের জন্য মনে করতেন এবং শত বাধা সত্ত্বেও গ্রামের সকলকে অতিথিদের দেখবার জন্য আমন্ত্রণ করে আনতেন। আবার অনেক আশ্রয়স্থলে 'অতিথি সেবার মত পুণ্য নেই' এই মনে করেই আশ্রয় দিতেন। বিপদ থাকতে পারে জেনেও রাজনৈতিক কোন প্রশ্ন তাঁদের মনের ধারেপাশেও আসত না।

আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল এমনি একটি পরিবার, আনোয়ারা থানার গহীরা গ্রামে। শহর থেকে ২৫ মাইল দুরে। তাঁদের আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম 'আমরা স্বদেশী, আমাদের আশ্রয় দিলে পুলিশ অত্যাচার করবে, জেল হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের জবাব ছিল, অতিথি দেবতার সমান, আশ্রয় দিলে পুণ্য হবে, অতিথি ফিরিয়ে দেওয়া পাপ।' এইভাবে তাঁরা আমাদের আশ্রয় দিলেন। সমুদ্রের একেবারে নিকটেই

বাড়ীটা। স্বচ্ছল চাষী পরিবার বাড়ীর মালিক পূর্ণ তালুকদার ও নিশি তালুকদার দুই ভাই। বাড়ীর পেছনে আমবাগান তার পরেই সমুদ্রসৈকত।

আমরা জানতাম, এ ধরনের আশ্রয়ে বেশী দিন থাকা সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। এ গ্রামে যদিও মিলিটারী ক্যাম্প তখনও বসেনি, কিন্তু মাইল পাঁচেক দূরে মাত্র একদিন আগে নতুন ক্যাম্প হয়েছে। টহলদারী সৈন্য আশে পাশের কয়েকটি গ্রাম জুড়ে প্রতি রাত্রে ঘরে ঘরে হানা দেয়।

আমরা এদিকে এসে শহরের উত্তরদিকে চলে যাওয়াই মনস্থ করলাম—মীরেরশ্বরাই থানা এলাকায়, যেখানে মিলিটারী পাহারা তুলনায় কিছু কম। সেদিকে খবর পাঠাবার এবং আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পথ প্রদর্শক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে প্রস্তুত হয়ে নিতে যে ২।৩ দিন সময় লাগবে সে দু'দিন এ আশ্রয় স্থলে থেকে আমাদের অস্ত্রসম্ভার পূরণ করে নেব এটাই ঠিক করলাম। আমাদের কাছে যে বোমা ও রিভলভার ছিল—তার রসদও যথেষ্ট ছিলনা। আমার ও ফুটুদারই* মাত্র রিভলভার ছিল আর তার কার্তুজ ছিল মাত্র ছয় রাউণ্ড করে ১২ রাউণ্ড। এ সবই ছিল অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত। তাই আমরা গ্রামেই কার্তুজ তৈরীর কাজে লেগে গেলাম। এ আশ্রয় স্থলে আমরা এসেছিলাম মাত্র চারজন। তারকেশ্বর দস্তিদার—মাষ্টারদা ধরা পড়ার পড়ে যিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন—মনোরঞ্জন দাস (খোকা)—১৬ বৎসরের একটি ছেলে, আর মনোরঞ্জন দে। শেষোক্ত ব্যক্তি পাশের গ্রামেরই লোক, তিনিই আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। আশ্রয় কর্তা তাকে ভাল করে জানতেন।

আমরা থাকতাম দিনের বেলায় রান্না ঘরে—সারাদিন কাজ করতাম আর রাত্রে চলে যেতাম সমুদ্রের ধারে। লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা এবং বাইরের খবরাখবর নেওয়া সবই আশ্রয়স্থলের বাইরেই করতাম। এটাও আমাদের নিয়মের মধ্যে ছিল। ১৯শে মে, ১৯৩৩ ইং যথারীতি আমরা সমুদ্রের তীরে চলে গিয়েছিলাম। পরের দিন আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করার সমস্ত রকম ব্যবস্থার পরিকল্পনা যখন চলছিল

* তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাক নাম।

বাড়ীর পিছনের আম বাগানে টর্চের আলো দেখে আমরা ভাবলাম হয়ত বা আবগারী পুলিশ বেআইনী মালের সন্ধানে বেড়িয়েছে। পুলিশের গতিবিধি সম্পর্কে যিনি আমাদের সংবাদ দিতেন তিনি তখন এসে পড়েননি। আমরা বাইরে থেকে নিরাপদ নয় ভেবে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করেই আশ্রয়স্থলে ঢুকে পড়েছিলাম।

ভোর বেলা একটু দেরীতেই ঘুম ভাঙ্গল। তাড়াতাড়ি বাইরের কাজ সেরে ঘরে ঢুকতেই একটি আর্তনাদের সঙ্গে শুনলাম, 'পুলিশ এসেছে'। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালানো যায়, তাছাড়া পুলিশব্যূহ ভেদ করেও পালিয়েছি দু'একবার। কিন্তু দিনের বেলায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা জেনেও এভাবে শুধু শুধু ধরা দেবনা— এই ভেবে বেরিয়ে যাব ঠিক করলাম। দু'একজন মারা গেলেও আর দু'একজন অন্তত বেরিয়ে যেতে পারবে এ দুরাশা আমাদের ছিল। সামনে আমি ছিলাম ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বুকের দিকে লক্ষ্য করে একহাত দূরে রাইফেল ধরে এক সৈন্য দাঁড়িয়ে। পলায়নের চেষ্টা বৃথা হবে জেনে আমরা ঢুকে পড়লাম আশ্রয়দাতার একটি খালি কোঠাঘরে। রান্না ঘরের ফুটো বেড়া সৈন্যদের গুলীরোধ করে রাখার মত নিরাপদ ছিলনা। তখন চারদিক থেকেই গোলাগুলী চলছে। ঘরের ভিতর থেকে আমরা শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম গোলাগুলীর শব্দ আর চীৎকার মেয়েদের, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের, পুরুষের। গুলী থেকে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যদের হুংকারের ভয়ে তারা বাইরেই ছুটে চলেছে, ঘরের ভিতরে ডেকেও রাখা যাচ্ছেনা,—খোলা জানালার ভেতর দিয়ে গুলী এসে পড়লেও তবু ঘরের ভিতর ছিল নিরাপদ ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আমরা রিভলভার থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলাম, দেয়ালের আড়াল থেকে সঠিক লক্ষ্য করে গুলী করার উপায় আমাদের ছিলনা। লক্ষ্যহীণভাবে আমরা ও গুলী চালাতে লাগলাম।

১২ রাউণ্ড গুলী বেশীক্ষণ চলল না। আমাদের তৈরী গুলী পরীক্ষিত হয়নি তখনও। রিভলভারের চেম্বারের তুলনায় গুলীগুলো বড় হওয়াতে রিভলভার অকেজো হয়ে রইল। এদিকে সৈন্যবাহিনী বেপরোয়া হয়ে গুলী চালাতে লাগল, একটি গুলী এসে লাগল বাড়ীর মালিকের বড় ভাই পূর্ণ তালুকদারের বুকে। তিনি তৎক্ষণাত পড়ে

গেলেন। 'দাদাকে মেরে ফেলল' বলে ছোট ভাই যখন দাদাকে ধরতে গেলেন, বুকে গুলী খেয়ে তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অসহায়ের মত বসে অন্যদের মৃত্যু দেখার চেয়ে বাইরে বেড়িয়ে মরব এবং এ গুলীগোলার মধ্যে পালাবার আরেকবার সুযোগ নেওয়া যাক নতুবা গুলী খেয়ে মৃত্যু হোক, এ ভেবে যখনই দরজার দিকে এগিয়েছি, জানালার ভিতর দিয়ে একটি গুলী এসে আমার হাতের উপর দিয়ে পাশেই দাঁড়ানো খোকার বুকে গিয়ে পড়ল। একটিবার মাত্র 'মা' শব্দ করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফুটুদা তাকে ধরে তুলতে চেষ্টা করলেন। সে তখন মারা গেছে—পেটও বুকের মাঝখানে ফুটো দিয়ে নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে আসছে আর গলা দিয়ে বেড়িয়ে আসছে অনর্গল রক্ত। দরজার ফাঁক দিয়েও বাইরে দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো চতুর্দিকে গুলী গোলার মধ্যে ভয়ে চিৎকার করছে। আমাদের জন্য অযথা আর প্রাণ নষ্ট হতে দেবনা এই স্থির করে আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। কম্যাণ্ডার এসে আমাদের হাত থেকে রিভলভার দু'টি নিয়ে গেল। ধরে নিয়ে যখন যাচ্ছিল উঠানের উপর দেখলাম চারদিকে রক্তের মাঝখানে পূর্ণ তালুকদারের মৃতদেহ—নিশি তালুকদারের তখনও মৃত্যু না হলেও তাঁর নির্জীব মাথা দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। আরো বাড়ীর অনেক ছেলের মাথায়, চোখে, বুকে জমাট বাঁধা রক্ত সারি দিয়ে তাদের বসিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভাববার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিলনা। শুধু মনে হতে লাগল, ধর্মভীরু নিরীহ মানুষের এ আত্মত্যাগের সার্থকতা আসবে কি? কখন আসবে?

সুবাদার আমাকে দেখেই রেগে—একটি থাপ্পর মেরেছিল মাত্র, কিন্তু সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারিনা যখন সমস্ত সৈন্যরা সামনে এসে সুবাদারের এ কাজের প্রতিবাদ জানাল, মাটিতে আমি বসে পড়লাম। সুবাদার ফুটুদাকে আনতে গেল, সৈন্যরা এসে আমাকে জানালো, তারা থাকতে আমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না, তারা আমাকে সম্মান করে, বিপ্লবীদের সম্মান করে। পেটের জন্য সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে—তাদের কথা শুনে তার ভিতরে এতটুকু মিথ্যা আছে বলে আমার মনে হয়নি। শুধু তাই নয়—গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে যখন আমাদের—ক্যাম্পের পাশে এসে দাঁড়াতেই সৈন্যরা আমাদের অভিবাদন জানিয়েছে, ক্যাম্পের ভিতরে যখন বসেছি তখন

তারা বলল, আমাদের ধরবার জন্যই তাদের আনা হয়েছে কোনটা ব' গুর্খাবাহিনী, জাঠবাহিনী, কোনটা আসাম বাহিনী, তারা সবাই বলল, আমাদের দেখে তারা ধন্য।

এক বছর পরে হিজলী মেয়েদের জেলে আমি যখন ছিলাম আমাদের এক সাথী মেদিনীপুর হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে বলেছিল—এ ফুলের তোড়া সেই সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছে তাদের স্মরণ করার জন্য যারা আমাকে ধরেছিল গহীরা গ্রামে—তারা মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে। ঐ হাসপাতালে তারা আমাদের সাথীটির কাছ থেকে জানতে পেরেছিল আমি ওখানে আছি।

সৈন্যদের কথা মনে হলেই ভেসে ওঠে অত্যাচারের রূপ, যা গ্রামে গ্রামে দেখেছি—যা দেখেছি প্রত্যক্ষভাবে যখন ধরা পড়ি। তারা ফুটুদার চোখে বুটজুতার লাথি মেরে যখন চোখের ভেতর দিয়ে ফিনকি মেরে রক্ত বের করে দিয়েছিল, আমার আশ্রয়দাতার পরিবারবর্গকে সর্বাঙ্গে যারা রক্তাক্ত করে রেখেছিল তখন তাদের বীভৎসরূপের কথা মনে হয়—কিন্তু তারই সঙ্গে মনে না করে পারিনা আবার যাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করেছিল—যারা এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যারা সাধারণ সৈন্য যাদের নেই কোন বিশেষ পদ বা পদবী।

সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক জীবন বহুদিন হয় ছেড়েছি। একটা আদর্শে বিশ্বাস করে সব কিছু ত্যাগ করতে তখন প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা আমাদের আশ্রয় দিয়ে আমাদের সাহায্য করে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করলেন—আত্মাহুতি দিলেন আজকের দিনে তাঁদের কথা বার বার মনে হয়—তাঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা অর্ঘ্যের আমরা এখনও কিছু করতে পারলাম না।'

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ১ম ও ২য় মামলা চট্টগ্রাম কোর্টের মধ্যে হয়েছিল। হিংস্র পশুকে যেভাবে শক্ত লোহার জালের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়, ঐসব মামলার আসামীদেরও সেভাবে খাঁচায় রেখে বিচার করা হত। কিন্তু প্রধান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনকে কোর্টে

বিচারের জন্য নেওয়ার সাহস ইংরেজ শাসকদের হয় না। জেলের পাশে গোয়েন্দা আপিসের একটি কামরাকে বিচারকক্ষ বলে ঘোষণা করে সেখানে বিচারের এক প্রহসন হয় তিনজন বিপ্লবী--সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তের এই মামলার নাম তৃতীয় "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলা। এর জন্য যেই বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছিল, তার সদস্য ছিল:

মিঃ ম্যাকসাপি—বাখরগঞ্জের তদানীন্তন দায়রা জজ

মিঃ রজনী ঘোষ—সিলেটের অতিরিক্ত দায়রা জজ

মিঃ খোন্দকার আলী তোয়েব—চট্টগ্রামের দক্ষিণ সদর মহকুমা হাকিম।

বিচারের সময় সূর্য সেনের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরকার উপস্থিত করতে পারে নাই। সঙ্গে রিভলভার পাওয়ার জন্য কেবল অস্ত্র আইনেই সাজা তাঁর হতে পারত। কিন্তু ইংরেজের বেতনভোগী বিচারক তাঁকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে দ্বিধা করেনি। তাঁর উকিল বার বার প্রমাণের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি, শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁর উকিল বিচারককে অনুকম্পার আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, তাঁর নিজ হাতের লেখা অর্ধসমাপ্ত আত্মজীবনী "বিজয়া"র কথা। সেখানে তিনি নাকি লিখেছিলেন, অনেক সাথীর জীবন স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁরই নির্দেশে বিসর্জিত হয়েছে কিন্তু তবু বহু ঈপ্সিত মুক্তি আসে নাই। তিনি কয়েকদিন ধরে ট্রট্‌স্কীর রচিত "রুশ বিপ্লবের ইতিহাস" পড়ছেন, তা পড়ে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন, বিপ্লবের জন্য রুশ জনসাধারণের উদ্যোগ, আয়োজন ও সংগ্রাম দেখে ঐ ইতিহাস পড়ে এক একবার তাঁর মনে হয়েছে যে, এভাবে ব্যক্তিগত আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে বুঝি দেশের মুক্তি আসবে না, রুশ দেশের মত গণ আন্দোলনের ও সংগ্রামের মধ্যদিয়েই হয়ত তা আসবে, ঐ সমাজতন্ত্রের পথই হয়ত প্রকৃত পথ।*

* "বিজয়া"--(হস্তলিখিত) খাতাখানা সরকারের হাতে ছিল। মোকদ্দমার অন্যতম দ্রষ্টব্য (Exhibit) হিসাবে। মোকদ্দমার বিবরণী হিসাবে এই তথ্য তৎকালীন সংবাদপত্র দৈনিক "পাঞ্চজন্যে" প্রকাশিত হয়েছিল।

সূর্য সেনের উকিল ঐ রচনাটি এবং সঙ্গে প্রাপ্ত ট্রট্স্কীর ঐ বই-খানা পড়বার আগ্রহের উল্লেখ করে বলেন যে—সূর্য সেন ক্রমে বিপ্লবের জন্য সন্ত্রাসবাদের পন্থায় বিশ্বাস হারাচ্ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের দিকেই তাঁর মনের গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এই কথা বিবেচনা করে, বিচারক যেন সূর্য সেনের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা মকুব করেন এবং অন্ততঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর তাঁকে দেন এই শেষ আবেদন তাঁর উকিল করেন। কিন্তু ইংরেজ বিচারক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অটল থাকেন। এর বিরুদ্ধে সমস্ত আপীল ডিসমিস হয়, এবং সূর্য সেনের ফাঁসীর হুকুম বহাল থাকে।

এই মামলায় তারকেশ্বর দস্তিদারেরও ফাঁসীর হুকুম হয় এবং কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

বিপ্লবীদের মধ্যে প্রধান নেতার জন্য বিপ্লবী দলের সদস্যদের শ্রদ্ধা ও দরদ এমন গভীর ছিল যে, তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী দেশদ্রোহী নেত্র সেনকে চরম শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা করে। সূর্য সেন বন্দী হবার কিছুদিন পর ১৯৩৪-এর ২রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় নেত্র সেন ভাত খেতে বসেছে। তার স্ত্রী রান্নাঘরে আর কি যেন আনতে গেছেন। নিঃশব্দ পদক্ষেপে অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ বড় কোন ধারাল অস্ত্রের আঘাতে নেত্র সেনের মাথাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থালার উপর পড়ল। স্ত্রী ফিরে এসে স্বামীর অবস্থা দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। বিপ্লবীরা যাবার সময় বলে যায়, দেশদ্রোহিতার শাস্তি তারা দিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর পুলিশ সন্দেহ করে অনেক যুবককে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও নেত্র সেনের হত্যাকারী কে তার সন্ধান পুলিশ পায়নি। যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই উপমহাদেশের উপর তার শাসনভার নিয়ে বিদ্যমান ছিল, ততদিন তারা কোনমতে জানতে পারেনি, সূর্য সেনের গ্রেপ্তারের জন্য সংবাদদাতাকে কে বা কারা ঐ চরম শাস্তি দিয়েছিল। আর পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে শহীদ প্রীতিলতার সঙ্গে অন্য কয়জন বিপ্লবীও কে কে ছিল। তার হদিসও গোয়েন্দা পুলিশ বহু চেষ্টা করে পায়নি। তাই লক্ষ্যণীয় যে, যেই পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে প্রায় ৫৩ জন ইংরেজ নরনারী

নিহত হয়েছিল বলে শোনা গেছে, সেই ব্যাপারে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার মত কোন বড় মামলা হয়নি। এই দু'টি ঘটনার ব্যাপারে শত অত্যাচারেও পুলিশ সাময়িকভাবেও কোন রাজসাক্ষী তৈরী করতে পারেনি। তখনকার বিপ্লবীদলের ছেলেদের নৈতিক চরিত্রবল এবং গোপন সংগঠনের নিয়মানুবর্তিতা পালনে শৃঙ্খলাবোধ যে কত কঠোর ছিল এই দু'টি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়।

মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার যখন ধরা পড়ে যান, তার পর থেকে চট্টগ্রামের এই দলের বিপ্লবীদের মধ্যে নানারকম দুর্বলতা দেখা দেয়। কারণ তখনও পর্যন্ত যে সমস্ত বিপ্লবী পলাতক ছিল, তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, বয়স ও অভিজ্ঞতা হিসাবে কেউ বেশী উন্নত ছিল না। দলের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থভাণ্ডার ঠিকভাবে রাখা এবং আরও কিছু বৈপ্লবিক "কাজের" চেষ্টা করা—এই ছিল কর্মসূচী। যারা তখনও পলাতক জীবন যাপন করছিল, তাদের মধ্যে পূর্বতন নেতাদের অনুপস্থিতির ফলে যেমন দুর্বলতা ও সুবিধাবাদ দেখা দিচ্ছিল, তেমনই বিশেষ করে বিগত চার বছরের সন্ত্রাসবাদের অভিজ্ঞতা শুধু চট্টগ্রামের নয়, সারা বাংলার বিপ্লবীদেরই চিন্তিত করে তুলেছিল।

চট্টগ্রামে চার বছর ধরে বৃটিশ সরকার যে চরম অত্যাচার করেছিল, তার সামনে দেশপ্রেমিক জনসাধারণ যে যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য দেখিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু এত রক্তক্ষয় ও আত্মদানে কি ফল হ'ল, কতটা সাফল্য অর্জন করলাম, এই চিন্তা জনসাধারণ ও বিপ্লবীদের মধ্যে তখন আসতে শুরু করেছিল।

তা সত্ত্বেও প্রধান নেতা দুইজনকে ফাঁসীর আদেশ দেওয়াতে তার প্রতিশোধ নেবার এক পরিকল্পনা, তাঁদের পরবর্তী নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিশেষতঃ প্রাণপ্রিয় নেতা সূর্য সেনকে ফাঁসী দেওয়া বন্ধ করার পক্ষে সহায়ক হবে, এই ভেবে বিপ্লবীরা পল্টনে ক্রিকেট খেলার মধ্যে উপস্থিত ইংরেজদের উপর রিভলভার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত করে।

১৯৩৪-এর ২রা জানুয়ারী পল্টনে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, খেলোয়াড় সব ইংরেজ, দর্শকদের মধ্যে অবশ্য দেশের মানুষ কিছু আছে,

এক কোণায় সশস্ত্র পাহারাও আছে, কারণ অস্ত্রাগার দখলের পর থেকে, বিশেষতঃ পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পর থেকে ইংরেজরা সর্বদা আতংকগ্রস্ত থাকত। সন্ধ্যার কিছু আগে নিম্নোক্ত চারজন তরুণ বিপ্লবী হঠাৎ পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে উপস্থিত হল:

(১) নিত্যগোপাল সেন

(২) হিমাংশু ভট্টাচার্য

(৩) কৃষ্ণ চৌধুরী (কেলিশহর)

(৪) হরেন্দ্র চক্রবর্তী (বাগদণ্ডী, ধলঘাট)

সঙ্গে সঙ্গে তাদের রিভলভারের গুলীতে এবং বোমা নিক্ষেপে খেলার মাঠের সব খেলোয়ার আর দর্শক উর্ধশ্বাসে পলায়ন করতে শুরু করল। সশস্ত্র রক্ষীদলের গুলীতে বিপ্লবী নিত্যগোপাল ও হিমাংশুর প্রাণহীণ দেহ ঐ খেলার মাঠেই পড়ে রইল। দেশের মুক্তির জন্য যেই পথকে এই তরুণ বিপ্লবীরা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সেই সন্ত্রাসবাদের পথে প্রাণের খেলায় এই দেশপ্রেমিক তরুণরা নিজেদের অকাতরে বিলিয়ে দিল।

আহত কৃষ্ণ চৌধুরী আর হরেন্দ্র চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হল। চট্টগ্রাম সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবীদলের এই হল, সর্ব শেষ বৈপ্লবিক কাজ, দেশের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম পথ হিসাবে সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করতে এই শেষ প্রচেষ্টা কম সাহায্য করল না, যেই ইংরেজরা প্রাণপ্রিয় নেতা সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসী দিতে যাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে চিরজনমের মত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তাদের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে—ভয় দেখিয়ে ঐ নেতাদের হয়ত প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হবে। ভয় পেয়ে হয়ত তারা তাঁদের ফাঁসী দেবেনা—এই সব ধারণা ঐ তরুণ বিপ্লবীদের ছিল। কিন্তু ক্রিকেট ক্লাবের এই আক্রমণে একটি ইংরেজও নিহত হল না বরং নিজেদের দু'জন সাথীকে সঙ্গে সঙ্গে হারাতে হল। চারজনের মধ্যে একজন ও সফলতার সঙ্গে পালিয়ে আসতে পারল না, অন্য দু'জন বিপ্লবীকে ও শত্রুর হাতে ধরা পড়তে হ'ল।

১৯৩৪-এর ১২ই জানুয়ারী রাত দেড়টা দু'টায় চট্টগ্রাম জেলে একই ফাঁসীকাষ্ঠে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসী দেওয়া হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ সর্বদা এই ভয় করত যে, বিপ্লবীরা হঠাৎ আক্রমণ করে হয়ত তাদের নেতা সূর্য সেনকে জেল থেকে ছিনিয়ে নেবে। তাই দিনরাত কড়া পাহারায় যেমন তাকে নির্জন কুঠুরীতে রাখা হত। তেমনই তাঁর ফাঁসীর তারিখ সম্পর্কেও খুব কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

মাষ্টারদা চট্টগ্রাম জেল থেকে ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৪ ইং তারিখে লেখা এক চিঠিতে তাঁর ছোটভাই শ্রীযুত কমল সেনকে তাঁর সঙ্গে ফাঁসীর পূর্বে একবার দেখা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ফাঁসীর দু'দিন পর মাষ্টারদার এই সহোদর ভ্রাতা জানতে পারেন যে, তাঁর ভারতখ্যাত বিপ্লবী বড় ভাইয়ের ফাঁসী হয়ে গেছে। শ্রীযুত কমল সেন চট্টগ্রাম জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁর দাদার মৃতদেহ সম্পর্কে দরখাস্ত দিলে, তাঁকে জানানো হয়--১২ই জানুয়ারী (১৯৩৪) তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে এবং মৃতদেহ দাহ করা হয়নি। দুনিয়ায় সভ্য ও ভদ্র বলে গর্ব যারা করে, সেই ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য একথা নিকট আত্মীয়দের জানালেন না। দাহ না করলেও, ঐ মৃতদেহের সৎকার কিভাবে কোথায় হয়েছিল— কারণ প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ঐ ইংরেজ শাসককুল জানত, এই শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক বিপ্লবীনেতার সমাধিস্থল একদিন সারা দেশের মানুষের কাছে এক পরম শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তু হিসাবে প্রতিভাত হবে। তাই বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে, এই দুই বিপ্লবীনেতার মৃতদেহ তারা গোপন করে।

যতই বাইরের জগতের কাছে কর্তৃপক্ষ ফাঁসীর তারিখ গোপন করে রাখুক, চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে এই খবর গোপন ছিল না। কারণ জেলে যখনই কোন ফাঁসীর সিদ্ধান্ত করা হয়, তখন থেকে বেশ কয়েকদিন ঐ সম্পর্কে অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যাদের ফাঁসী হবে, তাদের ওজন নিয়ে সেই ওজনের নকল মানুষ বা ইটপাথরের বস্তা তৈরী করা হয়। নূতন শক্ত শনপাটের দড়ি প্রত্যেকবার ফাঁসীর সময় কেনা হয়। ঐ দড়ি দিয়ে ঐ ওজনকরা ইটপাথরের বস্তা ফাঁসীকাষ্ঠে জল্লাদ ঝুলায়। বারবার ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি পরীক্ষা করা হয়। দড়িতে

চর্বি, পাকাকলা ইত্যাদি মাখিয়ে তাকে মসৃণ করা হয়। ফাঁসীর ছয়সাত দিন আগে থেকে এই আয়োজন চলার সময়ই জেলের মধ্যে খবর ছড়িয়ে যায় যে, ফাঁসীকাষ্ঠের পাশেই মৃত্যুদণ্ডাপ্রাপ্ত বন্দীর নির্জন কুঠুরীতে যে মানুষটি মৃত্যুর জন্য ক্ষণ গুণছে, এই জগতের আলো তার চোখে চিরকালের জন্য নিভে যেতে আর দেরী নাই।

মাষ্টারদা আর তারকেশ্বরের ওজন নির্জন কুঠুরীতে ফাঁসীর জন্য অপেক্ষা করার সময় বেড়ে গিয়েছিল। ফাঁসীকাষ্ঠের যাবতীয় আয়োজন জেলের অন্য ওয়ার্ডে বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী এবং বিনাবিচারে আটক বন্দীদের কাছে জানা হয়ে গেল। তাদের চোখে ঘুম নেই, কখন হঠাৎ চুরি করে তাদের প্রিয়তম নেতাকে ঐসব শত্রুরা শেষ করে ফেলে। জেলের সাধারণ কয়েদী ও কারাবন্দীরা এবং জেল ডাক্তার ইত্যাদি কর্মচারীও এই বিপ্লবীনেতার প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করত। তারা অনেকেই ফাঁসীর নানা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাই কঠোর গোপনীয়তা সত্বেও, তাদের কাছ থেকেই ফাঁসীর তারিখ রাজবন্দীরা জানতে পারে।

মাষ্টারদার যখন বিচার চলছিল, তখন তিনি চট্টগ্রাম জেলে তাঁর বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তখন জনৈক ইংরেজ সামরিক কর্মচারীকে জেল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং জেলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল। তা সত্বেও মাষ্টারদার ও তাঁর অন্যান্য যেসব বিপ্লবী সাথী জেলের অন্যান্য অংশে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলত।

বিচার চলাকালে মাষ্টারদা নিম্নোক্ত বাণী পাঠিয়েছিলেন:

"আদর্শ এবং ঐক্যের বাণী আমার বিদায়ের বাণী। ফাঁসীর রজ্জু আমার মাথার উপর দোদুল্যমান। মৃত্যু আমার দুয়ারে আঘাত হানছে। মন আমার অনন্তের পানে ছুটে চলেছে। ইহাই আমার সাধনার সময়। মৃত্যুকে সখারূপে আলিঙ্গন করার এই সময়টি, বিগত স্মৃতিকে স্মরণ করবার সময় এসেছে। আমার প্রিয়তম ভাই-ভগিনীগন,

তোমাদের সেই সুমধুর স্মৃতি আমার মানসিক স্মৃতিকে উদ্দীপিত করছে, আমার এই গভীর আনন্দময় মুহূর্তটিকে উল্লসিত করে তুলেছে। কেবল একটি স্বপ্নই আমার মনকে আলোড়িত করছে—মনোমুগ্ধকর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। সমস্ত জীবনভরে গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে পাগলের মত একে সফল করতে ছুটে গেছি—জানিনা কতদিনে আমার স্বপ্ন সত্যরূপ নেবে। আজ যাবার দিনে তোমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই কাজ তোমরা অবিরাম চালিয়ে যাও—আমাদের স্বপ্ন সত্য হবার আগে থেমো না। যদি অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্বেই মৃত্যুর করাল হাত তোমাদের স্পর্শ করে, তবে আজ আমি যেমন করছি, তোমরা তোমাদের ভাইদের উপর কাজের ভার দিও।

এগিয়ে যাও বন্ধুগন, এগিয়ে যাও—পিছিয়ে পড়ো না।"

তারপর বিশেষ ট্রাইবুন্যাল যখন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়, তখনও নির্ভীক এই বীর বিপ্লবী নেতা, তাঁর সাথীদের কাছে আবার লিখে পাঠিয়েছিলেন:

"১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ ইং তারিখ থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের এই বিপ্লবের দিনগুলির কথা ভুলো না। জালালাবাদ, কালারপোল, চন্দন-নগর আর ধলঘাটের স্মৃতি মনের মধ্যে চিরসবুজ রাখবে। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যেসব দেশপ্রেমিক তাদের জীবন বলি দিয়েছেন, মনের মধ্যে তাঁদের নাম লিখে রাখবে। বিশ্বাস করো, শহীদদের রক্তের মধ্যে রয়েছে বিপ্লবের বীজ।"

ফাঁসীর ঠিক চারঘণ্টা আগে মাষ্টারদার কাছ থেকে শেষ চিঠি এসে পোঁছে জেলের বেদনাবিমূঢ় উৎকণ্ঠিত তাঁর সাথীদের হাতে:

—"বিপ্লবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে"

—আমার জীবন স্বাধীনতার পূজারীদের অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস হোক।

—বিদায়! চিরবিদায়!!

—বন্দেমাতরম, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

—মৃত্যু একটি সুমধুর বিষাদ।

—আমাদের সংগঠনে কোন প্রকার বিভেদ বাঞ্ছনীয় নয়, সকল সদস্যদের মধ্যে আমি ঐক্য চাই।

—ভারতের বিপ্লবী বন্ধু যারা বাইরে আছেন, যারা জেলের ভিতরে আছে, যারা বিচারাধীন আছে—তাদের সকলের কাছে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সারা জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা ১১ই জানুয়ারী (১৯৩৪ ইং) সন্ধ্যা থেকে নিজ নিজ বন্ধ ঘরে চুপচাপ বসে আছে, কারও মুখে কোন কথা নেই—পরম বেদনাময় ক্ষণটির জন্য গভীর ব্যথা বুকে নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে, খবর পাওয়া গেছে বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার এর সেদিন বেশ জ্বর। তার ফলে সামান্য একটুখানি আশাও জাগছে, কারণ ডাক্তার যদি সুস্থ বলে সুপারিশ না করে তা'হলে সেদিন অন্ততঃ একজনের ফাঁসী স্থগিত থাকতে পারে।

রাত প্রায় দশটায় ফাঁসীর কুঠরীর দিক থেকে শোনা গেল মাষ্টারদার গলা :

"বন্ধুগন, বিদায়, চিরবিদায়।

বিপ্লবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে।

বন্দে মাতরম—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

গলা এক একবার থেমে যায়। বোঝা যায় রক্ষীরা বাধা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সব ওয়ার্ড থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ"। "স্বাধীন ভারত কি জয়।" "মাষ্টারদা জিন্দাবাদ," "ফুটুদা* জিন্দাবাদ।"

জেলের মহিলাদের যেখানে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয় সেই জানালা—ফটকে ছিলেন, বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। সেখান থেকে সবল

* বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম—বিপ্লবী সাথীরাও তাঁকে এই নামে ডাকত।

নারীকণ্ঠে আওয়াজ ভেসে এল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ," "মাষ্টারদা জিন্দাবাদ"।

এমন সময় জেলের বড় ফটক খুলে গেল। ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী, বাঙ্গালী গোয়েন্দা আর অস্ত্র ও বড় লাঠিধারী সিপাহীর বড় একদল জেলের ভিতরে প্রবেশ করল। তারা গিয়ে সম্পূর্ণ বে-আইনী-ভাবে যেসব ওয়ার্ডে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা ছিল, তার তালা খুলে তাদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালাতে শুরু করল। সেই নিষ্ঠুর লাঠি চালনার মধ্যেও এই দেশভক্ত বন্দীরা তাদের ধ্বনি দেওয়া বন্ধ করেনি।

এদিকে রাজবন্দীদের ধ্বনি ও আর্তনাদ শুনে সূর্যসেন ও রুগ্ন তারকেশ্বর দস্তিদার তাঁদের ফাঁসীর কুঠুরী থেকেও ধ্বনির শামিল হচ্ছেন। গভীর রাত্রে জেলগেটে এসে একখানা মোটর গাড়ী থামল। সেখান থেকে নামল গোটা আটজন ইংরেজ। তাদেরও জেলের ভিতরে আসতে দেওয়া হল, যদিও তারা রাত্রে কোন আইনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের নিয়ে যাওয়া হল ফাঁসীর কুঠুরীতে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে। সূর্য সেনের কুঠরী খুলে দিতেই, এই ইংরেজরা পশুর মত এই ফাঁসীর আসামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বন্দীবীরের গায়ে নাকে মুখে পড়েছে ঘুসি, বুটের লাথি—যতক্ষণ দেহে শক্তি ছিল, ততক্ষণ তিনি বিপ্লবী ধ্বনি দিয়েছেন। আর বর্বরভাবে লাঠি চালনায় আহত রাজবন্দীরাও তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে তুলছে তার প্রতিধ্বনি।

তারপর মুমূর্ষু সূর্য সেনের দেহখানা ফাঁসীর নিয়মরক্ষার জন্য ফাঁসীর দড়িতে একবার ঝোলানো হয়—জ্বরে রুগ্ন-বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদারকেও একই ফাঁসীকাঠের দ্বিতীয় কপিকলে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

মাষ্টারদার মৃতদেহ যে হিন্দু সৎকার-প্রথা অনুসারে পোড়ানো হয়নি। তা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর ছোটভাইকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিলেন। একসূত্রে জানা যায়, ঐ ইংরেজরা এই বিপ্লবী সর্বাধিনায়কের মৃতদেহ

তাদের মোটর গাড়ীতে করে নিয়ে পাথর বেঁধে সাগরজলে ফেলে দিয়েছে এই সংবাদের সমর্থনে খুব নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকলেও এই বিপ্লবীদের মৃতদেহ অন্ততঃ কোন এক জায়গায় সাধারণ মানবিক নিয়মে তখনকার বিদেশী সরকার সৎকার করেছে, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি, তাই যদি তখনকার দিনের সরকারী দলিলাদি পরীক্ষা করা হয়, তাহলে এই দেশপ্রেমিক নেতাদের দেহ সৎকারের স্থান অনুসন্ধান করে বাহির করা এবং সেই স্থানে উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করার জাতীয় দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি।

একুশ

বাংলার কয়েক হাজার বৈপ্লবীকে ইংরেজ সরকার ১৯৩০—৩৫ পর্যন্ত বিনাবিচারে আটক করে এবং ১৯৩৭—৩৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে ও আটকখানায় বন্দী করে রাখে। আলীপুর ডুয়ার্স এর কাছে জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটা ক্যাম্প, খড়গপুর রেলষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে ছিল হিজলী ক্যাম্প* আর বহরমপুর ক্যাম্প। ইংরেজ সরকারের মতে যেসব বিপ্লবী তাদের বেশী শত্রু, তাদের বাংলার ঐ তিন আটক-খানা ও জেল থেকে বাছাই করে রাজপুতনায় পাঠানো হয়। আজমীর মারওয়াড় জেলায় আজমীর রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে প্রতি ক্যাম্পে ১০০ জন হিসাবে, মোট ৫০০ জন রাজবন্দীকে দিউলী ক্যাম্পের পাঁচখানাতে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ১০০ জনই ছিল চট্টগ্রামের রাজবন্দী। বাংলা দেশের তিনটি আটকখানায়ও কয়েকশত চট্টগ্রাম জিলার রাজবন্দী ছিল।

---

* মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুরে একটি আদালত প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা থেকে বেশ বড় পাকা দোতলা এক দালান তৈরী হয়। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে বিনাবিচারে আটক প্রায় দুইশত বন্দীকে রাখার জন্য এই দালানকে আটকখানায় পরিণত করা হয়। ঐ বছর ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাত ১০টায় নিরস্ত্র রাজ বন্দীদের উপর গুলী চলে এবং কলিকাতার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্র এবং বরিশালের বিপ্লবী তারকেশ্বর সেন নিহত এবং বার-তের জন বন্দী গুরুতরভাবে আহত হয়। চট্টগ্রামের প্রায় ৫০।৬০ জন রাজবন্দী তখন ঐ হিজলী আটকখানায় ছিলেন। হিজলীর নিরস্ত্র আটকবন্দীদের উপর গুলী চালনার বিরুদ্ধে সারা বাংলা ও ভারতে তুমুল বিক্ষোভ হয়। ঐ ক্যাম্পের রাজ-বন্দীরা প্রতিবাদে ১৫ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। গুলী চলার প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর মূল সভাপতিত্বে এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক লক্ষ লোকের জনসভা বিশেষ স্মরণীয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে রচিত এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাক্ষরিত একটি এগারপাতা টেলিগ্রাম অনশনব্রতী রাজবন্দীরা যখন পেয়েছিলেন, তখন তাঁদের দাবী দেশের ঐ বরণীয় নেতারা নিজেদের দাবী বলে স্বীকার করে নেওয়ায় ১৫ দিন পরে রাজবন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।

তা'ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দী ছাড়াও তার পরবর্তী অন্য মামলার বহু চট্টগ্রাম বিপ্লবীকে আন্দামান দ্বীপে পাঠানো হয়। তারিণী মুখার্জী হত্যা মামলার বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী, অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী সুশীল দে, ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলার কালী দে ইত্যাদি চট্টগ্রামের অন্যান্য বন্দীকেও আন্দামানের 'সেলুলার' জেলে রাখা হয়েছিল। সারা বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলার সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ছাড়াও, বিহার ষড়যন্ত্র মামলা, পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা ও অন্যান্য বৈপ্লবিক মামলার সকলকে নিয়ে প্রায় ৩০০ জন রাজনৈতিক বন্দী আন্দামানে ছিল।

মোট কথা সন্ত্রাসবাদকে দেশের মুক্তি সংগ্রামের পথ হিসাবে গ্রহণ ক'রে বাংলার তথা চট্টগ্রামের যেসব বিপ্লবী দলও উপদল তাদের আন্দোলনকে ১৯৩০—৩৫-এর মধ্যে এক চরম পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, বৃটিশ সরকার চরম অত্যাচারের মারফত তাদের বিনাবিচারে বছরের পর বছর আটক রেখে, দেশের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। যাদের তারা কোন মামলায় জড়িত করতে পেরেছিল। তাদের বহু বৎসরের জন্য সাজা দিয়ে তারা বাংলার বিভিন্ন জেলে ও আন্দামানে পাঠিয়ে দেয়। আর যাদের আদালতে উপস্থিত করে অভিযোগ মামুলীভাবেও প্রমাণ করে তারা সাজা দিতে পারেনি, তাদের তারা বছরের পর বছর বিনাবিচারে আটক করে রেখেছে এবং সর্বশেষ দলকে ১৯৩৮শের শেষদিকে মুক্তি দিয়েছে।

অন্যদিকে এই আন্দোলনের যে মূল ত্রুটি ছিল, তা' হচ্ছে এই আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নেতারা, তাদের গোপন সংগঠনকে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর ছাত্র ও যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সমাজের পনর আনা মানুষ, মজুর, চাষী ও গরীব মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা সবচেয়ে নিপীড়িত ও শোষিত, তাদের মধ্যে যে বিরাট শক্তি নিহিত এই বিষয়ে ঐ বিপ্লবীরা সচেতন ছিলেন না। তাই প্রায় পাঁচ বছরের মত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলায় বহু তরুণ প্রকৃত বীরের মত লড়তে লড়তে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, অনেকে ফুলের মালার মত ফাঁসীর দড়ি গলায় হাসতে হাসতে পরেছে। নিজ প্রিয় পরিজন তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সয়েছে, বিনাবিচারে বছরের পর

বছর নিজ ঘর বাড়ী থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আটক রয়েছে। ১৯৩৫-এর পর থেকে এই সব বিপ্লবীদের মধ্যে যারা তখনও পলাতক জীবন যাপন করছিল, যারা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকে তাদের অর্থসাহায্য ও অন্যান্য সাহায্য করছিল এবং বিভিন্ন জেলে সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী ও আটকখানায় বিনা বিচারে আটক ছিল, সকলের মধ্যেই নূতন করে প্রশ্ন জাগে—স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদকে উপায় হিসাবে আর ব্যবহারের কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা।

এইসব বিপ্লবীদের দেশপ্রেম ছিল খাঁটি। আত্মদানের জন্য আগ্রহ ছিল আন্তরিক আর স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ছিল নিঃস্বার্থ। জেলে ও আটকখানায় থাকার ফলে বাইরের জগত থেকে যখন এই দেশভক্তরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে বসে তারা অতীতের কাজগুলিকে বিশ্লেষণ করতে লাগল। কেউ কেউ তারুণ্যের রোমাঞ্চকতা মুক্ত হয়ে, ধীরচিত্তে বিচার করতে লাগল—এভাবে ব্যক্তিগত ভীতিবাদের ফলে দেশের মুক্তি সংগ্রাম কতটা অগ্রসর হল, কেউ কেউ আটক জীবনের প্রভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হ'তে আরম্ভ করল। কারও মানসিক বিকৃতিও দেখা দিল। হিজলী আটকখানায়* চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামের রাজবন্দী অশ্বিনীগুহের হঠাৎ একদিন মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। রাজনৈতিক কারণই যে ঐ বিকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, তা বিকৃত অবস্থায় অনেক প্রলাপের মারফত বোঝা গিয়েছিল। তাঁকে হিজলী আটকখানা থেকে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের ব্যবস্থা অনুযায়ী রাঁচী পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে চরম বিকৃত অবস্থায় রক্ষীদের অগোচরে ইনি একদিন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। দেউলী আটকখানাতে মাষ্টারদার সহকর্মী ধীরেন চক্রবর্তীর ও

* প্রসঙ্গ নামে "আটখানা" শব্দটির ইতিহাস বলা চলে "ডিটেনশন ক্যাম্পকে" বন্দী অবস্থায় এই লেখক 'অবরোধ শিবির' অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সঠিক কিনা তা নিয়ে রাজবন্দীদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হলে লেখক তার বিচারের ভার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপর দিয়ে হিজলী ক্যাম্প থেকে ১৯৩১শে পত্র দেন। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি সাহিত্যিকদের কাছেও এই কথাগুলির অনুবাদ চেয়ে পাঠান হয়। রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই জবাব দেন এবং লেখেন "আটকখানাই" তাঁর মতে "ডিটেনশন ক্যাম্পের" প্রকৃত অনুবাদ হবে। সাগ্রহে রাজবন্দীরা এই অনুবাদ গ্রহণ করে।

মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়। তাঁকেও রাঁচি পাগলা গারদে পাঠান হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চট্টগ্রামের যে সব সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরা আন্দামানে যান, তার মধ্যে বিপ্লবীদলের প্রধান নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বল অন্যতম। ওখানে যাবার অল্পদিন পর থেকেই সন্ত্রাসবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং অধিকাংশ বন্দী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন। সেখানে কারা কর্তৃপক্ষ উর্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্দীদের উপর অকথ্য জুলুম করত। তার ফলে বন্দীদশায় সংগ্রামের সর্বশেষ অস্ত্র অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় বন্দীদের বহুবার নিতে হয়েছে। আন্দামান বন্দীদের অনশন ধর্মঘটে জোর করে খাওয়াতে গিয়ে তিনজন বন্দীকে হত্যা করা হয়। কারণ আনাড়ি ডাক্তার দিয়ে নাকের মধ্যদিয়ে রবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে জোর করে তরল খাদ্য খাওয়াতে গিয়ে, ঐ তিনজন বন্দীর ফুসফুসের মধ্যে কিছু তরলপদার্থ চলে যায়। তারফলেই ঐ তিনজন বন্দীর অকালমৃত্যু হয়।

তারপর ১৯৩৭ সালে আন্দামান বন্দীরা ঐ দ্বীপের কারাগার থেকে নিজ প্রদেশের জেলে দেশের মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসবার জন্য যে অনশন ধর্মঘট করেন, তাতে আন্দামানের প্রায় সকল বন্দী যোগদান করেন। ঐ ধর্মঘটের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীরাও ছিলেন। কিছুদিন তাঁরা ধর্মঘট করার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলেও আটকখানায় যেসব রাজবন্দীরা ছিলেন, আন্দামান বন্দীদের সমর্থনে তাঁরাও অনশন ধর্মঘট করেন। রাজপুতনায় দেউলী আটকখানার রাজবন্দীরা প্রথমবার ১৯৩৪শের জানুয়ারীতে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের ফাঁসীর প্রতিবাদে সকল দল ও মতের প্রায় পাঁচশতের মত বন্দী তিনদিন অনশন ধর্মঘট করেন। তারপর আন্দামান বন্দীদের অনশনের সহানুভূতিতে যখন সারা বাংলায় ও ভারতে বিরাট বন্দীমুক্তি আন্দোলন হয়, তাতে ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ বিপুলভাবে যোগ দেয়। এত বড় বন্দীমুক্তি আন্দোলন আর কোনদিন ভারতে হয়নি।

তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক। প্রায় ৬০০ রাজবন্দী এবং আড়াই শতের মত আন্দামান

বন্দীর প্রায় একমাসের মত অনশনে মহাত্মা গান্ধী বিচলিত হয়ে বাংলায় আসেন এবং বাংলার গভর্ণর ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপোষ আলোচনা করেন। কর্তৃপক্ষ আন্দামান বন্দীদের অবিলম্বে মূলভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনার এবং বন্দীদের আরও কিছু দাবী মানার আশ্বাসে, মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে আন্দামান বন্দীরা এবং বাংলা ও রাজপুতনায় বিনাবিচারে আটক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

জেলে ও আটকখানায় যারা সেদিন ছিল, দেশের দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে সে সব বিপ্লবী বন্দীরা গভীর সহানুভূতি পেয়েছিলেন। আন্দামান ও মূলভূখণ্ডের বন্দীদের ভিতরে কিছু অংশ তখন সাহস করে নিজেদের সহযাত্রীদের মধ্যেই ঘোষণা করেন যে, সন্ত্রাসবাদে তাঁরা আর বিশ্বাস করে না।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও পরবর্তী বৈপ্লবিক কার্যধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যারা যুক্ত ছিল, তাদের এক অংশ তখনও পুরাতন বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাসী থেকে, দলের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাদির দায়িত্ব ও নিজেদের ভগ্ন অস্তিত্ব নিয়ে কোনমতে টিঁকে ছিল।

১৯৩৪-এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পল্টনের ক্রিকেট ক্লাবে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের যে শেষ বৈপ্লবিক সংঘর্ষ হয়, তাতে বিপ্লবী কৃষ্ণ চৌধুরী আর হরেন্দ্র চক্রবর্তী পুলিশের হাতে যে ধৃত হয় তা আগেই বলা হয়েছে। মামুলী বিচারে এই দুইজন বিপ্লবীকে মেদিনীপুর জেলে ফাঁসী দেওয়া হল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের এই দুই শেষ শহীদ। এর পর সূর্য সেন দলের আর কোন বিপ্লবীকে গুলীর মুখে অথবা ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়নি।

শুধু চট্টগ্রামে নয়, এই সময় থেকে একদিকে পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জুলুম, অন্যদিকে এই মতে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের মধ্যে আত্ম-বিশ্লেষণ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফলে সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করার দিকেই বিপ্লবীরা এগিয়ে যাচ্ছিল। বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মধ্যে সমস্ত দল ও মতের বিপ্লবীরা ১৯৩২—৩৫-এর ভিতরে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও সন্ত্রাসবাদের মারফত যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আর চলতে পারে না, এই বিষয়ে একমত হয়ে যাচ্ছিল।

১৯০৬—৩৫ ইং পর্যন্ত ত্রিশ বছর কাল যে সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে এত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী শত নির্যাতন সহ্য করেছে, চরম আত্মদান করেছে, তাদের সহযাত্রীরা এই ত্যাগের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে দূর করে দেবার পথে কতটা এগিয়ে গেল, সে কথাই ভাবতে আরম্ভ করল। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত তরুণ তরুণী নিজের মহামূল্য প্রাণ হাতে করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা নিয়ে ঢাকায়, মেদিনীপুরে, কলিকাতায় ইংরেজ শাসকদের এবং তাদের সহায়কারী কিছু বাঙ্গালী গোয়েন্দার প্রাণ নিয়েছে। বাংলার গভর্ণরকে চট্টগ্রামের মেয়ে শ্রীযুক্তা বীণা দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গুলী করে হত্যার চেষ্টা করে ধৃত হলেন। দার্জিলিং-এ ক্রিকেট ক্লাবে আর একবার গভর্ণর হত্যার প্রচেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে নারী বিপ্লবী ঢাকার উজ্জ্বলা মজুমদার ধৃত হলেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় পর পর তিনজন ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিপ্লবীরা গুলী করে হত্যা করে। তারপর চতুর্থ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট সারা জেলার উপর চরম অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়ে, বিপ্লবীদের "চ্যালেঞ্জ" দিয়ে বলে, তাদের সাধ্য থাকলে তারা যেন তাকে হত্যার চেষ্টা করে।

বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির চরম অভিব্যক্তি হ'ল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল আর জালালাবাদের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম। এর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলায় যুগান্তর, শ্রীসঙ্ঘ, "বি—ভি" (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) দল, অনুশীলন 'রিভোল্ট' (প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক কাজের দাবীতে পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের এই নামে বলা হত), অনুশীলনের কোন কোন জেলার সংগঠন (যেমন চট্টগ্রামের দল ১৯৩১—৩২শে বাথুয়া ডাকাতি করে)—সকলে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সরকার প্রধানতঃ চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলায় এবং সাধারণ-ভাবে সারা বাংলায় যে পাল্টা অত্যাচার, বিনাবিচারে আটক, রাজনৈতিক মামলায় নিষ্ঠুর ও আক্রোশমূলক সাজার ব্যবস্থা করতে থাকে, তার ফলেও ক্রমে এই আন্দোলনে শৈথিল্য আসে।

১৯৩৭ সাল থেকে বিনাবিচারে আটক বন্দীদের সাম্রাজ্যবাদী সরকার বিভিন্ন আটকখানা থেকে মুক্তি দিতে শুরু করে। বিনাবিচারে

তখন বৃটিশ সরকার যাদের বন্দী করে রেখেছিল, তাদের মাসিক হাত-খরচের জন্য ১৯৩০—৩১শে ৩২ টাকা, পরে ১৯৩২—৩৩শে তা কমিয়ে ২০ টাকা, তারপর ১৯৩৩—৩৮ পর্যন্ত বাংলার জেলে আটকখানায় মাসিক ৯ টাকা এবং দেউলী (রাজপুতনা) আটকখানায় মাসিক ১০ টাকা করে দেওয়া হত। আর খাওয়ার জন্য প্রথম দিকে প্রত্যেকে দৈনিক এক টাকা দশ আনা, পরে এক টাকা চার আনা এবং ১৯৩৩ থেকে বাংলায় দৈনিক জনপ্রতি চোদ্দ আনা এবং দেউলীতে দৈনিক এক টাকা করে খাদ্য ভাতা দেওয়া হত। তা'ছাড়া যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা দিত তাদের শিক্ষাভাতা দেওয়া হত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার বইপত্র কিনবার জন্য ৪০ টাকা, আই-এ'র জন্য ৫০ টাকা, বি-এ ও বি-এল পরীক্ষার জন্য ৬০ টাকা এবং এম-এ পরীক্ষার জন্য ৮০ টাকা দেওয়া হত। আর পরীক্ষার 'ফিস্' বাবত ম্যাট্রিক থেকে বি-এ, বি-এল পরীক্ষা পর্যন্ত অর্ধেক সরকার দিত, বাকী অর্ধেক পরীক্ষার্থীকে নিজ নিজ মাসিক হাত খরচের ভাতা থেকে দিতে হত। এম-এ পরীক্ষার 'ফিস তিন ভাগের দুইভাগ সরকার দিত, বাকীটা পরীক্ষার্থীকে নিজ মাসিক ভাতা থেকে দিতে হত। শীতকালীন পোশাক কিনবার জন্য বাংলাদেশে ২৫ টাকা দেওয়া হত। দেউলী ও বক্সা আটকখানায় প্রথমবার ৫০ টাকা শীতকালীন ভাতা দেওয়া হত। দুই বছর পর আবার ২৫ টাকা করে দেওয়া হত কারণ ঐ দুই জায়গায় বরফ-জমা শীত ছিল। তা ছাড়া বন্দী হবার পূর্বে করা জীবন বীমার টাকাও সরকার থেকে দেওয়া হত। যেসব বন্দীর আয়ের উপর পরিবার নির্ভর করত, তাদের তখন সরকার থেকে পারিবারিক ভাতাও দেওয়া হত। তার পরিমাণ সর্বনিম্ন মাসিক ৪৫ টাকা থেকে ১০০০ টাকা (যেমন: কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে) দেওয়া হত। ডাক্তারী চিকিৎসা ও শক্ত অসুখ হলে বাইরের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা, চোখের অসুখে চিকিৎসা ও চশমা দেওয়া, দাঁতের চিকিৎসা ও দাঁত বাঁধানো, পরিবারের কারও অসুখ হলে ছুটিতে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাতায়াত—এইসব খরচের দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করত। তারপর ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিনাবিচারে আটক বিভিন্ন বন্দীদের যখন কোন থানার হেফাজতে গ্রামে অন্তরীণ রাখা হত, তখন প্রত্যেক রাজবন্দীকে সেখানে ঘর তৈরী বা ভাড়া করে দেওয়া হত। ঐ ঘরের চারিদিকে একটি সীমা নির্দেশ

করে দিয়ে আদেশ দেওয়া হত, তার বাইরে গেলে আইনভঙ্গ করা হবে এবং সেজন্য কয়েক বছর জেল খাটতে হবে।

চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার প্রায় সব রাজবন্দীদেরই বৃটিশ সরকার মুক্তিদানের পূর্বে বাংলার বিভিন্ন গ্রামে অন্তরীণ করে রাখত। সাধারণতঃ বিশেষ ভাবে অস্বাস্থ্যকর, শিক্ষায় খুব অনগ্রসর কোন গ্রামের থানার পাশেই নূতন এক কক্ষ বিশিষ্ট বাঁশের ঘর অথবা কাছাকাছি কোন পরিত্যক্ত ঘরে (যেমন ভুতুড়ে নাম পরিচিত) রাজবন্দীদের নিয়ে রাখা হত। তাদের খাওয়া-পরার জন্য মাসিক ৪০৲—৬০৲ টাকা ভাতা সরকার দিত। সরকারী আদেশে অন্তরীণকালের সময়ে (সাধারণতঃ ১ম দফায় ৬ মাস) চলাফেরার সীমা নির্দিষ্ট ও ঐ এলাকায় ছাত্র অথবা কোন রাজনৈতিক লোকের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হত। ঐ আদেশ-ভঙ্গের শাস্তি কমপক্ষে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০৲ টাকার অর্থদণ্ড হবে আদেশে লিখিত থাকত।

যেসব রাজবন্দী আটকখানায় বা জেলে থাকতেই অনেক চিন্তা ভাবনার পরে সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তাদের প্রায় সকলেই উপরোক্ত বিধিনিষেধ সত্বেও, অন্তরীণ এলাকায় নূতন নূতন কৃষক, ছাত্র, মজুর, সংগঠন গড়ে তোলে। যেসব গ্রামে, রাজনীতির কোন আভাসও ছিল না, অন্তরীণের অনেক রাজবন্দী সেখানে শক্তিশালী গণসংগঠন তৈরী করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জনগনের মনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ফরিদপুরের এক গ্রামে অন্তরীণ ছিলেন চট্টগ্রামের ছাত্র রাজবন্দী রোহিণী বড়ুয়া। হিজলী আটকখানা থেকে ১৯৩২শে তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে ছাত্র-সংগঠন করার শুরু করলে থানার দারোগা ঐ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে একদিন চরম অপমানজনক ব্যবহার করে এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামাতা সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করে। তরুণ বিপ্লবী রোহিণী তা সহ্য করতে না পেরে, হাতের কাছে একখানা দা পেয়ে, তা দিয়ে ঐ দারোগাকে আঘাত করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারোগার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরে দারোগা হত্যার অপরাধে রোহিণী বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয় এবং ফরিদপুর জেলেই তার ফাঁসী হয়। বিচারের সময় তার সুন্দর স্বাস্থোজ্জ্বল, তরুণ বয়স

দেখে তাঁর উকিলরা বার বার তাঁকে অনুরোধ করেছিল, যদি তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন, সরকারপক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণের দুর্বলতায় মৃত্যুদণ্ড কিছুতেই তার হবেনা। কিন্তু পিতামাতার সম্মান-রক্ষার জন্য যেই বৃটিশ গোলামকে নিজ হাতে সে শাস্তি দিয়েছিল, সেই বিষয়ে মিথ্যাভাষণে রোহিণী বড়ুয়া রাজী হয়নি। এভাবে সম্ভাবনাময় একটি তরুণ প্রাণের অকাল অবসান ঘটে।

ইংরেজদের রাজনৈতিক কুটবুদ্ধি কম ছিল না। তারা সন্ত্রাস-বাদকে পরাহত করার জন্য হিংস্রতার আশ্রয় যেমন নিয়েছিল, তেমনই রাজবন্দীদের যেসব সুযোগসুবিধা দিয়েছিল—তাতে তাদের প্রতি দেশের মানুষের যেই অকুণ্ঠ ও আন্তরিক সহানুভূতি ছিল তার দিকে যেমন বিদেশী শাসকদের লক্ষ্য ছিল, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয়তার পরিবেশে এইসব বিপ্লবী বন্দীদের আয়েসী করার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যও যে ছিল না তা বলা যায় না। একেত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাছে দেশপ্রেমের তীব্রতাই ছিল সর্বস্ব। তার জন্য রোমাঞ্চকর জীবন, অতীতের শহীদদের চেয়ে কঠোরতর আত্মত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তির জন্য এক উন্মাদনা তাদের ছিল। দেশে স্বাধীনতা এলে, দেশের চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মানুষ কিভাবে সেই স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণ করবে—রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে কিনা, এসব কথা অন্ততঃ বিপ্লবীরা জেলে ও আটকখানার কর্মহীন জীবনে যাবার পূর্বে কোনদিন ভাববার সময়ই পায়নি। সেদিকে চিন্তা করার কোন ইচ্ছাও তাদের হয়নি কারণ গোপন সংগঠনের দায়িত্ব ও চেতনার সীমাবদ্ধতা মিলে কেবল অটুট দেশপ্রেম ও রোমাঞ্চকর জীবনধারা সম্বল করে তাদের রাজনৈতিক কর্মধারা এগিয়ে যেত।

তাই বন্দীদের একটি বিশেষ অংশ যখন আলাপ আলোচনায়—ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার মধ্যদিয়ে ভবিষ্যত আন্দোলন ও সংগ্রাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিন্তাধারা গড়ে তুলছিলেন—অন্য অংশ তখন জীবনের আরাম আয়াসের মধ্যে নিজেদের এলিয়ে দেন এবং নিজের জীবনে দেশের মুক্তির জন্য আত্মদানের যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, সেই আদর্শ ক্রমে

হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে এবং ক্রমে তারা অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু সংখ্যক তরুণের বেলায় সেইজন্য ইংরেজদের ঐ কূটনীতি অনেকটা সাফল্যলাভ করে।

তারপর সরকার সন্ত্রাসবাদ দূর করার অন্য এক পন্থাও গ্রহণ করে। তাদের মুখপাত্র তখন বলেছিল, এইসব রাজবন্দীরা মুক্ত হয়ে যদি বেকার থাকে তা'হলে অলস—মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানায় পরিণত হবে। তাই তারা রাজবন্দী পুনর্বাসন-পরিকল্পনা অনুসারে প্রাদেশিক জেলা ও বাণিজ্য দফতরের পরিচালনায় মুক্তবন্দীদের জন্য কুটিরশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করে। দমদম ও ব্যারাকপুরে এই ধরণের কেন্দ্রে চীনামাটির বাসন ও ছাতা নির্মাণ শিক্ষা বেশ কিছু সংখ্যক মুক্ত রাজবন্দীকে দেওয়া হতে থাকে। সেই সব শিক্ষা-কেন্দ্রে কয়েক বছর থাকার পর অনেক মুক্ত রাজবন্দী নিজের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

বিনাবিচারে আটক বন্দীদের যেসব সুবিধা এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা, শীতকালীন ও পারিবারিক ভাতা দেবার কথা উপরে আলোচনা করেছি, তার মধ্যে যে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি ছিল—তা বলাও ঠিক হবে না। সন্ত্রাসবাদকে নৈতিক দিক থেকে আক্রমণ করার পরোক্ষ উদ্দেশ্য যদিও তাদের ছিল, আদালতের সামনে হাজির না করে হাজার হাজার দেশবাসীর ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার ফলে তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছিল, তার জন্য ঐসব সুযোগ সুবিধা ও ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার নৈতিক দায়িত্বও সরকারের ছিল। বিদেশী সরকারের যারা পরিচালক ছিল, তারা জানত যে তারা আমাদের দেশবাসীর খুবই অপ্রিয়। স্বাধীনতাকামী ঐসব বন্দীদের প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধা, সহানভূতি ও দরদ সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট সজাগ ছিল।

হিজলী বন্দীশালায় ১৯৩১-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত দশটায় নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর যে গুলীচালনা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সারা ভারতে দারুণ বিক্ষোভ জেগেছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু-সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী, তাঁর ভাগিনেয়ী উর্মিলা দেবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হিজলী আটকখানার গুলীর প্রতিক্রিয়ায় অনশনরত বন্দীদের সঙ্গে বার বার দেখা করেন। নিরস্ত্র আটক

বন্দীদের উপর গুলীচালনার প্রতিবাদে কলিকাতায় গড়ের মাঠের সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর দীর্ঘ টেলিগ্রামেই পনর দিন পর হিজলীর রাজবন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেন।

তারপর ১৯৩৭ সালে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ফলে মহাত্মা গান্ধীকে বাংলায় আসতে হয় এবং তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বাংলার এগার শত আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময় আবার আন্দামানে সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীরা মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসার দাবীতে অনশন ধর্মঘট করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের নেতারা তখন আন্দামানে ছিলেন। প্রায় আড়াইশত আন্দামান বন্দী ঐ অনশনে যোগদান করেন। তাঁদের অনশনের প্রতি সহানুভূতিশীল অনশন ধর্মঘট করেন বাংলার ও রাজপুতনার দেউলীতে আটক প্রায় সাত আট শত রাজবন্দী। এই সময় বাংলায় ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের যে বন্দীমুক্তি আন্দোলন হয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সেই দিনের ঐ বিরাট গণদাবীর কাছে মাথ নোয়াতে হয়। আন্দামান থেকে বন্দীদের বাংলার জেলে আনা হবে এই প্রতিশ্রুতি মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য জননেতাদের দেওয়া হলে ৩৭ দিন পর আন্দামান বন্দীরা এবং ১৭ দিন পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের আটকখানায় রাজবন্দীরা অনশন ত্যাগ করেন।

তার কিছুদিন পরই সরকার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা ও অন্যান্য পরবর্তী মামলার সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের বাংলার জেলে ফিরিয়ে আনে। সামান্য কয়েকজন ছাড়া চট্টগ্রামের প্রায় সব বন্দীদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়।

বাইশ

এখানে চট্টগ্রামের বন্দীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কিছু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ ভবিষ্যতে মুক্ত জীবনে এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন, তাদের দ্বারাই চট্টগ্রামের আজাদীপূর্ব রাজনৈতিক জীবন অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

১৯৩১—৩২ থেকে চট্টগ্রাম বন্দীদের এক অংশ সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন হতে আরম্ভ করে। তারা বন্দী অবস্থায় অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে, দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের ইতিহাস পড়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দিকে এগিয়ে যায়। অন্য অংশ এই চিন্তা-ধারার বিরোধিতা পোষণ করে এবং ভবিষ্যতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম করার কথা ভাবতে থাকে। এই দুই চিন্তাধারার বিভেদ বিভিন্ন আটকখানায় অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে এবং কোথাও কোথায়ও তা রাজবন্দীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সংঘাতে পরিণত হয়। এই ঘটনা যেমন বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মধ্যে ঘটেছিল, তেমনি আন্দামানের বন্দীদের মধ্যেও একইভাবে ঐ চিন্তার বিভেদ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এমন কি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তিন প্রধান বন্ধু—গণেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ চিন্তার ব্যাপারে একদিকে, অন্যদিকে থাকেন লোকনাথ বল। কি বিনাবিচারে আটক, কি সাজাপ্রাপ্ত সব বন্দীদের মধ্যে পরিষ্কার দু'টি চিন্তাধারা প্রকট হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদী পথ অবশ্য সকলের দ্বারাই চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়।

১৯৩৮-এর মাঝামাঝি থেকে দায়িত্বশীল রাজবন্দীরা চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। এবারও বিভিন্ন মতের মুক্ত রাজবন্দীরা চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে, কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থী দল হিসাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত করে। ১৯৩৯-শে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সমর্থক দক্ষিণ পন্থীদের চক্রান্তে ত্যাগ করেন, তখন তিনি কুমিল্লায় শ্রীকামিনী কুমার দত্তের বাড়ীতে পূর্ববাংলার বামপন্থী কর্মীদের এক বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠকে নেতাজী

সুভাষচন্দ্র তাঁর নতুন সংগঠন "ফরওয়ার্ড ব্লকের" নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতত্বের বিরুদ্ধে বামপন্থী ঐক্যের জন্য আবেদন করেন। চট্টগ্রাম থেকেও দুইজন বামপন্থী মুক্ত-রাজবন্দী ঐ কুমিল্লা বৈঠকে যোগদান করেন।*

তারপরই নেতাজী চট্টগ্রাম এসে ব্যাপকভাবে সমস্ত দল ও মতের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সঙ্গ দেখা করেন। পাথরঘাটা বালিকা বিদ্যালয়ে এক বিরাট জনসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বামপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাখ্যা করেন। ঐ সভায় বহু মুসলিম ছাত্র ও যুবক এবং চট্টগ্রামের কয়েকজন প্রবীণ মুসলিম নেতাও উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় বন্দীমুক্তি আন্দোলনের চাপে বাংলার সমস্ত সাজাপ্রাপ্ত নারী ও রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে চট্টগ্রামের বিপ্লবী কল্পনা দত্তও ১৯৩৯-শে মুক্তিলাভ করেন। মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমউদ্দিন ঐ সময় অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কল্পনা দত্ত মুক্তিলাভের পরই জানিয়ে দেন, তিনি আর সন্ত্রাসবাদী পথে বিশ্বাসী নহেন। মুক্তিলাভের পরে তিনি কলিকাতায় যান। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে কলকাতা ত্যাগের নির্দেশ দিলে তিনি আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি জেলা নারী সমিতিতে যোগ দেন এবং তার ভিতর দিয়ে মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে মন দেন।

১৯৩৯-এ হিটলার অতর্কিতে পোলাণ্ড-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪১-এ যখন হিটলার-জার্মেনী ও মুসোলিনীর ইটালীর ফ্যাসিবাহিনীর সঙ্গে জাপ-ফ্যাসিষ্টরাও যোগ দিল তখন এশিয়াখণ্ডেও যুদ্ধ বিস্তৃত হল এবং যে-কোন সময় তা আমাদের বাংলা ও ভারতে ব্যাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেল।

এই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন ভারতের ধন, জন, সম্পদ ঐ যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নানা আয়োজন করতে শুরু করল। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" ('কুইট ইণ্ডিয়া') ধ্বনি তখন

* তার মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী (১৯৪৯শে দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরলোকগত) এবং লেখক।

সারা ভারতের দেশভক্তদের মনে পরিব্যাপ্ত। যুদ্ধবিরোধী কিছু কিছু প্রত্যক্ষ আন্দোলনও বামপন্থীদের দ্বারা সেই সময় পরিচালিত হচ্ছিল।

১৯৪১শে চট্টগ্রামের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা স্থানীয় জে-এম-সেন হলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'না এক পাই—না এক ভাই' এই ধ্বনি তুলে এক আন্দোলন শুরু করে। তাতে তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, ইনি তখন সম্পাদক ছিলেন) কুমিল্লার মৌলভী আসরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (ইনি ১৯৫৪-এ পূর্ব-পাক পরিষদে নির্বাচিত হয়ে, পরে কিছুদিন শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন), ভূতপূর্ব বিপ্লবী নেতাও তখনকার অন্যতম সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (বিপ্লবী মহলে "মহারাজ নামে পরিচিত, ১৯৫৪-এর পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত) এসে যোগদান করেন।

সভার কিছুক্ষণ আগে জে-এম-সেন হলের গেটের কিছু দক্ষিণে রহমতগঞ্জের মোড়ে এসে জমা হল সশস্ত্র বাহিনী ব্রেন-গান নিয়ে। লাঠিয়াল পুলিশের বড় একটি দলও মার্চ করে এসে থামল জে-এম-সেন হলের সামনে রাস্তার উপর। ভিতরে প্রাঙ্গণে টেবিল চেয়ার সাজানো হয়েছে সভাপতি ও আগত বক্তাদের জন্য। সভায় লোক-সমাগম কম হয়নি, সমস্ত প্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়েছে, গোটা পরিবেশ বেশ থমথমে। সভাপতি যিনি হবার কথা ছিল, তিনি সভা আরম্ভ হবার সময়ই অনুপস্থিত রইলেন। তখন হঠাৎ মুক্ত রাজবন্দী শ্রীসুধাংশু বিমল দত্তকে (১৯৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাধারণ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য) ঐ সভার সভাপতি করার প্রস্তাব করা হয় এবং প্রায় রণসজ্জায় সজ্জিত পুলিশ বাহিনী দেখেও পরবর্তী অবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেও তিনি সানন্দে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

সভা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক পুলিশ অফিসার এক আদেশ পাঠ করে জানিয়ে দেয়, ঐ সভাকে সরকার বে-আইনী জনতার সমাবেশ বলে ঘোষণা করছে এবং সব লোককে চলে যাবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়। এই আদেশকে অগ্রাহ্য করে মৌলভী আসরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করেন, তখন পুলিশ

তাঁকে, সভাপতি সুধাংশু বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবুকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিয়াল বিদেশী সরকারের পুলিশ হিংস্র জন্তুর মত নিরস্ত্র ও শান্ত জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রেপ্তারের পর এই তিনজন নেতাকে পুলিশ কোতোয়ালী থানায় নেবার জন্য মিউনিসিপ্যাল আপিসের সামনে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় নিয়ে গেলে গাড়োয়ানরা এইসব দেশপ্রেমিকদের তাদের গাড়ীতে করে থানায় নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। অশিক্ষিত মুসলিম গাড়োয়ানরা পর্যন্ত সেদিন দেশপ্রেমে যেরকম উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। এই নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধের এক বিরাট মিছিল তাঁদের পিছন পিছন কোতোয়ালী থানা পর্যন্ত যায়। ক্রমে কোতোয়ালীর সামনে লোকসংখ্যা এমন বাড়তে থাকে যে, থানার গেটে দাঁড়ানো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট ভয়ে থানার কামরায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে।

শহরের হিন্দু-মুসলিম জনতা থানার সামনে ও পাশের রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়ায়। জনতা জোর করে পুলিশের হাত থেকে নেতাদের ছিনিয়ে নেবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেখা গেলে, নেতারা তাদের নিয়ে শহরে মিছিল করে বেরিয়ে পড়েন। "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, "পুলিশ জুলুম বন্ধ হোক" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে বিরাট মিছিল রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত সারা শহর প্রদক্ষিণ করে এবং নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরদিন পূর্ণ হরতাল ঘোষণা করে।

পরদিন সারা শহরের সকল দোকানপাট বন্ধ ছিল। স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে রাস্তায় মিছিল করে। এই সভা ভেঙ্গে দেবার পর ক্রমাগত ছয়দিন পর্যন্ত বামপন্থীদের উদ্যোগে যুদ্ধ-বিরোধী সভা হয়। কোন কোন দিন পুলিশ এসে মূল বক্তাকে গ্রেপ্তার করে সভা ভেঙ্গে দেয়। কোন সভায় পুলিশ খবর পাওয়ার পূর্বেই সভা শেষ হয়ে যায়। পরে অবশ্য এভাবে আইনভঙ্গ করে সভা না করার সিদ্ধান্ত হয় কারণ তাতে রাজনৈতিক সুফল বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না।

চট্টগ্রাম কোর্টে ধৃত তিনজন নেতার বিচার হয় এবং তিনজনেরই দুই বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এর কিছুদিন পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিয়ে ভারতে ও বাংলায় রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে নীতিগত বিভেদ দেখা দেয়। একদল মনে করেন, ভারতীয় হিসাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এই যুদ্ধে সাহায্য করা অন্যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ হিটলারের ফ্যাসিষ্ট জার্মেনী, মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট ইটালী আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা যখন প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের হাত থেকে ঈপ্সিত মুক্তি ছিনিয়ে নেবার এই স্বর্ণ সুযোগ। এই সময় কলিকাতায় নিজ গৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হয়ে প্রথমে হিটলারের সঙ্গে জার্মেনীতে দেখা করেন। পরে তিনি তাদের সাহায্যে জাপ-অধিকৃত সিঙ্গাপুরে আসেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা রাজবিহারী বসু তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মোটা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা ব্যর্থ করে ছদ্মবেশে জাপানে গিয়ে সেখানকার নাগরিক হিসাবে বসবাস করছিলেন। তাঁকে সভাপতি করে সিঙ্গাপুরে যে "আজাদ-হিন্দ বাহিনী' গঠিত হয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র গিয়ে সেখানে উপস্থিত হবার পর তা বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তিনি তার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়ে "নেতাজী" আখ্যা লাভ করেন।

বাংলায় ও ভারতে কংগ্রেসের এক অংশ সমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দল তখন বিশ্বাস করে যে, এই দুর্বল মুহূর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যদি ভিতর থেকে নানাভাবে আঘাত করা যায়, আর বাইরে থেকে নেতাজীর "আজাদ-হিন্দ ফৌজ" এসে আক্রমণ করে, তাহলে ভারত স্বাধীন হবে।

বামপন্থীদের মধ্যে অন্য এক অংশ মনে করে যে, বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের যে জোট জার্মেনী ইটালী জাপানের একনায়কত্ববাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে, যে ফ্যাসিবাদ তার নির্মম রথচক্রের তলায় একে একে গোটা ইউরোপের সব কয়টি দেশের স্বাধীনতাকে পিষ্ট করেছে, সেই ফ্যাসিবাদকে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা না দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের এতদিনের গড়া সভ্যতা, সংস্কৃতি সব লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ফ্যাসিবাদকে রুখবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিশালী লালফৌজ যখন বৃটিশ আর আমেরিকার সঙ্গে জোট বেঁধেছে তখন ঐ

দলের মতে জনগণের স্বার্থে ঐ যুদ্ধে সর্বতোভাবে সকলের সাহায্য করা দরকার। তাঁরা তাই ঐ যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" আখ্যা দেন।

এই দুই পক্ষ পরস্পরকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিতে থাকেন। চট্টগ্রামের যেসব রাজনৈতিক কর্মী বিপ্লবীদলের গোপন কর্মধারা থেকে শুরু করে, কংগ্রেসে ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে একসঙ্গে ছিলেন—যাঁরা একসঙ্গে ইংরেজ সরকারের জেলে আটকখানায় বন্দী ছিলেন—তাঁদের মধ্যেও নীতিগত বিভেদ বড় হয়ে ওঠে।

যাঁরা এই যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" বলে স্বীকার করেছিলেন তাঁরাও নিজের মত প্রচার করতে থাকেন। এই সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অধিকাংশ বন্দী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। তাঁরা জেলে থেকে সরকারের মারফত দেশবাসীর কাছে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত জানান এবং তাঁদের বিবৃতি প্রথম প্রকাশিত হয় কলিকাতার "স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায়। তাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার নেতৃস্থানীয় বন্দী গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের নামও ছিল। তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, ফ্যাসিবাদকে পরাহত করার জন্য আজ সারা দুনিয়ার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ভারতকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধকে সকলের শক্তিশালী করা দরকার।

চট্টগ্রামে ১৯৪১-এ কংগ্রেসের এক অংশও "ভারত ছাড়" আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ঐ বছর ১লা মে তারিখে ভারত-রক্ষা আইনে শ্রীযতীন রক্ষিত,* শ্রীসুখেন্দু দত্ত, শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমতিলাল চক্রবর্তী ও শ্রীদীনেশ দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী শ্রীবিনোদ দত্ত মীরেশ্বরীতে গ্রেপ্তার হন। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ও

* অতীতের সূর্য সেন দলের বিপ্লবী, পরে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা এই দেশদরদী চট্টগ্রাম জিলা বোর্ড সদস্য, সদরঘাট ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য এবং নিখিল পাকিস্তান আয়ুর্বেদ ও ইউনানী বোর্ডের সদস্য হিসাবে কবিরাজ যতীন্দ্রনাথ রক্ষিত চিকিৎসক ও সকল রকম জনসেবা ও সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১৯৬৯-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী করোনারি থম্বোসিস রোগে পরলোক গমন করেন।

তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর পর থেকে ঐ বিপ্লবীদলের যে ভগ্নাংশ তখনও চট্টগ্রামে সন্ত্রাসবাদী মতে স্থির থেকে গোপন সংগঠনের রেশ বজায় রেখেছিলেন, এই বিনোদ দত্ত "পরীদা" ছদ্মনামে সেই সামান্য কয়েকটি মোহগ্রস্ত দেশভক্ত যুবকদের নেতা হিসাবে পলাতক জীবন কাটাচ্ছিলেন।

চট্টগ্রাম কোর্টে তাঁর মামলা হয় এবং বিচারে বিনোদ দত্তের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে শ্রীবীরেন চক্রবর্তীর দুই বৎসর জেল হয়।

তেইশ

১৯৪১-এর মে মাসে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় যখন শত শত শ্রমিক সামরিক বিমান ঘাঁটি তৈরী করছিল তখনই চট্টগ্রামে প্রথম জাপানী বোমার হামলা হয়। ৮ই মে এক ঝাঁক জাপানী বোমারু বিমান কর্মরত শ্রমিকদের উপর বোমা বর্ষণ করে এবং কিছু জঙ্গী বিমান নীচে নেমে তাদের উপর বেপরোয়া মেশিনগানের গুলী চালায়। শত শত শ্রমিক তাতে হতাহত হয়। ঠিক পরদিন আবার পতেঙ্গায় জাপানীরা বোমা ফেলে, কিন্তু এইদিন হতাহতের সংখ্যা অনেক কম হয়েছিল।

এই সময় চট্টগ্রামের জনসাধারণ বিশেষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ-আর-পি সংগঠন শহরের পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠলেও শহরের অনেক বাসিন্দা গ্রামে চলে যায়। সন্ধ্যার পর মিউনিসিপ্যাল রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর উপর ঢাকনা পড়ে যায়। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। আবার আকাশ যখন সুন্দর জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে তখনকার ভয় ছিল আরও বেশী। কারণ বার্মার দখলীকৃত ঘাঁটি থেকে জাপানী বোমারু বিমানগুলি জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রেই বেশী হামলা করত।

জাপানের আক্রমণ বার্মার উপর শুরু হয় ১৯৪১শের ডিসেম্বর থেকে। চট্টগ্রামের বহু হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ অধিবাসী বহুকাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের প্রায় সকল অংশেই ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকাজে জীবিকা-নির্বাহ করত। অনেকের লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ছিল, অনেকের ধানের জমি, কারও কারও ছিল ভাল বেতনের চাকুরী। জাপানী সেনা-বাহিনী যতই দক্ষিণ দিক থেকে বার্মা দখল করতে করতে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছিল, ততই দলে দলে চট্টগ্রামের ও অন্যান্য বাঙ্গালীও অবাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম নরনারী শিশু হাঁটাপথে ঐ দেশ ত্যাগ করছিল। নিজেদের মহামূল্য সম্পদ ত্যাগ করে কেবল প্রাণটুকু হাতে নিয়ে বাঁচবার আকুতি নিয়ে কি সে নিদারুণ যাত্রা! পথে পথে দস্যুরা তাদের আক্রমণ করেছে। হিংস্র পশুর মত নারী ও শিশুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে

দুর্বৃত্তরা। শিশুকে মাইলের পর মাইল মা-বাবা কোলে করে এনে আর এগিয়ে নিতে পারছে না, অবুঝ শিশুর সামনে একটি তরমুজ কেটে তা খেতে দিয়ে তাকে ফেলে চলে এসেছে বিভ্রান্ত পিতামাতা। নিজ কুমারী কন্যা, স্ত্রী—এদের উপর চরম অত্যাচার অনেকে অসহায়ের মতো দেখেছে, নড়বার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাদের ছিল না। এই হ'ল যুদ্ধ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খণ্ডচিত্র।

হাজারে হাজারে ভারতীয় নরনারী ফ্যাসিষ্ট জাপানী বোমার আঘাতে ছিন্নমূল হয়ে, নিজেদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ বার্মায় ফেলে রেখে আরাকান পর্বতমালার দুর্গম পথ দিয়ে চট্টগ্রাম এসে পৌঁছতে লাগল। যুদ্ধের আয়োজনে অত্যন্ত দুর্বল বৃটিশ সরকার তখন সাম্রাজ্য হারাবার ভয়ে বিহ্বল। তাই অগণিত ঐসব বিপন্ন বার্মা-প্রত্যাগত নরনারী ও শিশুদের আশ্রয় ও সাহায্যদানের দায়িত্বও সরকার যথাযথভাবে পালন করতে পারছিল না। এই সময়ে চট্টগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছাত্রসংগঠন, জিলা ছাত্র ফেডারেশন-এর ঐসব দুর্গতদের জন্য রিলিফের কাজ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ছাত্র মোঃ সেকান্দর হোসেন তখন ছিলেন জিলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক। তাঁর নেতৃত্বে শত শত হিন্দু মুসলিম ছাত্র ঐসব বার্মা-উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়েছে, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, এবং ভারতের দূর দূরান্ত প্রদেশে রেলগাড়ীতে করে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রায় দুই তিন মাস পর্যন্ত চট্টগ্রামের দেশভক্ত ছাত্ররা দিনরাত ঐ কাজ করেছে অক্লান্তভাবে। পতেঙ্গায় সামরিক বিমানঘাঁটি নির্মাণের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯৪১শে শত শত হিন্দু মুসলিম পরিবারকে বহু পুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করে যাবার জন্য মাত্র ৩ দিনের সময় দেয়। তাদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থাও তারা করেনা। তখনও ছাত্রফেডারেশন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করে সময় বাড়িয়ে ১৪ দিন করতে পারে এবং বহু ছাত্র স্বেচ্ছা-সেবক ঐ সব গ্রামবাসীকে তাদের গৃহত্যাগে সাহায্য করে ও নৌকার ব্যবস্থা করে কর্ণফুলীর দক্ষিণপাড়ে তাদের গৃহস্থালীর সব জিনিসপত্র পার করে দেয়।

১৯৪১-এর ১৪ই আগষ্ট ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে।

তখন পুরাতন বিপ্লবী দলের যেসব কর্মী চট্টগ্রামে ছিল, তাদের অনেকে কলিকাতা থেকে গোপন ইস্তাহার, পুস্তিকা ইত্যাদি চট্টগ্রামে আনার ব্যবস্থা করে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনী বসুর পটিয়ার বাসায় ঐ সব কর্মীদের এক গোপন বৈঠক হয়। তাতে একদল প্রস্তাব করে যে, রেল লাইন নষ্টকরণ, টেলিগ্রাফের তার কাটা, সরকারী অফিসে আগুন দেওয়া, সরকারী অর্থ লুট করা ইত্যাদি দ্বারা বৃটিশ সরকারকে বিব্রত করে তুলতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে ঘাঁটিকৃত বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে হবে।

কিন্তু একদল এই প্রস্তাবে আপত্তি করে। তারা বলে যে, বার্মা থেকে হাজার হাজার দুর্গত মানুষের সেবার দায়িত্ব নিতে হবে চট্টগ্রাম-বাসীকে। তাছাড়া চট্টগ্রাম সীমান্ত যুদ্ধ ঘাঁটি বলে এ জেলায় সাফল্যের সঙ্গে ঐ রকম ধ্বংসাত্মক কাজ করা কঠিন হবে।

তবুও কিছু কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ ঐ সময় চট্টগ্রামে ঘটে। চট্টগ্রাম কাচারী পাহাড়ের নীচে খাসমহাল আফিস, মীরেশ্বরী থানার ধূম ও দুর্গাপুরের পোষ্টাফিস রাত্রে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরে করের হাট ও ভরদ্বাজ হাটের পোষ্টাফিসেও আগুন দেওয়া হয়। জোরারগঞ্জের নিকট কিছুটা রেল লাইন তুলে ফেলা হয়। ফলে দুর্গাপুর স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা শ্রীবরদা নন্দী, শ্রীঅন্নদা দে, শ্রীকুমুদিনীকান্ত মজুমদার, শ্রীবাণীশ দে, শ্রীহরেন ভৌমিক ইত্যাদি গ্রেপ্তার হয়।

সৈন্যদের ঘাঁটির কাছে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফিরা করার জন্য ধলঘাটের ভূতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীঅনন্ত দাস ধৃত হন। বিচারে তাঁর নয় মাস জেল হয়।

১৯৪৩শে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে আজাদহিন্দ সরকার গঠন করলে চট্টগ্রামের যেসব অধিবাসী ওখানে ছিল তাদের অনেকে তার সমর্থন করতে থাকে। অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে যাঁরা আগে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা গোপনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। পুলিশ চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন যায়গা থেকে আজাদহিন্দ ফৌজের গোপন বাংলা ও ইংরেজী ইস্তাহার পায়।

ফলে চট্টগ্রামের বহু যায়গায় খানাতল্লাসী হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মৌলভী জালাল আহমদ (জালাল সর্দার বলে পরিচিত ছিলেন), কবি ইব্রাহিম এবং আরও কয়েকজন মুসলিম দেশপ্রেমিক ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। মৌলানা ইসলামাবাদী ও অন্য কয়েকজন বন্দীকে লাহোর দুর্গে নেওয়া হয়। সেখানে এই বৃদ্ধ জননেতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। তাঁর পায়ে দড়ি বেঁধে ছাদের সঙ্গে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং নীচে থেকে আগুন জ্বালিয়ে ঐ ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর নাকে মুখে ধোঁয়া দেওয়া হয়। এভাবে বর্বর নির্যাতন করার পর তাঁদের কারাগারে বন্দী করে রেখে ১৯৪৪শে যুদ্ধ শেষ হবার পর মুক্তি দেওয়া হয়।

মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের একজন প্রখ্যাত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশপ্রেমিক নেতা। পরাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষের যেই সংগ্রাম কংগ্রেস, খিলাফত ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্য দিয়ে তখন পরিচালিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই মহান দেশপ্রেমিকের অবদান অত্যন্ত বিশিষ্ট। সেই সংগ্রামে কয়েকবারই তিনি কারাভোগ করেছেন, বহু নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছেন। তিনি ছিলেন একজন অনলবর্ষী বক্তা, বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক, সাংবাদিক ও বহু গ্রন্থের লেখক। শহরের রহমতগঞ্জে মুসলিম অনাথ বালকদের জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত "কদম মোবারক এতিমখানা" আজও তাঁর অমর স্মৃতি বহন করছে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ঘাটফরহাদবেগের এক গলিকে চট্টগ্রামের অন্যতম জননেতা শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলীর নামানুসারে 'কাজেম আলী সড়ক' দিয়ে গলির মান যদিও উন্নত করেছেন, আজও এই দেশদরদী ও ত্যাগী ইসলামাবাদী সাহেবের নাম শহরের কোন প্রধান

সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। অথচ জীবিত কোন কোন চট্টগ্রামবাসী ব্যক্তির নামে কয়েকটি সড়ক করা হয়েছে। এখনও কবি নবীন সেন, বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন, বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ইত্যাদি চটলার স্মরণীয় সন্তানদের স্মৃতিরক্ষার জন্য সামান্যভাবে একটি সড়কের নামও যে হয়নি, ভবিষ্যত ইতিহাসের কাছে সেজন্য চট্টগ্রামবাসীকে জবাবদিহি করতে হবে।

মোঃ জালাল আহমদ (জগলুল) চট্টগ্রামে ১৯২১—এর অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। তিনি তখন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির একজন সুযোগ্য কর্মচারী তিনি ছিলেন। যখনই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে-কোন আন্দোলন চট্টগ্রামে হয়েছে, তখন তাঁকে সব সময় তার প্রথম সারিতে দেখা গেছে।

চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী জেলা হওয়াতে, জাপানী আক্রমণকে ঠেকাবার জন্য এই জেলার সদর ও কক্সবাজার মহকুমায় বহু সৈন্য আমদানী করা হয়। চট্টগ্রামে পতেঙ্গার সামরিক বিমান ঘাঁটি ছাড়া দোহাজারী, চিরিঙ্গা, রামু ও কক্সবাজারে অনেকগুলি ছোট ছোট বিমান অবতরণ ভূমি তৈরী করা হয়।

চট্টগ্রাম শহরের ভিতরে রেলষ্টেশনের পাশে, জেলখানার বাগানের পুকুর পাড়ে, জেল রোড থেকে কিছু দূরে এক বড় পাকাবাড়ীর উপর এবং খাতুনগঞ্জে রাস্তার উপর জাপানীরা বোমা ফেলে। তারমধ্যে রেল-ষ্টেশনের পাশে যে বোমা পড়ে তার ফলে ছোট নালার পাকাপুলের তলায় আশ্রয় গ্রহণকারী কিছু ইংরেজ সৈন্য আর বেসামরিক দেশবাসী ঐ পুলচাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। কালারপোলের কাছে জাপানী বোমার ঘায়ে এক মুসলিম কৃষকের মাতৃহীনা একমাত্র তের বছরের মেয়ে মারা যায়। তার শরীরের অর্ধাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কক্সবাজারে বোমার আঘাতে মিঃ ডোনালড্‌সন নামে এক ইংরেজ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হন—বোমা ঠিক তাঁর আপিসের উপর পড়ে।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর চরম আঘাত চট্টগ্রামের বুকে নেমে আসে। শহরের পথে পথে বুভুক্ষু আর নিরন্নের মিছিল।

রুগ্ন শিশু পথের পাশে পড়ে আছে। তখন সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী দেশবাসীদের মিলিত সদস্য নিয়ে সরকারী উদ্যোগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করে জেলা খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। শহরে পূর্ণ রেশনিং প্রথা ও গ্রামে আংশিক রেশনিং-এর জন্য ঐ কমিটিতে প্রধানতঃ বামপন্থী সদস্যরা দাবী করে। তার ফলে চট্টগ্রাম শহরে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু হয়। গ্রামেও খাদ্য কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ কমিটির মারফত গ্রামে আংশিক রেশনিং, নিরন্নদের জন্য খিচুরী-খানা, শিশুদের জন্য দুধ বিতরণ কেন্দ্র ও রিলিফের বিভিন্ন কপড়-চোপড় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বেসরকারী অনেক রিলিফও ঐ সময় চট্টগ্রামে আসে। তারমধ্যে কলিকাতার "পিপলস রিলিফ কমিটির" প্রাথমিক সাহায্যে সারা বাংলার একমাত্র বেসরকারী শিশুচিকিৎসাকেন্দ্র "চট্টগ্রাম বেবীজ হাসপাতাল" রহমতগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি সর্বদলীয় কমিটি দ্বারা সেটা পরিচালিত হত। কংগ্রেস নেত্রী মিসেস নেলী সেনগুপ্তা ঐ কমিটির সভানেত্রী ছিলেন। অন্যান্য ডাক্তার ও নাগরিক সদস্যদের মধ্যে বিশিষ্ট লীগ নেতা শেখ রফিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেব এবং বিশিষ্ট জনদরদী ডাক্তার এম, এ, হাশেম, এম-বি, ঐ কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন।

এই সময় চট্টগ্রাম জাপান কর্তৃক অধিকৃত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেয়। একদিন জেলা কর্তৃপক্ষ বন্দর থেকে লক্ষ্য করে যে বহুদূর বঙ্গোপসাগর দিয়ে কয়েকখানা জাহাজ চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন জেলা ম্যাসিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, জেমিসন এক জরুরী নির্দেশে সরকারী কর্মচারীদের জানায় যে, তারা যেন যে-কোন ইঙ্গিতে চট্টগ্রাম ত্যাগ করার জন্য তৈরী থাকে। সঙ্গে সামান্য একটি বিছানার বাণ্ডিল ও কিছু ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড় ছাড়া তারা আর কিছু নিতে পারবে না। গ্রামে সাব-রেজিষ্ট্রার পর্যায়ের কর্মচারীদের পর্যন্ত ঐ নির্দেশ প্রেরিত হয়। চট্টগ্রাম রেলষ্টেশনে অত্যন্ত লম্বা লম্বা কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। অবশ্য পরে কতৃপক্ষ জানতে পারে যে ঐ জাহাজগুলি জাপানের নয়, বৃটিশেরই জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসছিল।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই সময় "জেলা জনরক্ষা সমিতি" গঠিত হয়। এই সমিতির পক্ষ থেকে একটি

বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। এই সময় নানা আতংক ও গুজব সব সময় প্রচারিত হয় এবং গ্রামে গ্রামে চুরি ডাকাতিও বৃদ্ধি পায়। সারা জেলায় গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শাখা গড়ে ওঠে। চট্টগ্রামের প্রায় ১৫,০০০ হাজার হিন্দু-মুসলিম তরুণ এই বাহিনীতে যোগ দেয়। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা রাত্রে লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রাদি নিয়ে গ্রামে নিয়মিত পাহারা দিত। এই ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আর এক অপূর্ব দৃশ্য সকলে লক্ষ্য করেছিল।

এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যকলাপ দেখে চট্টগ্রামের ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই বাহিনীর কর্মকর্তাদের ডেকে একদিন জাপানী আক্রমণকালে গেরিলা প্রথায় সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রচলিত অস্ত্র আইনকে শিথিল করার কথা জানিয়ে দেয়। তখন স্বেচ্ছাসেবকরা রাত্রে ধারাল বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে গ্রামে মিছিল করত ও পাহারা দিত।

চট্টগ্রামের পুরাতন বিপ্লবীদের যে সমস্ত কর্মী সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে নতুন বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়ে এই সময় যুদ্ধ, মহামারীও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিল, তারা গোপনে গোপনে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের হাতে সত্যই যদি তাঁদের প্রিয় মাতৃভূমি চট্টগ্রাম পড়ে যায়, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। গোপনে তরুণ ও তরুণীরা গেরিলা লড়াই সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও গোপনে সংগৃহীত হয়। স্থির হয় শহর থেকে বেশী দূরে গ্রামে পাহাড়ের কাছাকাছি যায়গায় জাপানী অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নারী ও শিশুদের সরিয়ে নেওয়া হবে। তার জন্য কয়েকটি বড় বড় বাড়ীও চিহ্নিত করে রাখা হয়। জাপানী ফ্যাসিষ্টরা যাতে গ্রামের দিকে শাখা রেল লাইন ধরে না এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য রেলের পুল, লাইন ইত্যাদিও ধ্বংস করা স্থির হয়।

এই সব কাজে বিপ্লবী সূর্য সেনের দলের অনেক অভিজ্ঞ কর্মী ছিলেন এবং মুসলিম কৃষক, মজুর, ও যুবক এই দলে যোগ দিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে পীত-সাম্রাজ্যবাদকে বরদাস্ত করব না, এই ছিল এদের পণ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বারজন দেহরক্ষীর অন্যতম শ্রীসুধাংশু কাঞ্জিলাল যুদ্ধ শেষ হবার অল্পদিন পূর্বে চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব বিপ্লবীদের কাছে গোপনে দেখা করতে আসেন। ইনি বিপ্লবী যুগে নিজেও ঐ দলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৩০-এর পরে বিনাবিচারে আটকও ছিলেন। মুক্তিলাভের পরে ১৯৩০-এ ইনি ব্রহ্মদেশ ও চীন ভ্রমণে যান। জাপ-অধিকৃত বার্মাতে ইনি নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেন এবং নিজ দক্ষতার তাঁর অন্যতম দেহরক্ষী হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি আরাকান সীমান্তে গ্রেপ্তার হন। তারপর যুদ্ধাপরাধী হিসাবে অন্য বন্দীদের মত দিল্লীর লাল-কেল্লায় তাঁর বিচার হয়। তাঁর উপরও বন্ধ ঘরে নাকেমুখে ধোঁয়া দেওয়া ও অন্যান্য অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। বিচারে তাঁর দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়।

বিগত ২য় মহাযুদ্ধের সময় আতঙ্কের বিরুদ্ধে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আর্তের সেবায় চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম সর্বদা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করেছে। চট্টগ্রামের যেসব রাজনৈতিক কর্মী ফ্যাসিবাদবিরোধী সেই ২য় বিশ্বযুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" মনে করত, তারাও মনেপ্রাণে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী ছিল। যুদ্ধের শুরুতে যখন চট্টগ্রামে প্রথম এ, আর, পি, সংগঠিত হতে থাকে, চট্টগ্রামের তদানীন্তন জেলা ম্যাসিষ্ট্রেট ঐ কর্মীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজনকে জেলা এ-আর-পি, অফিসারের পদ সাড়ে-চারশ টাকা মাসিক বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু চাকুরীর শর্তে ইংরেজ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবার কথা লিখতে হবে এই মর্মে নির্দেশ থাকায় সেই চাকুরী তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করলেও, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্য থেকে তাঁরা কেউ ভ্রষ্ট হননি।

তবে আর একটি কথা স্বীকার করা দরকার। যাঁরা ঐ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের যৌক্তিকতা স্বীকার না করে ধ্বংসাত্মক কাজ ও নানাভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের দেশপ্রেমের তীব্রতা ও অকৃত্রিমতা সম্পর্কে "জনযুদ্ধ" সমর্থকরা সব সময় সুবিচার করতে পারেন নি। স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদকে পাথেয় করে যে বিপ্লবীরা সংগ্রাম করেছিলেন, তাদের পথের প্রতি স্বীকৃতি না থাকলেও তাদের

অম্লান দেশপ্রেম ও তার জন্য অকুণ্ঠ আত্মদানকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছি। কিন্তু এই সময় যেসব দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের প্রতি অগাধ ও বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর প্রদর্শিত পন্থায় দেশকে পরশাসনমুক্ত করার কথা ভেবেছিলেন, তাঁদের সেই পথ যাদের কাছে ভ্রান্ত মনে হয়েছিল, তারা তাঁদের দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারতেন। তা না করার ফলে বিভিন্ন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যথেষ্ট হয়েছে, সহকর্মী ও সহযাত্রী দেশপ্রেমিকদের সেই বিভেদের সুযোগ নিয়েছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রুরা।

চব্বিশ

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪১শে গৃহীত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে) আবার নতুন শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে। কারণ এই সময় কংগ্রেসও আবার নতুন করে স্বাধীনতার দাবী তোলে। দেশে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রদের সব আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই সময়ে বাংলায় ও ভারতে যে দুইটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়, তার ফলে সারা দেশের সঙ্গে চট্টগ্রামের জনসাধারণও আশায় ও উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৯৪৬শে কলকাতায় যে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করেছিল, তার ফলে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানীর ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্শা, রেল ইত্যাদি যানবাহন যেমন সম্পূর্ণ বিকল হয়েছিল, তেমনি সরকারী ও বেসরকারী কোন অপিসে একটি মানুষও সেদিন উপস্থিত ছিল না। সবচেয়ে অবাক করেছিলেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, ভানু বানার্জি, কাননবালা, সুচিত্রা সেন, অরুন্ধতী মুখার্জি প্রভৃতি মঞ্চ ও চলচিত্র শিল্পীরাও সেদিন সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে মিছিল করে কলকাতার রাজপথে নেমেছিলেন। এমন সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ ধর্মঘট পরাধীন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বিরল। কলকাতায় "রশীদ আলী দিবস" ও সারা বাংলায় "ভিয়েতনাম" দিবসে ছাত্রদের আন্দোলন ও পুলিশের গুলীচালনা এই সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চট্টগ্রামের ছাত্ররাও এইসব আন্দোলনে শরীক ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য এক উজ্জল ঘটনা হ'ল বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিকামনায় বোম্বাইয়ের নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভয়ানক বিচলিত হয়। তারপরই সুপরিকল্পিত উপায়ে তারা দেশে প্রচণ্ড ভ্রাতৃদ্বন্দের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু শত অত্যাচার, ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি সত্বেও স্বাধীনতার তীব্র কামনাকে নিবৃত্ত করা সেই বিদেশী শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৪৫-এর শেষের দিকে চট্টগ্রাম শহরের দুই মাইল উত্তরে কাহারপাড়া নামক গ্রামে "পাইওনিয়ার কোরের" দু'জন সৈন্য একটি মুসলিম বালিকাকে অপমান করে। বালিকাটি সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গ্রামের পুকুরে জল ভরতে যায়। সৈন্য দুইটি মেয়েটিকে একলা পেয়ে তার কাছে অসংগত ও অশ্লীল প্রস্তাব করে ও অন্যায়ভাবে তার গায়ে হাত দেয়। মেয়েটি ছুটে গিয়ে পাড়ার মধ্যে খবর দিলে কিছুসংখ্যক পুরুষ এসে সৈন্য দুইটিকে ধরে প্রহার করে। তারা ফিরে গিয়ে তাদের গোটা রেজিমেণ্টকে নিয়ে আসে এই গ্রামে। গ্রামে ঢুকে রাইফেল নিয়ে তারা প্রথমে কিছু ফাঁকা আওয়াজ করে, তারপর ঐ মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। তারপরে সঙ্গে করে আনা পেট্রোল দিয়ে তারা সারা কাহারপাড়া গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। জলন্ত আগুনে সৈন্যরা ঐ গ্রামের হাসমত আলীকে নিক্ষেপ করে। ফলে সে আগুনে একখানি ঘরও ঐ ছোট পল্লীতে অবশিষ্ট ছিল না। গৃহপালিত গরু, ছাগল, মুরগী অনেকগুলি জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল।

পরদিন সকালে খবর পাওয়া মাত্র চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতির নেত্রী শ্রীযুক্তা কল্পনা যোশী (*দত্ত) জেলা জনরক্ষা ও মেডিকেল রিলিফ কমিটির সম্পাদক ও কর্মীরা এক সঙ্গে কাহারপাড়ায় গিয়ে নির্যাতিতা বোনদের এবং গ্রামবাসিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রত্যেক পরিবারে গিয়ে পর্দানশীন মুসলিম মহিলাদের ও অন্যান্যদের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। কিছুক্ষণ পরই জিলা মুসলিম লীগ সভাপতি শেখ রফিউদ্দীন আহম্মদ সিদ্দীকী সাহেবও শহর থেকে অনেক কর্মী নিয়ে সেখানে যান এবং মিলিটারী অত্যাচারের প্রত্যক্ষ দৃশ্য সম্পর্কে আলোক চিত্র গ্রহণ করান ও সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

সেখানেই বিভিন্ন দলের উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় স্থির হয় বিকালে এক সর্বদলীয় প্রতিবাদ সভা এবং সভার পর বিরাট প্রতিবাদ মিছিল শহরে বের করা হবে এবং সৈন্যদের ঐ জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হবে।

পাকিস্তান হাসেল হবার পূর্বে কাহারপাড়া মিলিটারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক হিন্দু-মুসলিমের যে অভূতপূর্ব ঐক্য সেদিন মোসলেম

হল প্রাঙ্গনের (বর্তমানে "জেমিসন মেটারনিটি হাসপাতাল") সভায় দেখা গিয়েছিল তার কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সভা শেষে যে মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য মোসলেম হল থেকে বাহির হয়, তাতে শহরের হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ ছাত্র, দোকানদার, রিক্সাওয়ালা, মোটর ড্রাইভার এবং দলমতনির্বিশেষে সকল মানুষ যোগদান করে। "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", "মিলিটারী জুলুম বন্ধ কর" "অত্যাচারীর বিচার চাই"—এসব ধ্বনি দিয়ে মিছিল যখন মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে উত্তরমুখী এগিয়ে আসছিল, তখন জনতার একটি উত্তেজিত অংশ তৎকালীন ইংরেজ এ-ডি-এম-এর (অতিরিক্ত জিলা ম্যাসিষ্ট্রেট) বাসা আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই অতিরিক্ত জেলা ম্যাসিষ্ট্রেট-টি তখন অস্থায়ী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি কাহারপাড়ার অত্যাচার সম্পর্কে সেখানে পরদিন দুপুরে তদন্ত করতে গিয়ে তাদের "সাহায্যের' জন্য নাকি মাত্র ৫৫্ টাকা দিতে চাইলে সেখানকার অধিবাসীরা তা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। এই খবর লোক মুখে প্রচারিত হবার পর থেকে জনসাধারণ ঐ ইংরেজ শাসকের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। অনেক কষ্টে জনতাকে ঐ দুর্ঘটনা থেকে নিবৃত্ত করতে হয়—তারা দাবী করছিল তাদের ঘরবাড়ী যেমন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা তেমন করে ঐ ইংরেজ শাসকের বাড়ী পুড়িয়ে দেবে, তাকেও সেই সঙ্গে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে।

আবার মিছিল লালদীঘির পাড়ের দিকে এগিয়ে আসে। সেখানে দু'খানা মিলিটারী জীপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে দুই তিনজন সৈন্য ছিল। দেখা মাত্রই জনতার এক অংশ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জীপের উপর ঢিল ছুঁড়তে থাকে—জীপ দু'খানা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। তখনই মিছিলের যাঁরা নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরা মিছিলকে ভেঙ্গে দিয়ে পরদিন পূর্ণ হরতালের আয়োজনে চলে যান।

সম্রাজ্যবাদ বিরোধী এমন বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চট্টগ্রামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত হয়নি।

১৯৪৫ থেকে সারা অবিভক্ত বাংলায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনের এক বিরাট জোয়ার আসে। বিশেষ করে কলকাতায় এই আন্দোলনে দলমত

নির্বিশেষে ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ এমনভাবে সাড়া দেয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার সাজাপ্রাপ্ত সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। অবিভক্ত বাংলায় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর উদ্যোগেই তখন বন্দী মুক্তিদান শুরু হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা ও পরবর্তী অন্যান্য মামলার বন্দীদের কিছু কিছু মুক্তি দেওয়া আরম্ভ হয় তাঁর মন্ত্রীসভার আমলে। পরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রধান নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও অন্যান্য বন্দীদের ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল থেকে অন্যতম প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে ১৯৪৬শের আগষ্টে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভের পরে অন্যতম নেতা লোকনাথ বল একাকী চট্টগ্রাম আসেন। চট্টগ্রাম শহরে ও বিভিন্ন গ্রামের জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে। তখন পর্যন্ত তিনি এম-এন-রায়ের 'র‍্যাডিকেল ডিমোক্র্যাটিক' পার্টির সদস্য ছিলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্য তিন নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ একসঙ্গে যখন চট্টগ্রাম আসবেন বলে খবর প্রচার হল, তখন জনসাধারণ, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। চট্টগ্রাম শহরে হিন্দু-মুসলিম সদস্য নিয়ে তাঁদের জন্য একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকজন সদস্যকে পূর্ব রাত্রে সীতাকুণ্ডে পাঠানো হল, যাতে পরদিন ভোরে চট্টগ্রাম মেলে সেখান থেকে চট্টগ্রামের কারামুক্ত বীর সন্তানদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসা যায়।

চট্টগ্রাম ষ্টেশনে সেদিন বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও বহু হিন্দু-মুসলিম এই বিশিষ্ট নেতাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিল। অনন্ত সিংহের বাসা ছিল নন্দনকানন তামাকুমণ্ডী গলির মধ্যে।* তাঁর প্রতিবেশী প্রায় ৯০ বৎসর বয়স্ক এক মুসলিম বৃদ্ধ লাঠিভর দিয়ে চট্টগ্রাম রেলষ্টেশনের

* চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি অনন্ত সিংহের পিতার নামে এই গলির নামকরণ করেছেন "গোলাপ সিং লেন"।

প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "অনন্ত সিংহ নাকি আজ ফিরে আসছে, চোখে ত ভাল দেখি না। সে এলে তাকে আমার কাছে একটু নিয়ে এসো।" গাড়ী থেকে নামার পর অনন্ত সিংহকে ঐ বৃদ্ধের কাছে নিয়ে বলা হল যে এই অনন্ত সিংহ। বৃদ্ধ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ছোট থেকে দেখছি তোমায়—এত বড় বীর তুমি, আমি তোমার নবীচাচা, তোমায় দেখতে এসেছি।" বৃদ্ধের চোখে জল তখন টলমল করছে।

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুসলিম নেতা ফিরিঙ্গি বাজারের পরলোকগত আবদুল হক দোভাষী সাহেব* খবর দিলেন, বিপ্লবী নেতাদের বিকালে যেন তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেষ ঘোষ আর অনন্ত সিংহকে নিয়ে চট্টগ্রামের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মী বন্ধুরা যখন ফিরিঙ্গি বাজার দোভাষী সাহেবের বাসায় সন্ধ্যার পূর্বে গিয়ে পেঁাছালেন, পুতচরিত্র, স্বচ্ছহৃদয় ও উদারপ্রাণ এই সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক নেতা রাস্তার ধারে এসে একে একে তিনজন বিপ্লবী নেতাকেই বুকের মধ্যে আবেগভরে জড়িয়ে ধরে বলেন, "বুড়ো হয়েছি, কোন্‌দিনে খোদা বুকে টেনে নেন জানি না, শুধু তোমাদের আবার দেখবার জন্যই বুঝি এখনও বেঁচে আছি।" তিনি এই দেশপ্রেমিক কারামুক্ত নেতাদের অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট সুমিষ্ট মূল্যবান খাদ্য ও বরফ সরবত টেবিলে টেবিলে সাজিয়ে রেখেছিলেন। নেতাদের দেখবার জন্য দোভাষী সাহেবের বৈঠকখানায় ও ফিরিঙ্গী বাজার রাস্তায় প্রায় চার-পাঁচশত মুসলিম ও হিন্দু জমা হয়েছিল। দোভাষী সাহেব সকলকে ডেকে এনে ভোজ্য ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন।

চট্টগ্রামের বিখ্যাত মুসলিম নেতা পরলোকগত আহম্মদ সগীর চৌধুরী সাহেবও তাঁর বিখ্যাত সিনেমা হল "খুরশীদ মহলে" এই কারামুক্ত দেশভক্তদের অভ্যর্থনা জানান। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, "চট্টগ্রামবাসী তথা বাঙ্গালী এইসব বীর সন্তানদের জন্য গর্ববোধ করে। এঁরা সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করেছেন বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করেছেন জেনে

* এমন মানুষ চট্টগ্রামে কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম "শান্তি কমিটির" সভাপতি ছিলেন। ধর্মস্থান পরিদর্শন উপলক্ষে ভারতে গেলে দিল্লীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আমি আনন্দিত। আমি আশা করি এখন থেকে আমার চট্টগ্রামের এই বীর সন্তানরা দেশের সেবায় আবার আত্মনিয়োগ করবেন।"

এই নেতারা ধলঘাট, বাগদণ্ডী, দক্ষিণভূষি, সারোয়াতলী প্রভৃতি গ্রামে অস্ত্রাগার দখল ও তার পরবর্তী বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাজে শহীদদের পরিবারের সকলের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করেন। গ্রামের বড় বড় জনসভায় হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম দেশবাসী এই বীর সন্তানদের অভিনন্দিত করে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে এঁদের হেঁটে যাওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিছুদূর পর পরই এক এক দল মা-বোন, ধানদূর্বা ও উলুধ্বনি দিয়ে এঁদের অভিনন্দন জানান। প্রায় সভাতেই মুক্ত বীর সন্তানদের জনসাধারণ টাকার তোড়া উপহার দেন। প্রতি সভাতে বহু মুসলিম কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ছাত্র বীর সন্তানদের জন্য অর্থ দান করেছিলেন।

এই সময় সন্দ্বীপে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার মুক্ত বন্দী লালমোহন সেন অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে নিহত হন। ১৯৪৬শে যখন অবিভক্ত বাংলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুপরিকল্পিত উপায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তখন সন্দ্বীপে ১৬ বছর কারাদণ্ড ভোগী মুক্তবন্দী দেশপ্রেমিক লালমোহন সেনের উদ্যোগে হিন্দু মুসলিম "শান্তি-কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী লালমোহন ১৯৩০শে অস্ত্রাগার দখলের আয়োজনের জন্য জেঠা মহাশয়ের বাক্স ভেঙ্গে ১৩০০ টাকা এনে দিয়েছিলেন। তারপর অস্ত্রাগার দখলের দিন ধূমের কাছে রেল লাইন তোলার দলে তিনি ছিলেন। শান্তি কমিটির সভাপতি হিসাবে সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য ২০শে অক্টোবর, ১৯৪৬শের সকাল ৫টায় তিনি যখন চট্টগ্রাম আসবার জন্য বাড়ী থেকে যাত্রা করে মাঠের মাঝখানে এসেছেন, হঠাৎ একদল উন্মত্ত জনতা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সন্দ্বীপের যে মুসাপুর গ্রাম লালমোহনের জন্মভূমি, ভারতের অন্যতম বিখ্যাত নেতা মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবও ঐ গ্রামে জন্মেছিলেন। লালমোহন সম্পর্কে ১৯৪৭ইং ৩রা জানুয়ারী তিনি এক প্রবন্ধে লেখেন।

"উর্দু কবি হস্‌রৎ মোহানী তাঁর "সমাধি" কবিতায় বলেছেন, শহীদদের শ্মশানগুলোর ওপরে প্রতি বৎসর বসবে মেলা, দেশের

জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতি রক্ষিত হবে এইভাবেই।"

"লালমোহনের স্মৃতি কিন্তু আমরা এইভাবে রক্ষা করব না। তাঁর স্মৃতির সম্মানে আমরা গড়ে তুলব জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম, যে সংগ্রামের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পড়বে ধ্বসে। সমস্ত ভারতবর্ষ হবে স্বাধীন। দেশের রাষ্ট্রশক্তি আসবে জনগণের হাতে।"

* * *

১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট সকাল বেলায় যখন সরকারী আপিসগুলি থেকে প্রায় দুই শতাব্দীর গোলামীর প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক'টি নামানো হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সবুজ-সাদা আজাদ পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হ'ল, তখন মুক্তির নূতন স্পর্শে দেশের মানুষের মনে এল নবীন শিহরণ। অনেক আশা ও ভরসা নিয়ে, নবলব্ধ আজাদীর আনন্দউদ্বেল চিত্তে দলে দলে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ আর খৃষ্টান দেশবাসী পাকিস্তান-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় ও মিছিলে গিয়ে সামিল হল। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই চতুর্বিধ স্বাধীনতার আশা নিয়ে প্রায় দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী গোলামীর শৃঙ্খলমুক্ত মানুষ অপেক্ষা করল, তাদের এতদিনের দুঃখ, বেদনা, শোষণ ও অত্যাচারের অবসান দেখবে বলে।

বহু আত্মদান রক্তক্ষয় ও সংগ্রামের ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছি। আজ স্বাধীন দেশে বসে আমরা অতীতের সকল দল ও মতের মুক্তিযোদ্ধাদের পরম আত্মদান যেমন স্মরণ করব, তেমনই যেই স্বাধীনতার পূত আদর্শের বেদীমূলে তাঁদের অমর প্রাণ তাঁরা উৎসর্গ করে গেছেন, সেই আদর্শকে যদি আমাদের বর্তমান কাজ, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাহায্যে বাস্তবে রূপায়িত করে না তুলতে পারি তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

বইঘর
চট্টগ্রাম